বাংলার লেখক ও কবি

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

ক

প্রথম (করুণা সংস্করণ)

মাঘ ১৩৬৭

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮এ, টেমার লেন

কলকাতা-৯

মুদ্রাকর

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রিণ্টার্স

১৩৮, বিধান সরণী

কলকাতা-৪

প্রচ্ছদশিল্পী

খালেদ চৌধুরী

বাংলার লেখক ও কবি

॥ এই লেখকের অন্যান্য বই ॥

রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ ১,২
রবীন্দ্র-কাব্যনির্ঝর
রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহ ১,২
রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প
রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন
রবীন্দ্রবিচিত্রা
মাইকেল মধুসূদন
বাঙ্গালী ও বাঙ্গলাসাহিত্য
বাঙালীর জীবনসন্ধ্যা
চিত্র-চরিত্র
বিচিত্র উপল
বিচিত্র সংলাপ

শিবনাথ শাস্ত্রী

১৮৪৭-১৯১৯

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর যুগান্তর (১৮৯৫) উপন্যাসখানি প্রকাশিত হইলে সমালোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ মন্তব্য করিয়াছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর উপন্যাসের বিশেষ গুণ কি, আবার তাহার দোষই-বা কি—রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার মতে চরিত্রসৃজনে, গ্রাম্য পরিবেশকে সংবেদনার আলোতে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে, ঘটনাপ্রবাহ ও নরনারীর জীবনের উপরে কৌতুক মিশ্রিত হাস্যরসের কিরণ নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে শিবনাথের জুড়ি নাই। আর তাঁহার দোষ, রবীন্দ্রনাথের কথাতেই শোনা যাক—

> …এমন সময়ে আমাদের পরমদুর্ভাগ্যবশত উপন্যাসটি অকস্মাৎ যুগান্তরে লোকান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রন্থকারও নূতন বেশ ধারণ করিলেন। তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক, হইলেন ঐতিহাসিক; ছিলেন ভাবুক, হইলেন নীতি-প্রচারক। আমরা রসসম্ভোগের সত্যযুগ হইতে তর্কবিতর্কের যুগান্তরে আসিয়া অবতীর্ণ হইলাম। গ্রন্থকার পূর্বে যেখানে মানুষ গড়িতেছিলেন এখন সেখানে মত গড়িতে লাগিলেন, পূর্বে যেখানে আনন্দনিকেতন ছিল এখন সেখানে পাঠশালা বসিয়া গেল। এরূপ অঘটন সংঘটন হইল কেন তাহা বলিতে পারি না। [ঘটনাপ্রবাহের নশিপুর হইতে কলিকাতায় স্থানান্তর] উপন্যাসের পক্ষে কুক্ষণ; কারণ সেই উপলক্ষ্যটুকু অবলম্বন করিয়া গ্রন্থের শেষার্ধটি প্রথমার্ধের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

> লেখক ধারাবাহিক গল্পের প্রতি বড়-একটা দৃষ্টিপাত করেন নাই, আমরাও গল্পের জন্য বিশেষ লালায়িত নহি। আমরা একজন রীতিমত মনুষ্যের আনন্দজনক বিশ্বাসজনক জীবনবৃত্তান্ত চাহি।…কিন্তু লেখক দুইখানি বহির পাতা পরস্পর উল্টাপাল্টা করিয়া দিয়া একসঙ্গে বাঁধাইয়া দপ্তরীর অন্ন মারিয়াছেন এবং পাঠকদিগের রসভঙ্গ করিয়াছেন। এ আক্ষেপ আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না। —আধুনিক সাহিত্য

খুব সম্ভব এই আক্ষেপ মিটাইবার আশাতেই রবীন্দ্রনাথ পত্রযোগে শিবনাথ শাস্ত্রীর নিকটে ভারতীর জন্য লেখা চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন—

এক্ষণে অবসরমত ভারতীর জন্য কিছু প্রবন্ধাদি লিখিয়া সাহায্য করিলে বাধিত হইব। বঙ্গসাহিত্যকে বঞ্চিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজকেই আপনার সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিলে চলিবে না, কারণ সাহিত্যে আপনার ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে।

পূর্বোক্ত সমালোচনা এবং বর্তমান পত্র দুইই ১৩০৫ (১৮৯৮) সালে লিখিত।

এখন, শিবনাথ শাস্ত্রীর উপন্যাসগুলি আলোচনার সময়ে রবীন্দ্রনাথের যুগান্তর সম্বন্ধীয় মন্তব্য মনে রাখা আবশ্যক, আর তাহা মনে রাখিয়াই আমরা অগ্রসর হইব। তাঁহার প্রধান বক্তব্য দুটি : প্রথমত শিবনাথের মত সহৃদয়তাপূর্ণ চরিত্র-সৃষ্টিক্ষমতা বিরল; দ্বিতীয়ত আপনার অজ্ঞাতসারে ঔপন্যাসিক শিবনাথ কখন যেন ঐতিহাসিক ও নীতিপ্রচারক হইয়া ওঠেন, এবং তাহার ফলে উপন্যাসের অখণ্ডতা নষ্ট হইয়া যায়। খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য শিবনাথের সাহিত্য-বুদ্ধিকে অধিকতর সজাগ করিয়া দিয়াছিল, কারণ তাঁহার পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে যুগান্তরে অনুষ্ঠিত ত্রুটি অনেক পরিমাণে বর্জিত হইয়াছে। যুগান্তর উপন্যাস বাস্তবিকই যেন দুইখানি পৃথক গ্রন্থের সমবায়—একখানি ঔপন্যাসিকের রচনা, একখানি নীতি প্রচারকের রচনা। শিবনাথের পরবর্তী উপন্যাস তিনখানিতে—বিধবার ছেলে (১৯১৬) ও উমাকান্তকে (১৯২২)[১] একখানা বলিয়া ধরিলে দুইখানা উপন্যাসে—এই ত্রুটি বর্জিত হইয়াছে। এগুলির শিল্পগত অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই, গল্পের ধারাও অবিরল আছে। নীতিপ্রচারক নিজেকে কিছুটা যেন সংযত করিয়াছেন, আগের মত তিনি আর তেমন করিয়া ঔপন্যাসিকের কলমটা কাড়িয়া লন নাই। কাজেই দেখিতে পাই, যুগান্তরের প্রধান ত্রুটি হইতে পরবর্তী বইগুলি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু আর-এক সংকট ঘটিয়াছে। শিবনাথের মধ্যে তিনটি সত্তা ছিল—ঔপন্যাসিক, নীতিপ্রচারক ও ঐতিহাসিক। তাঁহার পরবর্তী উপন্যাসগুলি নীতিপ্রচারকের কলমের খোঁচা হইতে অনেক পরিমাণে বাঁচিয়া গেলেও ঐতিহাসিকের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে শিবনাথের গল্প কিছুদূর অগ্রসর হইলেই ইতিহাসে পরিণত হয়। এ অভিযোগ হইতে তিনি সম্পূর্ণ রেহাই পান নাই। রবীন্দ্রনাথের অপর অভিযোগ, শিবনাথের গল্পের আনন্দনিকেতন কখন যেন পাঠশালা হইয়া

১ "বিধবার ছেলে তাঁহার শেষ উপন্যাস। ইহা নিঃশেষিত হইলে প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য মূল পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে পিতার উপন্যাসখানির দ্বিতীয় সংস্করণ উমাকান্ত নামে প্রকাশ করেন; ইহার ১৯শ পরিচ্ছেদটি তাঁহার নিজের রচিত।"—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'শিবনাথ শাস্ত্রী,' প্রথম সংস্করণ, পৃ ৩২-৩৩

দাঁড়ায়। পরবর্তী উপন্যাসগুলি অবশ্য ঠিক পাঠশালা হয় নাই ; কিন্তু পাঠশালার নীতিপ্রচারকের পক্ষে একেবারে স্বভাববর্জন সম্ভব নয়, তাঁহার স্বভাবের কিছু রেশ রহিয়া যাইবেই। তাই বলা চলে যে, যুগান্তরে যিনি ছিলেন পাঠশালার গুরুমহাশয়, পরবর্তী উপন্যাসে আসিয়া তিনি হইয়াছেন ছুটির সময়ের গুরুমহাশয়। অবকাশযাপনের গুরু যতই নীচু হোন, একেবারে অগুরু হইতে পারেন না। তবে প্রভেদটা দেখি এই যে, যিনি পাঠশালার আটচালাতে নামতা পড়াইতেছিলেন এখন তিনি ছায়াঢালা আমবাগানে বসিয়া গল্পের আসর জমাইয়াছেন। গল্পের আসর, তবে সে গল্প গুরুমহাশয়কথিত ; যতই মনোহর হোক-না কেন, তবু তাহা শেষ পর্যন্ত নীতিবাদের ফ্রেমে বাঁধানো। শিল্পের দাবিতে গল্পের যতদূর যাওয়া দরকার, নীতির দাবিতে তাহাকে অনেক সময়েই ততদূর যাইতে দেওয়া হয় নাই। ইহাকেই বলিতেছি গুরুমহাশয়ের গল্প। তবে রক্ষা এই যে পাঠশালার এখন ছুটি, পাঠশালা চলিতে থাকিলে তাঁহাকে গল্প বলিবার অনুরোধ করিতে ভরসা পাইত কে ? রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার ইঙ্গিতের ফলেই হোক আর যে কারণেই হোক, শিবনাথের যুগান্তর-পরবর্তী উপন্যাসগুলি শিল্পসৃষ্টি হিসাবে অধিকতর নিখুঁত। কিন্তু তেমনি আবার যুগান্তরের সরস, প্রাণময় নরনারীরও দেখা পাই না পরের গল্পগুলিতে।

২

যুগান্তর শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রথম উপন্যাস নয়, কিন্তু প্রথমেই যে তাহার উল্লেখ করিলাম তার একাধিক কারণ। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার পূর্বসূত্র একটা কারণ। আরও কারণ এই যে, এক হিসাবে শিবনাথের সমস্তগুলি উপন্যাসেরই যুগান্তর নামকরণ চলিতে পারে। বাঙালিসমাজের একটা যুগান্তরপর্বকে উপন্যাসসমূহের ঘটনার কাল বলিয়া তিনি বাছিয়া লইয়াছিলেন। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৯০৪) লেখকের পক্ষে ইহা একান্ত স্বাভাবিক। তখন আমাদের শিক্ষিত সমাজ ইংরেজি শিক্ষার প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া লইয়াছে, তখন আর সভ্য হইবার দুরাশায় খৃস্টানধর্ম কেহ গ্রহণ করে না, বা ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখিবার সংকল্পও পোষণ করে না। ইংরেজিতে সাহিত্য রচনা করিয়া যে অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে বাঙালি লেখকগণ তখন সে আশাও পরিত্যাগ করিয়াছে। তখন আমাদের সমাজের নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর। অক্ষয় দত্ত

তখন বালির বাগানে বাস করিতেছেন। তখন বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবাবিবাহ-আইন পাস হইয়া একটি-দুটি বিধবাবিবাহ হইতেছে। সে সময়ে হিন্দুসমাজের কোনো লোক কোনো সংস্কার বর্জন করিলেই সকলে তাহাকে ব্রাহ্ম বলিত। ওদিকে আবার দেখুন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির কৃপায় স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ ছড়াইয়া পড়িতেছে। তেমনি আবার ব্রাহ্মধর্মের প্রতিক্রিয়ায় একদল শিক্ষিত হিন্দু বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিয়া গিয়াছে। বাস্তবিকই সময়টা তখন যুগান্তর ছিল। বর্তমানে আমরা যেসব সুফল ও কুফল ভোগ করিতেছি তখন তাহাদের কারণ ঘটিতেছিল। এই সময়টাকে শিবনাথ ভালো করিয়া জানিতেন; প্রধানত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে জানিতেন, তিনি সেই সময়ের লোক। তাহা ছাড়া সেই যুগনাট্যের পাত্রপাত্রীর মধ্যে তিনিও অন্যতম ছিলেন, আর যেটুকু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় অজ্ঞাত ছিল, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজের লেখকহিসাবে তৎসম্বন্ধে তাঁহার পরোক্ষ জ্ঞানের অভাব ছিল না। এই সময়টাকে তিনি বাছিয়া লইয়াছিলেন, সকল লেখকই সুবিধামত সময় বাছিয়া লয়। কাজেই দেখিতে পাই তাঁহার সবগুলি উপন্যাসেই যুগান্তরের হাওয়া বহমান—

> ওদিকে বঙ্গদেশে মহা পরিবর্তনের দিন আসিতেছে। বঙ্গের সাহিত্যাকাশে ধূমকেতুর ন্যায় মধুসূদন উঠিয়াছেন। পাথুরিয়াঘাটার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও পাইকপাড়ার প্রতাপনারায়ণ সিংহ প্রভৃতি সমবেত হইয়া বঙ্গকাব্যের এক অদ্ভুত অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের প্ররোচনায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার বিখ্যাত নাটকাবলী প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ত্বরায় তিলোত্তমা ও মেঘনাদবধ দেখা দিল।
>
> বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তে এই ১৮৫৯ সাল চিরস্মরণীয় বৎসর। ভক্তি-ভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দুই বৎসর কাল পর্বতশৃঙ্গে তপস্যায় যাপন করিয়া ঋষিত্ব লাভ করিয়া এই বৎসরে বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সেইসকল অগ্নিময় উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন, যাহা তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রতিভার চিরস্মরণীয় কীর্তিস্তম্ভরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। এমন দিন আসিবে, যখন সেগুলি বঙ্গভাষায় শ্রেষ্ঠ অলংকার বলিয়া সর্বত্র আদৃত হইবে। এই বৎসরেই খ্যাতনামা কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রাচীন দেবেন্দ্রনাথের সহিত তরুণ কেশবের সম্মেলনে নূতন বল আনিয়া দিল। উভয়ে একত্র হইয়া কলিকাতার যুবকগণকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। যুবকদলে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল; অনেক ব্রাহ্মণের সন্তান উপবীত

ত্যাগ করিলেন, এবং নানাস্থানে যুবকগণ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের জন্য নিগ্রহ সহ্য করিতে লাগিল। এইসকল বিবরণ শুনিয়া একদিন নবীনচন্দ্র পঞ্চুকে বলিলেন —পঞ্চু, এইবার বুঝি সতই সত্যই যুগান্তর ঘটিল। তোমার ব্রাহ্ম সমাজে ও বঙ্গদেশে বুঝি এইবার নবযুগ আসিল। —যুগান্তর

উমাকান্ত আসিয়াই তাঁহার আদর্শপুরুষ বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত তিনবার দেখা করিয়াছেন। অক্ষয়বাবু তখন গঙ্গার সন্নিকটস্থ বালী গ্রামে একটি উদ্যান রচনা করিয়া তন্মধ্যে বাস করিতেছিলেন। উমাকান্ত সেখানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন, একজন কৃতবিদ্য চিন্তাশীল উদারচেতা মানুষ জীবনের অবসানকাল কিরূপে যাপন করিতে পারে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যে তিন দিন আলাপ হইয়াছে সে তিন দিন সমুদায় কেবল নব নব জ্ঞানের কথাতে অতিবাহিত হইয়াছে।... তৎপরে দত্তজামহাশয় নিজের অর্ধলিখিত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের উপক্রমণিকার কিছু কিছু পড়িয়া শুনাইয়াছেন।... গড়ের উপরে অক্ষয়বাবুকে দেখিয়া তাঁহার আদর্শ, চিন্তাশীল পুরুষের ভাব বাড়িয়াছে বই কমে নাই;... কিন্তু একটা বিষয়ে তাঁহার কিঞ্চিৎ ধোঁকা লাগিয়াছে। প্রথম সাক্ষাতের দিন অপরাপর কথার মধ্যে অক্ষয়বাবু বলিয়াছিলেন, আমি যখন বাহ্যবস্তু প্রভৃতি গ্রন্থ লিখি, তখন আমার যে জ্ঞান ছিল না, এখন সে জ্ঞান হইয়াছে, আমি দেখিতেছি যে, ইউরোপীয়দের ন্যায় মানসিক শ্রম করিতে হইলে আমাদিগকে ইউরোপীয়দের ন্যায় থাকিতে হইবে। —উমাকান্ত

আবার

অক্ষয়বাবু অপেক্ষা বিদ্যাসাগরমহাশয়ের সহিত উমাকান্তের ঘনিষ্ঠতা কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে। বিদ্যাসাগরমহাশয় তখন তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বহুবিবাহ-বিষয়ক গ্রন্থ লিখিবার আয়োজন করিতেছিলেন। —তদেব

অন্যত্র

উমাকান্ত রাজারামবাবুর সুপারিশপত্র লইয়া পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের নিকট পরিচিত হইয়াছেন এবং পাবলিক লাইব্রেরি হইতে পুস্তক আনিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন।—তদেব

পুনশ্চ

শ্যামাকান্ত কেবলমাত্র সভাতে বক্তৃতা করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই, গীতার একটি নূতন এডিশন বাহির করেন, এবং 'বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম' নামে একখানি

বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করেন।···ইহার পরে তিনি নিজে এক বৈজ্ঞানিক টিকি রাখিলেন এবং বহুদিনের পরে কোশাকুশি লইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যা-আহ্নিক আরম্ভ করিলেন। —তদেব

শিবনাথের উপন্যাসের আবহাওয়া বুঝিবার পক্ষে উদ্ধৃত অংশগুলি সাহায্য করিবে। উপরের অংশগুলিকে ইতিহাস বলা চলে; এই ইতিহাস উপন্যাসকে কিভাবে সংক্রামিত বা প্রভাবিত করিয়াছে দেখা যাক।

এই ঐতিহাসিক যুগান্তরের প্রভাব শিক্ষিত সমাজের মনের উপরে বিচিত্র প্রতিক্রিয়ায় দেখা দিতেছিল। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি যে ব্রাহ্মসমাজের দিকে ঝুঁকিতেছিল এ কথা বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না, কারণ নামতঃ ব্রাহ্ম না হইয়াও অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের সমাজসংস্কারের ও জীবনসংস্কারের কার্যসূচী গ্রহণ করিতেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ উমাকান্ত উপন্যাসের উমাকান্তকে লওয়া যাইতে পারে। সে গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তান, তাহাকে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত বলিবার উপায় নাই—কিন্তু সে এমন-এক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যখন ব্রাহ্ম-পদ্ধতিতে মেয়ের বিবাহ দিয়াছে, আনুষ্ঠানিকভাবে মাতৃশ্রাদ্ধ করে নাই এবং বিধবাবিবাহ-ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছে। শেষের কাজটিতে পাই বিদ্যাসাগরের প্রভাব। উমাকান্ত বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিল। শিবনাথের উপন্যাসের আদর্শ চরিত্রগুলির অনেকেই উমাকান্তের ছাঁচে ঢালাই করা। নয়নতারা উপন্যাসের কালীপদ রায় এই ছাঁচে গড়া লোক। উমাকান্ত উপন্যাসের অন্যতম নায়ক নরেশ একটি অনুতপ্ত পতিতাকে বিবাহ করিয়াছে, এ-বিষয়ে উমাকান্ত তাহার প্রধান সহায়। আবার চারু, সেও উক্ত গ্রন্থের অন্যতম ব্যক্তি, একটি বিধবা বিবাহ করিয়াছে—বলা বাহুল্য উমাকান্ত তাহারও প্রধান সহায়। যেকালে দুর্গামোহন দাস আপন বিমাতার বিবাহের উদ্যোগী ছিলেন, খোদ শিবনাথ পঠদ্দশাতেই সহপাঠী যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের সহিত বিধবাবিবাহের কর্তা সাজিয়াছিলেন এবং অমিতকর্মী বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রাণপণ করিয়া বসিয়াছিলেন, সেকালের ঘটনা লিখিতে বসিলে ইহা ছাড়া আর উপায় কি? উপায় না থাকিলেও কাজটি বড় সহজ ছিল না; বাস্তবে তো বটেই, এমন কি উপন্যাসেও। শিবনাথের প্রথম উপন্যাস মেজ বৌ (১৮৮০), তাহাতে পাত্রপাত্রীর মধ্যে বিধবাবিবাহ ঘটাইবার ইচ্ছা থাকিলেও লেখক শেষ পর্যন্ত যাইতে পারেন নাই। পরবর্তী উপন্যাস যুগান্তরে ও উমাকান্তে এই ইচ্ছা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। উমাকান্তর উপরে অক্ষয় দত্তর প্রভাবের বিষয় আগেই উল্লেখ করিয়াছি।

সে সময়ে আর-একটি প্রভাব অনেকের মনে পড়িয়াছিল, সে হইতেছে জ্ঞানবাদের পরিণামজাত সংশয়বাদের প্রভাব। উমাকান্ত উপন্যাসের যে অন্যতম নায়ক নরেশের কথা এইমাত্র বলিলাম, তাহাকে প্রথমে দেখি সংশয়ীরূপে। সে সংশয়বাদ-ঘেঁষা শিক্ষিত লোক, আমিষ আহার করাই যে মানুষের পক্ষে প্রকৃতির বিধান ইহাই তাহার বিশ্বাস; পরিমিত সুরা পান এবং বাইনাচ দেখা অকর্তব্য নয়, ইহাও সে প্রমাণ করিতে চায়। এ-বিষয়ে বন্ধু উমাকান্তর সঙ্গে তাহার মতে মেলে না; অথচ সে নিজে সুরাপায়ী বা দুশ্চরিত্র নয়, সে গম্ভীর প্রকৃতির বিবেচনাশীল ব্যক্তি। নরেশ-চরিত্র তখনকার শিক্ষিত সমাজের একটি টাইপ, যেমন একটি টাইপ উমাকান্ত নিজে। আর-একটি টাইপ হইতেছে উমাকান্তর ভাই শ্যামাকান্ত, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। সে বৈজ্ঞানিক হিন্দু, নিজে বৈজ্ঞানিক টিকি রাখিয়াছে, গীতার বৈজ্ঞানিক সংস্করণ বাহির করিয়াছে; রবীন্দ্রনাথ এই টাইপ-এর কথা স্মরণ করিয়াই লিখিয়াছিলেন—

পণ্ডিত ধীর, মুণ্ডিত শির,
প্রাচীনশাস্ত্রে শিক্ষা—
নবীন সভায় নব্য উপায়ে
দিবেন ধর্মদীক্ষা।
কহেন বোঝায়ে, কথাটি সোজা এ,
হিন্দুধর্ম সত্য—
মূলে আছে তার কেমিস্ট্রি আর
শুধু পদার্থতত্ত্ব।
টিকিটা যে রাখা, ওতে আছে ঢাকা
ম্যাগ্নেটিজ্‌ম্‌ শক্তি,
তিলকরেখায় বৈদ্যুত ধায়
তাই জেগে ওঠে ভক্তি।

এটা বোধ করি শশধর তর্কচূড়ামণির প্রভাবের ফলে। শ্যামাকান্ত বৈজ্ঞানিক হিন্দু হইলেও, কিংবা খুব সম্ভব হইবার ফলেই, সুরা পান করে, বাইনাচ প্রভৃতি দেখে, প্রথমা পত্নী থাকিতেও দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়, সে নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিক করিয়া থাকে।

শিবনাথ শাস্ত্রী নূতন হাওয়ার পক্ষপাতী। কিন্তু তাই বলিয়া প্রাচীন পন্থা বা প্রাচীনপন্থীগণের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার অভাব নাই। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের

ইতিহাস স্মরণ করিলে মনে হইতে পারে যে, শ্রদ্ধার অভাব হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে, শিবনাথের মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকে এবং পিতা হরানন্দকে যে দেখিয়াছে, প্রাচীন পন্থার প্রতি তাহার অশ্রদ্ধা হইতেই পারে না। নয়নতারার বিদ্যার্ণব এবং উমাকান্ত উপন্যাসের রামগতি প্রাচীন পন্থার প্রতিনিধি, তাহাদের প্রতি পাঠকের যে শ্রদ্ধা জন্মে তাহার কারণ লেখকের নিজেরও শ্রদ্ধার অভাব ছিল না।

যুগান্তরের হাওয়ায় সমাজে যেমন নূতন টাইপ দেখা দিতেছিল তেমনি ঘটনা-স্রোতও অপ্রত্যাশিত পথে চলিতেছিল। যুগান্তর উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ যে দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুখানি স্বতন্ত্র উপন্যাসের সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছে তাহার কারণ ইহাই। এক দিকে নশিপুরের প্রাচীন সমাজ, আর-একদিকে কলিকাতায় নবীন সমাজ—নশিপুরের জীবনপ্রবাহ কলিকাতায় প্রবেশ করিয়া পূর্বতন পথচিহ্ন হারাইয়া ফেলিয়াছে। শিবনাথের সৃষ্টি আরও শক্তিসম্পন্ন হইলে তিনি এই দুই বিরুদ্ধমুখী স্রোতের মধ্যে নৌকাকে ফেলিয়াও তাহাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু যথাযথ শক্তির অভাবে তাহা হইয়া ওঠে নাই নশিপুরের সুন্দর নৌকাখানি শেষপর্যন্ত বানচাল হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অভিযোগের কারণ নিহিত রহিয়াছে তখনকার সামাজিক হাওয়ার এলোমেলো গতির মধ্যে।

শিবনাথের উপন্যাসের আর্থিক কাঠামো স্মরণ করিলে মন ঈর্ষায় ভরিয়া ওঠে, ইহার উপরেও তৎকালের ছাপমারা। তখন কোনো রকমে একটা পাস করিলেই চাকুরি জুটিত, পাস করিতে না পারিলেও চাকুরির অভাব হইত না। উমাকান্ত পাস-করা লোক নয়, গ্রামের পাঠশালায় পাঁচ টাকা বেতনে যাহার জীবনের সূত্রপাত তাহাকে দেখিতে পাই ছয় শত টাকা বেতনের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া পেনসন লইতেছে। তখন যে কেবল শহরে আসিলেই চাকুরি জুটিত এমন নয়, ম্যাজিস্ট্রেট সুদূর গ্রামে নিজের চাপরাশি পাঠাইয়া দিয়া উমেদারকে খুঁজিয়া বাহির করিত। শিবনাথের উপন্যাসে যা-কিছু দারিদ্র্য তাহা পল্লীসমাজে, শহরের সমাজে, অর্থাৎ শহরের শিক্ষিত সমাজে দারিদ্র্যের বড় চিহ্ন নাই, আর থাকিলেও তাহা ক্ষণিক, কারণ আজ যে দরিদ্র, কাল সকালবেলাকার গেজেটে তাহার চাকুরি ঘোষিত হইতে পারে, কিংবা তেমন বরাত-জোর থাকিলে ম্যাজিস্ট্রেটের চাপরাশি আসিয়াও দরজার কড়া নাড়িয়া উমেদারের ঘুম ভাঙাইতে পারে। কিন্তু অনেকদিন হইল সুলভ চাকুরির সে সত্যযুগ অপসৃত। এখন সেসব কথাকে অনেক পরিমাণে অবাস্তব মনে হয়।

৩

ঔপন্যাসিক শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রধান গুণ চরিত্রসৃষ্টিতে। চরিত্রসৃষ্টি দুই উপায়ে হইতে পারে—পর্যবেক্ষণশক্তির দ্বারা, আর কল্পনাশক্তির দ্বারা। দুইয়েরই জন্য প্রচুর সমবেদনার আবশ্যক। সমবেদনাজাত পর্যবেক্ষণশক্তির বলেই শিবনাথ চরিত্রসৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এখানে জিজ্ঞাস্য, সমাজের কোন্ শ্রেণীর লোকের প্রতি তাঁহার সমবেদনা। যেসব নরনারী নূতন জীবনপন্থাকে সার্থকভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে তাহাদের প্রতি লেখক সহানুভূতিশীল, আবার যাহারা প্রাচীন পন্থাকে নিষ্ঠার সহিত আঁকড়িয়া রহিয়াছে তাহাদের প্রতিও লেখকের যথেষ্ট সহানুভূতি। কেবল যাহারা মধ্যবর্তী, নূতন শিক্ষাকেও গ্রহণ করিতে পারে নাই, আবার পুরাতন ধারাকেও পরিত্যাগ করিয়াছে, লেখক তাহাদের দেখিতে পারেন না। দৃষ্টান্তচ্ছলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যুগান্তরের বিশ্বনাথ তর্কভূষণকে; নূতন ধারার সার্থক গ্রহীতাদের অনেকেরই নাম করা যায়। নূতন ধারার নরনারীর সঙ্গেই লেখকের সহানুভূতি স্বাভাবিক, কিন্তু প্রাচীন ধারার সার্থক গ্রহীতাগণও যে লেখকের সহানুভূতি হারায় নাই, তাহাতে দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শিবনাথের সুগভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়।

শিবনাথের অঙ্কিত নরনারীর মধ্যে নারীচরিত্রগুলিই অধিকতর বাস্তব ও সার্থক। ইহার প্রধান কারণ নারীচরিত্রে নিষ্ঠা ও আদর্শবাদপ্রিয়তা স্বভাবসিদ্ধ। 'পতিদেবতা'-ভাবটির বাড়াবাড়ি হয়তো ভালো নয়। কিন্তু 'পতিদেবতা'-ভাবটিকে অবলম্বন করিয়াই এ দেশের নারী-সমাজ নিজেদের অন্তরের মধ্যে নিষ্ঠার চর্চা করিয়া আসিয়াছে। সেই নিষ্ঠা ঘটনাচক্রের অনুরোধে যে ভাবটিকে গ্রহণ করিয়াছে তাহাকেই আঁকড়িয়া ধরিয়াছে, সেই ভাবটিই নারীর চরিত্রে 'পতিদেবতা'র বিকল্প হইয়া সজীব হইয়া তাহাকে এমন একপ্রকার দৃঢ়তা দিয়াছে, পুরুষচরিত্রে যাহার অনুরূপ পাওয়া দুষ্কর। উদাহরণস্থল নয়নতারা। নয়নতারা নূতন ধারার অন্তর্গত নারীচরিত্র। তাহার আচরণ ও কথাবার্তায় কোথাও নীতিগ্রন্থের গন্ধ থাকিলেও—শিবনাথের উপন্যাসে অনেকস্থলেই ইহার দৃষ্টান্ত মিলিবে—সে একান্ত সজীব ও বাস্তব। শেষপর্যন্ত তাহার বিবাহ যখন ভাঙিয়া গেল, সে নিজে ভাঙিয়া পড়িল না; মহত্তর জীবনের আদর্শকে অপ্রাপ্য প্রণয়ীর আদর্শরূপের সহিত মিলাইয়া লইয়া একক জীবন যাপন করিতে সে বদ্ধপরিকর হইল। তাহার দুঃখে পাঠকের সহানুভূতি হয়, আবার তাহার নিষ্ঠা দেখিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধাও জন্মে।

শিশু ও বালকবালিকা-চরিত্র অঙ্কনেও লেখকের কৃতিত্ব অসাধারণ। এত বালকবালিকার চরিত্রসৃষ্টি অল্প বাঙালি লেখকই করিয়াছেন। ইহারা নবীন ও প্রাচীন দুই ধারারই বাহিরে; কোনো বিশেষ মতের অনুরোধ নয়, কেবল মানব চরিত্রের আকর্ষণেই সার্থক বালকবালিকার চরিত্র সৃষ্টি করা যায়।

শিবনাথের আর-একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার সহানুভূতি কেবল মানব-সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ নয়, পশুপাখির প্রতিও তাঁহার দরদ গভীর। কুকুর বিড়াল খরগোশ টিয়া ময়না হরিণ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষীকে এমন সহৃদয়তার সহিত দেখিয়াছেন যে তেমন আর-কোনো বাংলা লেখকের রচনায় দেখিতে পাই না। তাঁহার সমবেদনাগুণের সহকারী গুণ হাস্যরস। হাস্যরসের চকমকি ঠুকিতে ঠুকিতে তিনি সংসারপথে অগ্রসর হইয়াছেন—তাহাতে পথের দূরত্ব কমে নাই বটে, কিন্তু পথ চলার কাজটা অনেক সহজ হইয়াছে।

ঔপন্যাসিক হিসাবে শিবনাথের প্রধান ত্রুটি এই যে চরিত্র-অঙ্কন-ক্ষমতা তাঁহার যেমন প্রচুর, গল্প-গ্রন্থন বা প্লট-সৃষ্টির ক্ষমতা তেমনি অল্প, সেদিকে তাঁহার যেন দৃষ্টিই নাই। অনেক সময়েই গল্পের মূলধারাকে ফেলিয়া রাখিয়া তিনি চরিত্রব্যাখ্যা, নয় মতপ্রতিষ্ঠা করিতে বসেন। এই রকম একটি অনবধানতার সুযোগেই যুগান্তর-কাহিনী দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার কাহিনী নরনারীর চরিত্রবেগে অগ্রসর হইতে জানে না, তাই লেখককে অগ্রসর হইয়া আসিয়া মতবাদের শুষ্ক-ডাঙায়-ঠেকিয়া-যাওয়া কাহিনীকে ঠেলিয়া অগ্রসর করিয়া দিতে হয়; তবে সব সময়েই যে এমন ঘটিয়াছে তাহা নয়।

আর-একটি ত্রুটি, যেসব ঘটনার বিবরণ তিনি শুনিয়াছেন বা যেসব বাস্তব লোক দেখিয়াছেন তাহাদের অনেকগুলিকেই শিল্পসম্মত উপায়ে সংশোধিত করিয়া না লইয়াই কাহিনীর অন্তর্গত করিয়া দিয়াছেন। এমন প্রক্রিয়া ইতিহাসরচনায় চলিতে পারে, উপন্যাসরচনায় চলা উচিত নয়। প্রসঙ্গক্রমে শিবনাথের রচনা সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুতর প্রশ্নটিতে আসিয়া পড়িলাম। শিবনাথ স্বভাবত ঐতিহাসিক, ঔপন্যাসিক নহেন। উনবিংশ শতকের বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস রচয়িতাদের মধ্যে আমি তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। তাঁহার উপন্যাসগুলিও নামান্তরে সামাজিক ইতিহাস। এগুলিতে ঔপন্যাসিকের ও ঐতিহাসিকের যুগল দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া তাঁহার লেখনী দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছে। তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব না থাকায় তাহা স্বাধীনভাবে স্বকার্যসাধন করিতে পারিয়াছে। আর যে চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা তাঁহার

স্বভাবসিদ্ধ, যে হাস্যরস তাঁহার সহজাত, সে দুটি গুণও উক্ত গ্রন্থে কাজে লাগিয়া গিয়া এমন-এক একনিষ্ঠ সার্থকতা লাভ করিয়াছে, উপন্যাসে যাহা বিরল।

তাঁহার সবগুলি উপন্যাসই রামতনু লাহিড়ীর আগে লিখিত। বিধবার ছেলে ও তাহার বিকল্প উমাকান্ত পরে প্রকাশিত হইলেও লিখিত হইয়াছে আগে। তাই মনে হয় যে তাঁহার সামাজিক উপন্যাসগুলি তাঁহার সামাজিক ইতিহাসের খসড়া। সেই কারণেই বোধ করি সামাজিক ইতিহাসখানা লিখিবার পরে তিনি আর সামাজিক উপন্যাস লিখিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কাহিনী ও ইতিহাসের জোড় মিলাইবার বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া নিছক ইতিহাসরচনায় তিনি শ্রেষ্ঠ চরিতার্থতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তখন তাঁহার কলম আর উপন্যাসরচনার পথে ফিরিতে চাহে নাই। ঔপন্যাসিক শিবনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা রামতনু লাহিড়ী—ইতিহাসের তথ্য ও কল্পনার সত্য মিলিত হইয়া ইহাকে বাংলা সাহিত্যের একখানা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থে পরিণত করিয়াছে।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

১৮৪৭-১৯১৯

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃতপ্রায় লেখক। বড়ই বিস্ময়ের কথা। বসুমতী গ্রন্থাবলী-সিরিজ ব্যতীত তাঁহার গ্রন্থ বাজারে পাওয়া যায় না।[১] বসুমতী গ্রন্থাবলীও সম্পূর্ণ নহে। তাঁহার ইংরেজি রচনা ভারতীয় শিল্পের পরিচয়-গ্রন্থাবলী বোধ করি দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথের কঙ্কাবতী গ্রন্থখানার কথা কোনো কোনো পাঠকের মুখে শুনতে পাওয়া যায়। তবে সে অনেকটা কিংবদন্তীর মত, পঠিত-অভিজ্ঞতা বলিয়া মনে হয় না। বাংলা সাহিত্যের একজন major বা মহৎ লেখকের এমন অবলুপ্তি যুগপৎ দুঃখ ও বিস্ময়ের হেতু।

ত্রৈলোক্যনাথ বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গসাহিত্যিক বা satirist। সৌভাগ্যের বিষয়, বাংলা সাহিত্যে স্যাটায়ার বা স্যাটায়ারিস্টের অভাব নাই। মাইকেল হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অধিকাংশ বাংলা সাহিত্যিকের রচনায় কিছু-না কিছু স্যাটায়ার আছে, কিন্তু কেহই বিশুদ্ধ ও নিছক ব্যঙ্গরচনায় আত্মনিয়োগ করেন নাই। তাঁহাদের দৃষ্টি ব্যঙ্গসাহিত্যিকের দৃষ্টি নয়; ব্যঙ্গসাহিত্যিক যে-দৃষ্টিতে জীবনকে দেখিয়া থাকেন সে-দৃষ্টিতে তাঁহারা অভ্যস্ত নন, সে-দৃষ্টি তাঁহাদের স্বভাব-সিদ্ধ নয়। ত্রৈলোক্যনাথ ব্যঙ্গের বক্রদৃষ্টি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; বিশুদ্ধ ও নিছক ব্যঙ্গরচনাতেই তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

এখন একজন বিস্মৃতপ্রায় লেখকের পক্ষ হইতে এত বড় দাবির উত্থাপন অনেকের কাছেই বিস্ময়কর লাগিতে পারে; কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে স্মৃতি ও বিস্মৃতি, খ্যাতি ও অবলুপ্তি বিচারের অপেক্ষা রুচির উপরেই বেশি নির্ভর করে; আর রুচির ন্যায় পিচ্ছিল ও চঞ্চল বৃত্তি অল্পই আছে, কাজেই ত্রৈলোক্যনাথের অবলুপ্তিতে বিস্মিত না হইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াই উচিত। বিচারান্তে যদি প্রমাণ হয় আমরা তাঁহার পক্ষ হইতে যে দাবি উত্থাপন করিলাম তাহা সত্য, তবে প্রসন্নমনে বাংলা সাহিত্যের ব্যঙ্গরচনার শ্রেষ্ঠ আসনখানি তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়াই সংগত। রচনার পরিমাণ ও গুণ এই দুই দিকের বিচারেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত

১ সম্প্রতি শ্রীবিজন হারী ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'কঙ্কাবতী' পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে।

হইবে। কিন্তু তদপেক্ষা বড় কথা এই যে, ব্যঙ্গশিল্পীর সম্পূর্ণ সহজাত বক্রদৃষ্টি লইয়াই ত্রৈলোক্যনাথ জন্মিয়াছিলেন, এই দৃষ্টির সম্পূর্ণতার অধিকারী বাংলা সাহিত্যে তিনি একাই। অপর যাঁহারা ব্যঙ্গরচনা করিয়াছেন, ব্যঙ্গ তাঁহাদের পক্ষে অধিকাংশক্ষেত্রেই *tour de force*, স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার নহে।

ত্রৈলোক্যনাথের জীবনের ঘটনা ও ভাবনার ধারা না বুঝিলে তাঁহার সাহিত্য বোঝা দুর্ঘট হইবে। তাঁহার বাল্যকালের ও প্রথমযৌবনের দুঃখদারিদ্র্য, সেই দুঃখ দারিদ্র্যের প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহার মনুষ্যত্ব, অপরের দুঃখদুর্দশার প্রতি তাঁহার সমবেদনাপূর্ণ আত্মীয়তা—এ সমস্তই একাধারে তাঁহার জীবনের ও সাহিত্যের উপকরণ। একটিকে জানিলে তবে অপরটি বুঝিয়া ওঠা সহজ। তার পরে কর্মজীবনে দেশের সর্বব্যাপী দারিদ্র্য ও অসহায় ভাব দেখিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—যেমন করিয়া পারেন, আমৃত্যু দেশের দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। তাঁহার কর্মজীবন, দেশীয় শিল্প প্রসারের প্রয়াস, দেশীয় শিল্পের ইতিহাস রচনা, পরিণত বয়সে আজন্মের সংস্কারের বিরুদ্ধে বিলাতযাত্রা—সমস্তই এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার অংশ। কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণের পরে পূর্বতন ভাবে প্রতিজ্ঞা রক্ষার উপায় ছিল না, তখন প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত তিনি সাহিত্যসৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার রচনা তাঁহার জীবনকর্মেরই একটা প্রক্ষেপ মাত্র তাঁহার অবসরজীবন তাঁহার কর্মজীবনের রূপান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। কর্মে ও অবসরে, ঘটনায় ও ভাবনায় এ রকম একপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তি বাংলাদেশে সত্যই বিরল। ব্যক্তিত্বের বিচারে শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বাংলাদেশেও তাঁহার মত নিষ্ঠাসম্পন্ন মানুষ খুব বেশি জন্মগ্রহণ করেন নাই।

এখন হইতে এক শতাব্দী পূর্বে, ১২৫৪ (১৮৪৭) সালের ৬ শ্রাবণ, ত্রৈলোক্যনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা অসচ্ছল ছিল। কতকটা সেই কারণে, কতকটা সেকালের নূতন-আমদানি ম্যালেরিয়ার জন্য, আর অল্প বয়সেই পিতার লোকান্তরপ্রাপ্তির ফলে তাঁহার ইস্কুলের লেখাপড়া অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। অল্প বয়সেই তাঁহাকে বিদ্যালয়-জাত জ্ঞানলাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া বৃহত্তর নিরুদ্দেশ সংসারে বাহির হইয়া পড়িতে হয়। তখন হইতে অজানা পৃথিবীর অনাত্মীয় পথঘাটই তাঁহার প্রকৃত বিদ্যালয় হইয়া উঠিল।

১৮৬৫ সালে পদব্রজে তিনি মানভূম-পুরুলিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স আঠারোর বেশি নহে। পথের কষ্ট অবর্ণনীয়। তার পরে ১৮৬৮

সালে তিনি কটক জেলায় পুলিশ-দারোগার সরকারি চাকুরিতে প্রবেশ করিলেন। মাঝখানের তিন বৎসর তাঁহার জীবনের দুর্বহ দুঃখকষ্ট ও খণ্ডিত চাকুরির ইতিহাস। এই তিন বৎসরে তিনি বীরভূমের দুইটি ইস্কুলে আর পাবনা জেলার সাজাদপুরের একটি ইস্কুলে শিক্ষকতা করেন।

এই তিন বৎসর পথে-ঘাটে যে দুঃখকষ্ট তিনি পাইয়াছেন তাহার প্রধান কারণ তাঁহার অনমনীয় আত্মসম্মানবোধ। দীর্ঘ বিদেশযাত্রায় বাহির হইতেছেন, হাতে একটিও পয়সা নাই, অথচ পরমাত্মীয়ের নিকটেও টাকাপয়সা চাহিবেন না। এমন লোকের পক্ষে অপরিচিত স্থানে ক্লেশ ছাড়া আর কি জুটিবে।

ত্রৈলোক্যনাথ লিখিয়েছেন—

আমার একটি আত্মীয় শ্রীযুক্ত হরকালী মুখোপাধ্যায় সেই সময়ে বর্ধমানে থাকিতেন। তিনি ডেপুটি-ইন্সপেক্টার অব্ স্কুলের কাজ করিতেন। স্কুল-মাস্টারির প্রার্থনায় তাঁহার নিকট গেলাম। প্রথমে তিনি কাটোয়ায় পাঠাইলেন, সেথায় কিছু হইল না। পরে বীরভূম জেলায় কীর্ণাহার নামক স্থানে পাঠাইলেন; সেখানেও হইল না। পরে তাঁহার কথায় রামপুরহাটে গেলাম, সেখানেও বিফল-মনোরথ হইলাম। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনকালে কপর্দকশূন্য অবস্থায় থাকিতাম, আত্মীয় হরকালী মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রার্থনা করিলে অবশ্য তিনি কিছু দিতেন, কিন্তু চাইতে পারিতাম না। লোকের বাটীতে অতিথি হইয়া পথ চলিতাম।

রামপুরহাট হইতে পদব্রজে শিউড়ি ফিরিয়া আসিয়া বর্ধমানের দিকে চলিলাম। পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূর গিয়া আর চলিতে পারিলাম না। নিতান্ত ক্লান্ত ও দুর্বল হইয়া পড়িলাম। অতি কষ্টে একখানি গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলাম। এক ব্যক্তির বাটীতে স্ত্রী-পুরুষের কাপড়ে চুন-হলুদ দেখিতে পাইলাম। মনে করিলাম, ইহাদের বাড়িতে কোনোরূপ শুভকার্য হইয়াছে, ইহাদের বাড়িতে খাইতে পাইব। তাহারা জাতিতে সদ্‌গোপ। বাটীর কর্তা বৃদ্ধ। বৃদ্ধের নিকট আমার সমুদয় দুঃখের কথা বলিলাম। অতি সমাদর করিয়া বৃদ্ধ আমাকে মুড়ি, গুড় ও ঘোল খাইতে দিল। অমৃতের অপেক্ষা তাহা আমাকে মিষ্ট লাগিল। দেহ আমার পুনর্জীবিত হইল। পুনরায় বর্ধমান অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

এ রকম অভিজ্ঞতা তাঁহার প্রথমজীবনে অবিরল। বাল্যকালে তিনি দরিদ্র ছিলেন, দুরন্ত ছিলেন; কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল তাঁহার বিদ্যাসাগরী প্রচণ্ড আত্মসম্মান-

বোধ। এই শেষোক্ত গুণটি তাঁহার চরিত্রে অতিমাত্রায় না থাকিলে শেষপর্যন্ত তিনি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

আর-একবারের কথা। ত্রৈলোক্যনাথ লিখিতেছেন—

> সন্ধ্যাবেলা আমি মেমারি আসিয়া পঁহুছিলাম। মেমারি স্টেশনের পুষ্করিণীর শানবাঁধা ঘাটে পড়িয়া রহিলাম; ভাবিতে লাগিলাম, দুদিন আহার হয় নাই; অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি; যদি আজ রাত্রেও অনাহারে এখানে শুইয়া থাকি তো কাল প্রাতে আরও দুর্বল হইয়া পড়িব, সুতরাং এখনি পথ চলা ভালো। রাত্রিতেই পথ চলিতে লাগিলাম। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পা আর উঠে না, একটা তেঁতুলপাতা পাড়িয়া লইলাম। তাহাই চিবাইতে চিবাইতে পরদিন বেলা বারোটার সময় মগরায় আসিলাম। শরীর অবসন্ন, আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। একটি পুরাতন ছাতা ছিল। একজন দোকানী সেই ছাতাটি বাঁধা রাখিয়া আমাকে ফলাহার করিতে দিল, আর গঙ্গা পার হইবার নিমিত্ত নগদ একটি পয়সা দিল। আমি বাটী আসিলাম।

ত্রৈলোক্যনাথের প্রথমজীবন এইরূপ শোচনীয় অভিজ্ঞতায় পূর্ণ—কিন্তু কথনোই তিনি আত্মসম্মানবোধ বিসর্জন দেন নাই।

ইহার পরে যখন তিনি উখড়ায় দ্বিতীয়-শিক্ষকের কার্য করিতেছেন, তখন সেখানে এক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ক্ষুধার কঙ্কালসার মূর্তি চারি দিকে। অপরের ক্ষুধার সঙ্গে নিজের ক্ষুধাও মিশিল। দেশের শিশুভাইদের জন্য টাকা বাঁচাইতে গিয়া অনেক দিনই তাঁহাকে একান্ন, কথনো-কথনো বা সারাদিন অনাহারে থাকিতে হইত। ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলে শীতল জল পান করিয়া শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ করিতেন। সেই সময়ে দ্বিবিধ ক্ষুধার অশ্রু-সরস্বতীর তীরে বসিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—

> যাহাতে এই স্বর্ণভূমি ভারতভূমিতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত না হইতে পারে, এইরূপ কার্যে আমার মনকে আমি নিয়োজিত করিব। সেই দিন হইতে এই সম্বন্ধে যাহাকিছু শিখিবার আবশ্যক শিখিতে লাগিলাম। তখন মনে মনে এই স্থির হইয়াছে যে, ভারতের লোক যদি নিজে নিজে একটু যত্ন করে, তাহা হইলে এ দেশের অন্তত অর্ধেক দুঃখও দূর হইতে পারে। আজ পর্যন্ত এই বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের চক্ষু উন্মীলিত করিতে যত্ন পাইতেছি। কিন্তু কি করিব, সকলেই আপনার নিজের স্বার্থের জন্য ব্যস্ত। যাহাতে দেশের দুঃখমোচন হয়, এরূপ চিন্তা অল্প লোকেই করিয়া থাকেন; বড়জোর নাহয়

ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে কতকগুলি লোককে বৎসরের মধ্যে এক দিন কি দুই দিন আহার দিয়া থাকেন। কিন্তু গরীবদুঃখী লোকেরা চিরকালের জন্য যাহাতে এক মুঠা অন্ন পায়, এরূপ কার্যে কয়জনের দৃষ্টি আছে?

ত্রৈলোক্যনাথের এই প্রতিজ্ঞাই তাঁহার জীবন ও সাহিত্যের মেরুদণ্ড। তাঁহার কর্মজীবন ও সাহিত্যজীবনকে এই একটি মেরুদণ্ডই বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে। কর্মের দ্বারা যতদিন সম্ভব এই প্রতিজ্ঞাপালনে তিনি তৎপর ছিলেন, কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সাহিত্যসৃষ্টির দ্বারা জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি এই প্রতিজ্ঞা-পালনে নিযুক্ত ছিলেন। কাজেই তাঁহার সাহিত্য বুঝিবার পক্ষে তাঁহার প্রতিজ্ঞা, এবং প্রতিজ্ঞার পটভূমিস্বরূপ তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা প্রথমে বুঝিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক বলিয়াই এত বিস্তারিতভাবে তাঁহার জীবনের এই অংশটিকে ব্যাখ্যা করিতে হইল।

সরকারি চাকুরিতে ঢুকিয়া ত্রৈলোক্যনাথ দুইজন উদার ও উন্নতমনা ইংরেজের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্যর উইলিয়াম হাণ্টার ও স্যর এডওয়ার্ড বক্। ইহাদের সাহায্যে ও নিজের কর্ম-কুশলতায় তিনি ক্রমে ক্রমে গবর্মেণ্টের স্ট্যাটিস্টিক্স্ ও কৃষিবাণিজ্য বিভাগে দায়িত্বসম্পন্ন পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। কিন্তু সর্বদাই তিনি নিজের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ রাখিতেন। এই সময়ে দেশের শিল্প-প্রসারের জন্য তিনি একটি কাজ করিয়াছিলেন। বড় বড় রেলস্টেশনে ও হোটেলে দেশীয় শিল্পবস্তু রাখিয়া বিক্রয় করিবার যে ব্যবস্থা এখন চলিত আছে তাহা তাঁহারই প্রবর্তিত। ১৮৭৭-৭৮ সালে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। গাজরের চাষ করিয়া তদ্দ্বারা লোকের প্রাণরক্ষা করা যাইতে পারে, তিনি গবর্মেণ্টকে এই প্রস্তাবটি দেন। তাঁহার প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ হওয়াতে বহু সহস্র লোকের প্রাণ বাঁচিয়া যায়। অতঃপর তিনি রাজস্ববিভাগে বদলি হন।

১৮৮৬ সালে বিলাতে শিল্পপ্রদর্শনী আরম্ভ হয়। দেশীয় শিল্পপ্রসারে কিয়ৎ-পরিমাণে সাহায্য করিতে পারিবেন এই ভরসায় তিনি সামাজিক সংস্কারের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিলাতযাত্রা করেন। এই ভ্রমণবৃত্তান্ত তাঁহার Visit to Europe গ্রন্থে লিখিত আছে।

সরকারি চাকুরির শেষ কয়েক বছর তিনি কলিকাতা মিউজিয়ামের সহকারী কিউরেটারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি ১৮৯৬ সালে পেনসন লন।

১৯১৯এর নভেম্বর মাসে ৭৩ বৎসর বয়সে পুরীতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

তাঁহার প্রকৃত সাহিত্যজীবন সরকারি চাকুরি হইতে অবসর লইবার পরেই আরম্ভ হয়।

ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী দ্বিভাষিক, ইংরেজি ও বাংলা।

ইংরেজি গ্রন্থগুলি ভারতীয় শিল্প, কৃষিজাত দ্রব্যাদির বর্ণনা ও ইতিহাস। তাঁহার বাংলা রচনাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় স্কুলপাঠ্য বিজ্ঞান ও নীতি-বিষয়ক গ্রন্থ; তিনি ও তাঁহার অগ্রজ একযোগে বিশ্বকোষ নামে অভিধানগ্রন্থ-রচনার সূত্রপাত করেন; তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে তাঁহার রচিত সাহিত্য-গ্রন্থাবলী।

বর্তমান প্রবন্ধে তাঁহার সাহিত্যগ্রন্থাবলীই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইলেও উল্লেখ করা যাইতে পারে তাঁহার ইংরেজি ও বাংলা সমুদয় গ্রন্থই একই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত—দেশের কল্যাণসাধন। তাঁহার প্রথমজীবনের প্রতিজ্ঞার কথা কি ভাবে তিনি বিস্মৃত হইবেন?

২

স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গ উদ্দেশ্যমূলক শিল্প, অন্য শ্রেণীর সহিত ইহার প্রভেদ এইখানে। অন্য শিল্পের মৌলিক প্রেরণা যাহাই হোক, মূলটা গুপ্ত থাকে; কিন্তু ব্যঙ্গের মূলটা যে শুধু মুখ্য তাহাই নয়, মূলটাকে অনেক সময়েই গোপন রাখা চলে না। উপমার ভাষায় ব্যঙ্গ যেন মূলা; মূলটাই এখানে মুখ্য, সমস্ত গাছের লক্ষ্য ওই মূলটাকে পুষ্ট করিয়া তোলা। ইহাই ব্যঙ্গের প্রধান গুণ, আবার এইখানেই তাহার গুণের সীমা। ব্যঙ্গ অত্যুচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য, কিন্তু কোনো মতেই উচ্চতম শ্রেণীর সাহিত্যে গণ্য হইতে পারে না।

ব্যঙ্গ উদ্দেশ্যমূলক শিল্প, অর্থাৎ ইহাকে একপ্রকার প্রচারসাহিত্য বলা যাইতে পারে। মনুষ্যত্বের অনুকূলে ব্যঙ্গ চিরকাল প্রচারকার্য চালাইয়া যাইতেছে। কিন্তু মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। যে লোকটা স্বেচ্ছাকৃত নকিব হইয়া তারস্বরে তাহার পক্ষে প্রচারকার্য চালাইতেছে তাহাকে দ্বারের কাছেই রাখিয়া দেয়, আর যে কবিতা তাহার কানে-কানে স্বর্গীয় প্রলাপ-বাণী ঢালিতে থাকে, সাংসারিক প্রয়োজনসাধনে যে-প্রলাপের কিছুমাত্র উপকারিতা নাই, সেই স্বর্গীয় প্রলাপবাদিনীকে অন্তঃপুরের গোপন কক্ষে লইয়া গিয়া আদর করিয়া বসায়। সকল দেশে সকল কালেই কবিতার স্থান ব্যঙ্গের অনেক ঊর্ধ্বে।

ব্যঙ্গসাহিত্যিকগণ তাঁহাদের শিল্পের এই ন্যূনতার কথা জানেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের তেমন ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহারা প্রধানত সংসারের মঙ্গলসাধন করিতে

চান। মূলত তাঁহারা কর্মী, কিন্তু কর্মের একটা স্বাভাবিক সীমা আছে বলিয়াই যেন শিল্পের মাধ্যমে তাঁহাদের কর্মপ্রবণ চিত্ত আপনাকে প্রকাশ করিতে থাকে। ব্যঙ্গশিল্প সাহিত্যিকের কর্ম-শক্তিরই যেন একটা প্রক্ষেপ। এইজন্যই দেখা যায়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গসাহিত্যিকদের অনেকেই কর্মকুশলী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের সমস্ত ইচ্ছা কর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত হইবার সুযোগ পাইলে হয়তো তাঁহারা আর শিল্পমাধ্যমের প্রয়োগে অগ্রসর হইতেন না। আপাতত ভল্‌টেয়ার ও সুইফ্‌টের নাম মনে পড়িতেছে। ভল্‌টেয়ারের মত কর্মকুশলতা খুব অল্প সাহিত্যিকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। শুধু সাহিত্যিক কেন, ব্যবসায়ীদের মধ্যেও তাঁহার জুড়ি মেলা সহজ নয়। পরবর্তী কালে ধনোপার্জনে ও ব্যবসায়ে মধ্যবিত্তশ্রেণী যে সার্থক প্রবণতা দেখাইয়াছে, ভল্‌টেয়ার তাহার আদর্শস্থল। তাঁহাকে প্রথম সার্থক মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী বলা যাইতে পারে। অর্থোপার্জনে তাঁহার যে কেবল কুশলতা ছিল তাহা নয়, পন্থার ভালোমন্দ বিচারেরও অভাব তাঁহার ছিল। তৎকালে যুদ্ধের বাজারে টাকা খাটাইয়া, সব সময়ে সদুপায়ে নয়, তিনি প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এবারের যুদ্ধের বাজারের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলেন না বলিয়া খুব সম্ভবত তাঁহার মধ্যেকার ব্যবসায়ীটা পরলোকে বসিয়া বুক চাপড়াইয়া মরিতেছে। ভল্‌টেয়ারের আর্থিক-দুর্নীতিপরায়ণতার উল্লেখের জন্য এ প্রস্তাবের অবতারণা নয় তাঁহার কর্মকুশলতার বর্ণনার জন্য মাত্র। সংকীর্ণতর ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় যে কর্মীপুরুষ ছিলেন তাঁহার জীবনীপ্রসঙ্গে তাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি।

ব্যঙ্গশিল্পের উদ্ভবের কারণ কি? সময়ের গুণ ও ব্যক্তির বিশেষগুণের সমন্বয়ের ফলেই ব্যঙ্গশিল্পের, তথা সমস্ত শিল্পেরই, উদ্ভব হইয়া থাকে। মানুষের সমাজে এক-একটা যুগ আসে, ব্যঙ্গরচনার যাহা অনুকূল। ইউরোপের অষ্টাদশ শতক ছিল এইরকম একটা যুগ। এই যুগাধিনায়ক ছিলেন ভল্‌টেয়ার ও সুইফ্‌ট। সে যুগে কবির অভাব ছিল না, কিন্তু ব্যঙ্গই ছিল তখনকার প্রধান শিল্প। ব্যঙ্গ এবং ইতিহাস। এ দুই যতই ভিন্নশাখাশ্রয়ী হোক-না কেন, এক জায়গায় মিল আছে। দুইয়েরই অন্যতম মূল উপাদান সংশয় ও নাস্তিক্য। আধুনিক ইউরোপের শ্রেষ্ঠ স্যাটায়ার ও শ্রেষ্ঠ ইতিহাস একই শাখার ফল, একই রসে পুষ্ট। বাংলা সাহিত্যের অষ্টাদশ শতকের সঙ্গে ওদেশের অষ্টাদশ শতকের কার্যকারণের ঐক্য থাকা সম্ভব নয়, তৎসত্ত্বেও দেখি অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি ভারতচন্দ্র ছিলেন উঁচুদরের ব্যঙ্গলেখক। এ কেমন করিয়া হইল? তখন সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া কি একই হাওয়া বহিতেছিল?

এ যেমন গেল যুগের গুণ, তেমনি বিশিষ্ট ব্যক্তির গুণ আছে। সংসার ভালোয়-মন্দয় জড়িত। কোনো-কোনো লেখকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় স্বভাবতই ভালোর দিকে, কাহারও আবার মন্দর দিকে। সংসারের ভালো দেখিয়া কেহ-বা উল্লসিত হন মন্দটা দেখিয়া কেহ-বা ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠেন। আর ভালো-মন্দকে সমানভাবে দেখিবার সৌভাগ্য ও শক্তি মানুষের কদাচিৎ দেখা যায়, যে দেখিতে পারে সে শেক্‌স্‌পীয়ার হয়।

বুঝিলাম যে বিশিষ্ট কালগুণ আছে, আবার বিশিষ্ট ব্যক্তিগুণ আছে। কিন্তু এই দুইয়ের সমন্বয় হয় কিরূপে? কাকতালীয় না কার্যকারণসম্ভূত? ভালো-মন্দ সব সময়েই আছে, তবে এক-একটা সময়ে এক-একটা দিক উগ্রতর হইয়া ওঠে, আর এমন হইবার পিছনে পূর্বগামী অনেক কার্যকারণের ধাক্কা থাকে। সাধারণত দেখা যায়, কোনো-একটা মহৎ আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত যুগের অবসানকালই ব্যঙ্গের প্রাদুর্ভাবের সময়। রেনেসাঁসের ক্ষয়িত প্রভাবের যুগে ভল্‌টেয়ার, বৈষ্ণব সাহিত্যের উন্মাদনার পরে বিদ্যাসুন্দর; বিদ্যাসুন্দর রাধাকৃষ্ণের প্রচ্ছন্ন স্যাটায়ার মাত্র।

জগতের কল্যাণরূপ যেসব শিল্পীর চোখে পড়ে তাহারা জগতের কবিশ্রেষ্ঠ হয়। গ্যেটে আছেন, রবীন্দ্রনাথ আছেন, ইঁহারা কখনো-কখনো স্যাটায়ার-রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু তেমন সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই, দৃষ্টিভঙ্গী ও যুগধর্ম দুইই প্রতিকূল। শেলি ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ একই কারণে বারংবার ব্যর্থকাম হইয়াছেন।

ভল্‌টেয়ার তৎকালীন ধর্মান্ধতা ও বুদ্ধির মূঢ়তা দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণোজ্জ্বল ব্যঙ্গ-পুস্তিকার বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার হাসি তাঁহার ক্রোধের চেয়েও মারাত্মক। মানবজীবনের দুঃখের লবণাম্বুরাশির দ্বীপমালায় ভ্রান্ত পথিক ইউলিসিসের মত ভল্‌টেয়ার গৃহে ফিরিয়া দেখেন যে মানুষের শুভ বুদ্ধিকে মূঢ় প্রণয়ীর দল ঘিরিয়া ধরিয়াছে। তখন তাঁহার ধনুক হইতে যে Candide-শর নিক্ষিপ্ত হইল তাহা আজিও মূঢ়তার সপ্ততাল ভেদ করিতে করিতেই চলিয়াছে। ভল্‌টেয়ার কখনো ভোলেন নাই যে ব্যঙ্গ উদ্দেশ্যমূলক, এবং নিজের উদ্দেশ্যের মূল সম্বন্ধেও তিনি সর্বদা সচেতন ছিলেন যে ধর্মান্ধতা ও মূঢ়বুদ্ধিই মানুষের শ্রেষ্ঠ শত্রু।

পূর্বেই বলিয়াছি, ব্যঙ্গরসিকের সহজাত দৃষ্টি লইয়াই ত্রৈলোক্যনাথ জন্মিয়াছিলেন। তিনি কি চাহিতেন তিনি জানিতেন। তিনি জানিতেন মানুষ বড়ই হৃদয়হীন, বড়ই দুর্বল। ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা ছাড়া আর-কিছু বড় তাহার

হৃদয়ে প্রবেশ করে না। পৃথিবী যে স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইতে পারে না তাহা তিনি জানিতেন। তবে মানুষে আর-একটু যদি হৃদয়বান্ হয়, আর-একটু পরার্থপর হয়, আর-একটু বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হয় তবে সংসারের দু-একটি কণ্টক উৎপাটিত হইয়া স্থানটা আর-একটু ভদ্ররকম ও বাসোপযোগী হয়। ইহাই তো যথেষ্ট। ইহার বেশি আর-কিছু হওয়া সম্ভব নয়, তাই তদধিক তিনি কিছু চাহিতেন না। ভল্‌টেয়ারের ক্ষেত্রে যেমন ধর্মান্ধতা ও বুদ্ধির মূঢ়তা, ত্রৈলোক্যনাথের ক্ষেত্রে তেমনি হৃদয়হীনতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থ। এই দুটির কবল হইতে মানুষ আর-একটু মুক্ত হোক, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। আর এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটুখানি সজাগ করিয়া তোলাই তাঁহার শিল্পের উদ্দেশ্য ছিল।

মানুষ কেবল যে মানুষের প্রতি হৃদয়বান্ হইবে মাত্র তাহাই নয়, ইতর প্রাণীর প্রতিও তাহার ব্যবহার সদয়তর হওয়া উচিত। ইতর প্রাণীর প্রতি মানুষে যে নৃশংস আচরণ করে ইহা তাঁহাকে বড় বাজিত। মূঢ় পশুদের প্রতি এমন করুণা অল্প বাঙালি সাহিত্যিকের রচনাতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। গড়গড়িমহাশয় কলিকাতায় গিয়া তাহার গুরুদেবের কশাইবৃত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। তাহার গুরুদেবের পাঁঠার বেনামে ছাগল বধের কৌশল বর্ণিত হইতেছে—

> তাহার পর তাহার [ছাগলটির] মুখদেশ নিজের পা দিয়া মাড়াইয়া জীয়ন্ত অবস্থাতেই মুণ্ডদিক্ হইতে ছাল ছাড়াইতে আরম্ভ করিলেন। পাঁঠার মুখ গুরুদেব মাড়াইয়া আছেন, সুতরাং সে চীৎকার করিয়া ডাকিতে পারিল না। কিন্তু তথাপি তাহার কণ্ঠ হইতে মাঝে মাঝে এরূপ বেদনাসূচক কাতর ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল যে, তাহাতে আমার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার পর তাহার চক্ষু দুইটি! আহা, আহা! সে চক্ষু দুইটির দুঃখ আক্ষেপ ও ভর্ৎসনাসূচক ভাব দেখিয়া আমি যেন জ্ঞানগোচরশূন্য হইয়া পড়িলাম। ...আমি বলিয়া উঠিলাম, ঠাকুর মহাশয়, করেন কি! উহার গলাটা প্রথমে কাটিয়া ফেলুন। প্রথমে উহাকে বধ করিয়া তাহার পর উহার চর্ম উত্তোলন করুন।' ঠাকুর মহাশয় উত্তর করিলেন, 'চুপ! চুপ! বাহিরের লোক শুনিতে পাইবে। জীয়ন্ত অবস্থায় ছাল ছাড়াইলে ঘোর যাতনায় ইহার শরীর ভিতরে ভিতরে অল্প অল্প কাঁপিতে থাকে। ঘন ঘন কম্পনে ইহার চর্মে এক প্রকার সরু সরু সুন্দর রেখা কম্পিত হইয়া যায়। এরূপ চর্ম দুই আনা অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। প্রথম বধ করিয়া তাহার পর ছাল ছাড়াইলে সে

চামড়া দুই আনা কম মূল্যে বিক্রীত হয়। জীয়ন্ত অবস্থায় পাঁঠার ছাল ছাড়াইলে আমার দুই আনা পয়সা লাভ হয়। ব্যবসা করিতে বসিয়াছি বাবা। দয়ামায়া করিতে গেলে আর ব্যবসা চলে না।...আর একবার আমি পাঁঠার চক্ষু দুইটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম। সেই চক্ষু দুইটি যেন আমাকেও ভৎর্সনা করিয়া বলিল, আমি দুর্বল, আমি নিঃসহায়, এ ঘোর যাতনা তোমরা আমাকে দিলে। মাথার উপর কি ভগবান্ নাই?

নৃশংসভাবে নিহত সেই অসহায় দুর্বল পশুটির দৃষ্টি ত্রৈলোক্যনাথের সমস্ত রচনার মধ্যে ছড়াইয়া আছে। সেই দৃষ্টি বারংবার পাঠককে ডাকিয়া বলে, আর কিছু নয়, তোমরা ওই অতিরিক্ত দুই আনার লোভ বর্জন করো। আমার ছাল যদি একান্তই চাও, অন্তত আগে আমাকে বধ করিয়া লও। মানুষের কাছে ত্রৈলোক্যনাথের আশা অতি যৎসামান্য, পশুবধ যদি নিতান্তই বর্জন করিতে না পার ব্যাপারটাকে যত অল্প সম্ভব নৃশংস করো। ষোলো আনার লোভ পরিত্যাগ যদি সম্ভব না হয় অতিরিক্ত দুই আনার লোভ পরিত্যাগ করো, তাহাতে তোমার ক্ষতি হইবে না।

পশুপক্ষী এবং মানবসমাজে অন্তর্গত অসহায় দুর্বলের প্রতি করুণা ত্রৈলোক্যনাথের রচনার প্রধানতম সম্পদ। ভল্‌টেয়ারের হাসি শীতের তীব্র বাতাসের মত জলকণাশূন্য, তাহা হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কাঁপাইয়া তোলে। ত্রৈলোক্যনাথের হাসি শরতের প্রথম উত্তরের হাওয়া, তাহাতে শিশিরের স্পর্শ আছে।

এই জীবনদর্শন-প্রকাশের বাহন তাঁহার হাসি এবং তাঁহার ভাষা। তাঁহার ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সম্পদ ও অলৌকিক মহিমা আশা করা বৃথা। এই ভাষার প্রধান ঐশ্বর্য শরবৎ ঋজুগতি। ঋজুতাই ব্যঙ্গের প্রধান সম্পদ। ভাষা যদি ঋজু না হয় তবে ব্যঙ্গের প্রচণ্ডতার অনেকটাই মাঝপথে নষ্ট হইয়া যায়। অনাড়ম্বর সরল ভাষার মাধ্যমে ব্যঙ্গের তীব্রতাকে একটুও নষ্ট হইতে দেয় না। আর এই অনাড়ম্বর ভাষার মেরুদণ্ড লেখকের অদ্ভুত পর্যবেক্ষণশক্তি। তাঁহার চারি দিকে যাহা ঘটিতেছে তীব্র পর্যবেক্ষণশক্তির আতস-কাঁচের ভিতর দিয়া তাহাকে তীব্রতরভাবে রূপদানের ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ।

তাঁহার পর্যবেক্ষণশক্তি ও তাঁহার বাহনস্বরূপ অনাড়ম্বর ভাষার উদাহরণ পাপের পরিণাম (১৯০৮) গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল—

খাঁদা ভূত রাত্রে বিকট শব্দ করিতেছে হু হু হু হু। তেঁতুলগাছ হইতে খাই এই শব্দ উত্থিত হইল আর চারি দিকে হুক্কা-হুয়া হাকা-হুয়া-হুঃ শৃগাল-

গণ ডাকিয়া উঠিল। সেই সময় কাক পক্ষিগণ অন্ধকার না মানিয়া, বৃষ্টিবাদল না মানিয়া বৃক্ষশাখা পরিত্যাগ করিয়া উড়িতে লাগিল। কা কা রবে একবার তাহারা এ ডালে বসিল, পুনরায় সে ডাল হইতে উড়িয়া অন্য ডালে গিয়া বসিতে লাগিল। নিকটস্থ বাঁশঝাড়ে বকের পাল পালকের ভিতর মস্তক লুকাইয়া ভিজিতেছিল। কক্-কক্ রবে তাহারাও চারি দিকে উড়িতে লাগিল বাদুড়গণ সন্‌সন্ রবে সে স্থান হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। পেঁচকগণ হুট্-হুট্ রবে রায়মহাশয়ের অট্টালিকাগাত্রে কোটরের ভিতর আশ্রয় হইল নিকটস্থ কয়েক বাটী হইতে কুকুরগুলা ডাকিতে ডাকিতে বাহির হইল। কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হইলে যেই সেই তেঁতুলগাছ তাহাদের নয়নগোচর হইল আর তাহারা বসিয়া পড়িল। লাঙ্গুল ভিতরে রাখিয়া পশ্চাৎ-পদদ্বয়ের উপরে ভর দিয়া উচ্চভাবে বসিয়া, দূর হইতে তেঁতুলগাছের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া তাহারা অতি ভয়ংকর শব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিল। সেই গভীর নিশাকালে সেই চীৎকারে একে লোকের হৃদয় কম্পিত হইয়াছিল, তাহার পরে আবার সেই প্রুতস্বরে কুকুরের ক্রন্দনে আতঙ্কের আর সীমা রহিল না।

পশুপক্ষীর ব্যবহারের এই চিত্র বাস্তবতায় উজ্জ্বল। সহৃদয়তার দৃষ্টিতে পশু-পক্ষীর জগৎকে যে দেখিয়াছে কেবল তাহার পক্ষেই এইরূপ পর্যবেক্ষণ সম্ভব।

পর্যবেক্ষণশক্তি যেমন ত্রৈলোক্যনাথের প্রচুর পরিমাণে ছিল কল্পনাশক্তি তেমন ছিল না। বস্তুত দিব্য কল্পনাশক্তির যেন তাঁহার কিছু অভাব ছিল। আর কল্পনাশক্তির প্রাচুর্য ব্যতীত কেহই শিল্পের চূড়া স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গশিল্পীরও প্রচুর কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। সত্য বলিতে কি, অনেক সময়েই দেখা যায় শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গশিল্পীগণ উচুদরের কবিও বটে—যেমন মলিয়ের, অ্যারিস্ট-ফেনিস এবং হায়নে। এই কল্পনাশক্তির অভাবেই তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গশিল্পীদের অন্যতম হইতে পারেন নাই, শ্রেষ্ঠ বাঙালি ব্যঙ্গশিল্পী মাত্র হইয়া আছেন। তাঁহার ভূত ও মানুষ (১৮৯৬) গ্রন্থের প্রথম গল্প বাঙাল নিধিরাম কোনো স্থানে হুগোর Toilers of the Sea-র অনুক্রমণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহা লেখকের অভিপ্রেত কি না জানি না। কিন্তু এ দাবি করা উচিত নয়। বাঙাল নিধিরামে সহৃদয়তাগুণ আছে, পর্যবেক্ষণশক্তির অভাব নাই, গল্প বলিবার ক্ষমতাও অসাধারণ কিন্তু হুগোর কাব্য-উপন্যাসের এবং তাঁহার সমস্ত রচনারই যাহা প্রধান গুণ সেই অলৌকিক কল্পনাশক্তি কোথায়? হুগোর যে কল্পনায় ত্রিকটে সমুদ্রও গোষ্পদ সেই কল্পনা কোথায়? হুগোর কল্পনা ও তাহার কোটালের বন্যা না থাকিলে

তাঁহার কাব্যের (Toilers of the Sea কাব্য ছাড়া আর কি ?) অনুসরণ করিবার আশা বৃথা। যে গুণে হুগোর মহত্ব, সেই গুণেই ত্রৈলোক্যনাথের দীনতা ; কাজেই হুগোকে অনুসরণ করিবার শক্তি তাঁহার স্বল্পতম। বরঞ্চ তিনি ভল্‌টেয়ার বা সুইফ্‌টের কোনো গ্রন্থের ভাবানুসরণ করিলে আশাতীত সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন।

ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গদৃষ্টি, জীবনদর্শন বিশেষ শক্তি ও বিশেষ শক্তির অভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম, এবার তাঁহার শিল্পের টেকনিক সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

৩

ত্রৈলোক্যনাথ গল্প বলিবার সহজাত শক্তি লইয়া জন্মিয়াছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে এই শক্তি অতিশয় বিরল। গল্প অনেকেই লেখেন, কিন্তু গল্প বলিবার ভঙ্গি সাহিত্য হইতে প্রায় লোপ পাইবার মুখে। সাহিত্য লিখিত-আকার ধারণ করিবার পূর্বে গল্প বলিবার ভঙ্গি মানবসমাজের প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহা লুপ্তপ্রায়। এখন আমরা গল্প পড়ি, গল্প শুনি না। ত্রৈলোক্যনাথের প্রতিভার মধ্যে গল্প বলিবার আদিমশক্তি বিদ্যমান। সে গল্পও আবার বাংলায় যাহাকে আষাঢ়ে গল্প বলে। এ শক্তি বাংলা সাহিত্যে অতি বিরল বলিলেও চলে।

আরব্যোপন্যাস এখন লিখিত আকার ধারণ করিলেও তাহার মধ্যে মূল কথন-গুণ এখনো যেন ধ্বনিত। ইহা পড়িবার সময়ে মনে হয় গল্প পড়িতেছি না, অদৃশ্য কথক বলিয়া যাইতেছে, আমরা শুনিতেছি। ত্রৈলোক্যনাথের গল্প সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। আরও একটি কারণে আরব্যোপন্যাসের উল্লেখ করিতে হইল। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের টেকনিক বস্তুত আরব্যোপন্যাসের টেকনিক। এই অমর কাব্য উপন্যাস নয়, আবার গল্পও নয়—অফুরন্ত গল্প-শৃঙ্খল। একটি গল্পের সহিত আর-একটি গল্প গ্রন্থিযুক্ত হইয়া শ্রোতার অন্তহীন মনোযোগের শেষ সীমা পর্যন্ত চলিয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথের অধিকাংশ গ্রন্থই গল্পের শৃঙ্খল। কঙ্কাবতী (১৮৯২), পাপের পরিণাম (১৯০৮), ফোকলা দিগম্বর (১৯০১) ও বাঙাল নিধিরাম ব্যতীত আর সব রচনাই গল্পের মালা ছাড়া আর কিছু নয়। ডমরু-চরিত (১৯০৩), মজার গল্প (১৯০৬), মুক্তামালা (১৯০২) এমন কি ভূত ও মানুষ-এর নাম সবই গল্পসমষ্টি। একটি উপন্যাসও নয় ছোট গল্পও নয়, একটি কাঠামোর মধ্যে অনেকগুলি গল্পের

সমষ্টি মাত্র। একটা শক্ত কাঠামোর মধ্যে সমস্ত বিষয়টাকে ঘনীভূত করিয়া আঁটিয়া দিলে কথনগুণ অনেক পরিমাণে লোপ পায়। সে চেষ্টা লেখক করেন নাই। শিথিল পিনদ্ধ ফ্রেমের মধ্যে বহুতর গল্পকে সন্নিবেশ করিয়া রস জমাইয়া তুলিয়াছেন। ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। এ গুণ সামান্য গুণ নয়।

তাঁহার রচনার আর একটি বৈশিষ্ট্য সকলেরই চোখে পড়িবে। তাঁহার অধিকাংশ গল্পের উপাদান ভূতপ্রেত, দৈত্যদানা। স্বপ্ন বা তজ্জাতীয় অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতা তাঁহার অন্যতম প্রকাশপন্থা। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাকে ভূতুড়ে গল্পের লেখক বলিয়া সংক্ষেপে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। তাঁহার উপাদান ভূতপ্রেত, কিন্তু কেবল ভূতুড়ে গল্প বলা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে।

সুইফ্‌ট্‌ গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্তে ক্ষুদ্রকায় লিলিপুট ও অতিকায় ব্রব্‌ডিংনাগের অবতারণা করিয়াছেন। কি জন্য? মানবচরিত্রের অসংগতি প্রদর্শনই তাঁহার লক্ষ্য। এই অসংগতিকে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রকায়িক ও অতিকায়িক জীবের সৃষ্টি করিয়া তুলনায় মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ও শক্তিসামর্থ্যের নিরর্থকতা দেখাইয়া দিয়াছেন। ঠিক এক কারণেই ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে ভূত-প্রেতের আবির্ভাব; মানুষের খেয়ালখুশি ও কল্পনাকে যথেচ্ছ দৌড় দিবার উদ্দেশ্যেই বাস্তববন্ধনবর্জিত স্বপ্নপ্রসঙ্গের অবতারণা।

মানুষের অসংগতি দেখাইতে হইলে তাহার সহিত তুল্য আবশ্যক। ভূত-প্রেতের সমাজের সহিত মানবসমাজের তুলনায় অতিশয় সহজ ও বহুপ্রচলিত। কাজেই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ভূতপ্রেতের সমাজের সাহায্য লইতে হইয়াছে। মানুষকে ব্যঙ্গ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, ভৌতিক গল্প বলা নয়।

লুল্লু গল্পে একটি ভূতকে খবরের কাগজের সম্পাদক করিয়া দিবার লোভ দেখাইয়া গল্পের নায়ক আমীর তাহাকে বশ করিয়া ফেলিল। আমীর বলিতেছে, মানুষ-সম্পাদকের গালিতে আর খবরের কাগজ আগের মতন বিকায় না, এখন ভূত-সম্পাদক হইয়া ভূতের গালি প্রয়োগ করিলে কাগজ বিকাইবার অধিকতর সম্ভাবনা। ভূতে ও মানুষে এই যে অসংগতি, এবং এই অসংগতিজাত ব্যঙ্গ, ইহা আর কি ভাবে ফুটানো যাইত!

আর-এক স্থলে তিনি বাংলা থিয়েটারকে ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে শবসাধনার উল্লেখ করিয়াছেন। শবসাধক আর-সব বিভীষিকাকে জয় করিতে সমর্থ হইল কিন্তু ভৌতিক সত্তা থিয়েটারের বীরের ভঙ্গিতে আসিয়া তাহাকে আহ্বান করা

মাত্র সে শবাসন ছাড়িয়া পলায়ন করিল, মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। ইহা এত সহজে ও সম্পূর্ণভাবে আর কেমন করিয়া দেখানো যাইত?

ঠিক এই একই উদ্দেশ্যে স্বপ্নপ্রসঙ্গেরও অবতারণা তাঁহার রচনায়। কঙ্কাবতীর স্বপ্ন ভূত ও মানুষ গ্রন্থের বীরবালা গল্পে নায়কের মূর্ছা তাঁহার বক্তব্য প্রকাশের সমীচীনতম পন্থা। ত্রৈলোক্যনাথ যদি বাস্তবপন্থার লেখক হইতেন তবে এসব দোষ বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু ব্যঙ্গশিল্পে এগুলি দোষ তো নয়ই বরঞ্চ এইগুলিই সর্বজনস্বীকৃত বহুসমাদৃত চিরকালীন প্রকাশভঙ্গি।

ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলীর মধ্যে কঙ্কাবতী সবচেয়ে জনপ্রিয়। বাংলাদেশের বহুপ্রচলিত একটি জনশ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া উপন্যাসাকারে সামাজিক ব্যঙ্গের এই উর্ণাতন্তু রচিত। ভূতপ্রেত ও স্বপ্নদর্শন প্রভৃতি লেখকের প্রিয় টেকনিক ইহাতে গৃহীত হইয়াছে। কঙ্কাবতীর রোগশয্যায় স্বপ্ন ও প্রলাপই পূর্ববর্তী কাহিনীর বৃহত্তর অংশের বাহন। ইহাকে আপাতদৃষ্টিতে ভূতের গল্প বা আষাঢ়ে কাহিনী বলিয়া মনে হইলেও ইহা মূলত সামাজিক ব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। গালিভারের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও ডন্‌কুইক্সটের অপূর্ব কাহিনী প্রভৃতির মত এই শ্লেষপূর্ণ চমকপ্রদ গ্রন্থ একাধারে বালক ও বয়স্ক দুই শ্রেণীর পাঠকেরই প্রিয়।

পাপের পরিণাম ও ফোকলা দিগম্বরে গল্পের জাল বুনিবার অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে। পাপের পরিণাম স্পষ্টত নীতিকথাপ্রচারের উদ্দেশ্যে লিখিত। এমন স্থলে গ্রন্থ প্রায়ই নীরস ও প্রাণহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু লেখকের শিল্পকৌশল গ্রন্থখানাকে আশ্চর্যরকমের সজীব ও চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে।

বীরবালা একখানা রূপক-কাহিনী। খুব সম্ভবত ভারতবর্ষের বর্তমান দুর্দশা, তাহার প্রাচীন গৌরব, ইংলণ্ডের সহিত এ দেশের যোগস্থাপন প্রভৃতিই কাহিনীর অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত।

কিন্তু লেখকের বিশিষ্টতম শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে ডমরু-চরিত, ভূত ও মানুষ গ্রন্থের লুল্লু ও নয়নচাঁদের ব্যাবসা এবং মুক্ত-মালার কোনো কোনো গল্পে।

ডমরুধর ও নয়নচাঁদ তাঁহার দুইটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি, আর শুধু তাই নয়, বাংলা সাহিত্যের আসরেও তাহাদের জুড়ি মেলা ভার। ইহাদের বিস্তৃত পরিচয় দিতে গেলে আস্ত বই দুখানাই উদ্ধার করিয়া দিতে হয়। তাহার চেয়ে বই-দুখানা পড়িয়া লইবার ভার পাঠকের উপরে ছাড়িয়া দেওয়াই ভালো।

৪

ত্রৈলোক্যনাথের মত বাংলা সাহিত্যের একজন মহৎ লেখকের অবলুপ্তির কারণ কি। কারণ যাহাই হোক, ইহা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। ত্রৈলোক্যনাথের মৃত্যু হয় ১৯১৯ সালে। ঠিক এই সময়েই শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। শরৎসাহিত্যের আন্তরিক জনপ্রিয়তা ত্রৈলোক্যনাথের বিস্মৃতির একটি কারণ তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। ঠিক এই একই কারণে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও সাধারণ পাঠকের চিত্ত হইতে অপসৃত হইয়াছেন। অথচ ইঁহারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের মতই অসাধারণ। তবে এমন কেন হইল? শরৎ-সাহিত্যের সর্বজনবোধ্যতা, সহজসম্বেদ, ভাবার উচ্ছলতা ও ঈষৎলঘু ভাবালুতার নিকটে পূর্বোল্লিখিত লেখকদ্বয়ের ব্যঙ্গ রঙ্গ ও কশাঘাত, উদ্দেশ্যমূলক হাসি এবং বুদ্ধির প্রতি আবেদন পরাজিত হইয়াছে। অশ্রুর নিকটে হাসির পরাজয়, ভাবালুতার আবেদনের নিকটে বুদ্ধির পরাজয়। ইহা স্বাভাবিক হইলেও যুগ-লক্ষণাক্রান্ত ঘটনা। বাঙালি পাঠকের কাছে বুদ্ধির চেয়ে হৃদয়াবেগের আবেদনই অধিকতর উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, শরৎসাহিত্যের জনপ্রিয়তা তাহারই একটি প্রকাশ। ত্রৈলোক্যনাথ বিস্মৃতপ্রায় হইলেও তাঁহার বিশিষ্ট রচনারীতি লুপ্ত হয় নাই। পরশুরাম ও আধুনিকতর কোনো কোনো লেখকের ব্যঙ্গরচনায় তাঁহারই ধারা প্রবাহিত। কাজেই তাঁহার প্রতিভা বন্ধ্যা নহে, পরবর্তী অনেক রচনার জননী।

কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ ও প্রভাতকুমারের রচনায় চিরকালীন বস্তুর অভাব নাই। কাজেই তাঁহাদের ক্ষণিক অবলুপ্তি স্থায়ী নশ্বরতা নহে। তাঁহাদের রচনার পুনরাবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। এখন উদ্‌যোগী প্রকাশকগণ তাঁহাদের গ্রন্থাবলীর সহজ-লভ্য নির্ভরযোগ্য সংস্করণ বাহির করিলে এই আবির্ভাবের স্পৃহনীয় আনুকূল্য করিবেন। তাঁহাদেরও ক্ষতি হইবে না, আবার বাঙালি পাঠকগণও লাভবান হইবেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত

১৮৪৮-১৯০৯

রমেশচন্দ্র দত্তের প্রথম উপন্যাস বঙ্গবিজেতা ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার বয়স ছাব্বিশ বৎসর। ১৮৭৪ সালে বাংলা উপন্যাসের ধারা সুদীর্ঘ হইয়া উঠে নাই; তখন উপন্যাস-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, এখনো তিনিই শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। ১৮৭৪ সাল অবধি বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা মৃণালিনী বিষবৃক্ষ ইন্দিরা ও যুগলাঙ্গুরীয় প্রকাশিত হয়। ১৮৭২ সাল হইতে বঙ্গদর্শন বাহির হইতে থাকে। এই ঘটনাগুলি মনে রাখিলে রমেশচন্দ্রের উপন্যাস ও তাহার ধারাবাহিকতা বুঝিতে সুবিধা হইবে।

রমেশচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস মাধবীকঙ্কণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ সালে। জীবন-প্রভাত ও জীবন সন্ধ্যা যথাক্রমে ১৮৭৮ ও ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত হয়। তার পর কয়েক বৎসরের ছেদ পড়িয়া তাঁহার সংসার ও সমাজ যথাক্রমে ১৮৮৬ ও ১৮৯৪ সালে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁহার উপন্যাসের ধারার এখানেই সমাপ্তি। বস্তুত এইখানেই তাঁহার জীবনের রসসাহিত্যপর্বের সমাপ্তি। ইহার পরে ও আগে আর যেসমস্ত গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছেন সেসব হয় ইংরেজি ভাষায়, নয় বাংলা ভাষায় অনুবাদগ্রন্থ। সেসব আমাদের আলোচনার বিষয় নহে। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বস্তু রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস, তদধিক কিছু নয়। যদিচ তদধিক আলোচনার অনেক বিষয়, অনেক গুরুতর বিষয়, তাঁহার জীবনে ও ব্যক্তিত্বে রহিয়াছে।

রমেশচন্দ্রের উপন্যাস-ছয়খানি দুইটি পর্যায়ভুক্ত। বঙ্গবিজেতা মাধবীকঙ্কণ জীবন-প্রভাত ও জীবন সন্ধ্যা এক পর্যায়ভুক্ত; এগুলি সমগোত্রভুক্ত বলিয়াই শতবর্ষ (১৮৭৯) নামে একত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। এই চারিখানি উপন্যাসকে অন্য নামের অভাবে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাক। বঙ্গবিজেতা ও মাধবীকঙ্কণকে ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা চলে কি না সে তর্ক উঠিতে পারে, কিন্তু জীবন-প্রভাত ও জীবন সন্ধ্যা সম্বন্ধে তর্কের স্থান নাই। বস্তুত এই দুইখানিই প্রকৃত বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস।

বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ চন্দ্রশেখর মৃণালিনী প্রভৃতিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিবার লোভ হইলেও সে লোভ সংবরণ করা উচিত, যেহেতু এইসব কাহিনীতে

বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসনির্দিষ্ট সীমানাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, শিল্পীর দৃষ্টি আর ভারতভাগ্যবিধাতার দৃষ্টি ভিন্ন নামে বাণসংযোজন করিয়াছে। কাজেই এসব গ্রন্থ ঐতিহাসিক উপাদানে গঠিত হইলেও ঠিক ঐতিহাসিক পর্যায়ভুক্ত নয়।

বঙ্গবিজেতা উপন্যাসের কাহিনীকাল ১৫৮০ সালে। তখন আকবরের আমল। ইহার ঐতিহাসিক অংশের নায়ক টোডরমল্ল। ইহার ঘটনার স্থান বাংলাদেশ। মাধবী কঙ্কণের কাহিনীকাল শাহ্‌জাহানের সময়, ১৬১৪ সাল। ইহার নায়ক-নায়িকা বাঙালি হইলেও ঘটনার ক্ষেত্র বাঙলাদেশের বাহিরে দিল্লী ও আগরা পর্যন্ত বিস্তৃত। জীবন-সন্ধ্যার ঘটনাকাল ১৫৭৬ সাল। আকবর ও প্রতাপসিংহ ঐতিহাসিক প্রধান ব্যক্তি, আর জীবন-প্রভাতের নায়ক শিবাজী—১৬৬৩ সালের উল্লেখ উপন্যাসে আছে। বঙ্গবিজেতার ১৫৮০ সাল হইতে আরম্ভ ধরিলে জীবন-সন্ধ্যার ১৬৬৩ সাল পর্যন্ত এক শত বৎসর ধরিতে হইবে। এই শতবর্ষের বিশেষ ঘটনা আকবরের প্রভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, রাজপুত শক্তির জীবন-সন্ধ্যা এবং আওরংজেবের সময় শিবাজী প্রভাবে মহারাষ্ট্রশক্তির জীবন-প্রভাত। এই চারিখানি উপন্যাসে লেখক ভারতবর্ষের সন্ধ্যাপ্রভাত ও সন্ধিবিগ্রহের শতবর্ষকে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আর সে উপলক্ষে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষের ভূখণ্ডে তাঁহাকে পর্যটন করিতে হইয়াছে।

রমেশচন্দ্র তাঁহার প্রিয় গ্রন্থকারের উল্লেখ উপলক্ষে লিখিতেছেন—

> Sir Walter Scott was my favourite author forty years ago. I spent days and nights over his novels ; I almost lived in those historic scenes and in those mediaeval times which the great enchanter had conjured up…I do not know if Sir Walter Scott gave me a taste for history, or if my taste for history made me an admirer of Scott ; but no subject, not even Poetry, had such a hold upon me as history.

রমেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মর্ম বুঝিবার পক্ষে এই অংশটুকু মূল্যবান। দুটি কথা বুঝিতে পারা যায়—স্কট তাঁহার প্রিয়তম ঔপন্যাসিক আর ইতিহাসে তাঁহার নিবিড়তম আকর্ষণ। তবে স্কটের উপন্যাস হইতে ইতিহাসপ্রিয়তা বা ইতিহাস-প্রিয়তা হইতে স্কটের উপন্যাস, গতির দিকটা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। স্কটের উপন্যাস একাধারে ইতিহাস ও সাহিত্য, একত্রে এই দুটি রমেশচন্দ্রের প্রিয়তম

বিষয় বোঝা যাইতেছে। কিন্তু তিনি যে বাংলা লিখিবেন, বাংলা উপন্যাস লিখিবেন এবং স্কটের আদর্শে লিখিবেন, তাহা তিনি কখনো ভাবেন নাই। এমন সময়ে একদা বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার আলাপ হইয়া গেল। রমেশচন্দ্রের ভাষাতেই শোনা যাক—

বঙ্কিমবাবু তখন বঙ্গদর্শন বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ভবানীপুরে একটি ছাপখানা হইতে ঐ কাগজখানি প্রথমে বাহির হয়, তথায় বঙ্কিমবাবু সর্বদা যাইতেন, সেই ছাপাখানার নিকটে আমার বাসা ছিল, বলা বাহুল্য বঙ্কিমবাবু আসিলেই আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। একদিন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কথা হইল, আমি বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলির প্রশংসা করিলাম, তাহা বলা বাহুল্য। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যদি বাংলা পুস্তকে তোমার এত ভক্তি ও ভালোবাসা তবে তুমি বাংলা লেখ না কেন?' আমি বিস্মিত হইলাম। বলিলাম, 'আমি যে বাংলা লেখা কিছুই জানি না। ইংরেজি বিদ্যালয়ে পণ্ডিতকে ফাঁকি দেওয়াই রীতি, ভালো করিয়া বাংলা শিখি নাই, কখনো বাংলা রচনাপদ্ধতি জানি না।' গম্ভীর স্বরে বঙ্কিমবাবু উত্তর করিলেন, 'রচনাপদ্ধতি আবার কি—তোমরা শিক্ষিত যুবক, তোমরা যাহা লিখিবে তাহাই রচনাপদ্ধতি হইবে। তোমরাই ভাষাকে গঠিত করিবে।' এই মহৎ কথা বরাবরই আমার মনে জাগরিত রহিল।

ইংরেজি ও বাংলা এই দুই অংশের মর্ম জুড়িয়া লইলে রমেশচন্দ্রের উপন্যাস-রচনার সম্যক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। স্কটের উপন্যাসে তন্ময়তা, বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক বাংলা লিখিতে উৎসাহ প্রদান—এ দুইয়ের বাস্তব ফল তাঁহার বাংলা উপন্যাস রচনা। রমেশচন্দ্রের আশঙ্কা ছিল তিনি বাংলা লিখিতে পারেন না, কারণ পণ্ডিতকে ফাঁকি দেওয়াই তখনকার রীতি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, তোমরা যাহা লিখিবে তাহাই রচনাপদ্ধতি হইবে, তোমরাই ভাষাকে গঠিত করিবে। এই উপদেশের বাস্তব দৃষ্টান্ত রমেশচন্দ্রের ছয়খানি বাংলা উপন্যাস। অবশ্য স্কটের উপন্যাসের বাংলা দৃষ্টান্ত তাঁহার সম্মুখে বর্তমান ছিল—বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী এবং আরও পরবর্তী কালের যুগলাঙ্গুরীয় ও চন্দ্রশেখর। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস তাঁহার প্রিয় ছিল, তাদের প্রশংসা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ভবানীপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বঙ্গবিজেতা রচনার পূর্ববর্তী বঙ্কিমী উপন্যাস-গুলির নাম উপরে করিয়াছি, কপালকুণ্ডলার নাম বাদ দিয়াছি। কপালকুণ্ডলার দ্বারা প্রভাবিত হইবার মত মন রমেশচন্দ্রের ছিল না। তিনি এই সময়ে

দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনীতে ওতপ্রোত হইয়াছিলেন। এ দুখানি রচিত না হইলে বঙ্গবিজেতা রচিত হইতে পারিত না। মাধবীকঙ্কণে পূর্বোক্ত দুইখানি উপন্যাস ছাড়াও বিষবৃক্ষের প্রভাব স্পষ্ট, তৎপূর্বেই বিষবৃক্ষ প্রচারিত হইয়াছে। কেবল এক জায়গায় শিষ্য হয়তো বা গুরুকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। রাজসিংহ ও জীবন-প্রভাত একই বাংলা বৎসরে দুইটি মাসিকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষুদ্রায়তন রাজসিংহ ১২৮৪ চৈত্র হইতে ১২৮৫ ভাদ্র সংখ্যা বঙ্গদর্শনে অংশত প্রকাশিত। জীবন-প্রভাত ১২৮৫ সালের প্রথম হইতে দশম সংখ্যা বান্ধবে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। রমেশচন্দ্র জীবন-প্রভাত লিখিবার আগে কি রাজসিংহ দেখিয়াছিলেন? রমেশচন্দ্রের পক্ষে রাজসিংহ না দেখা বিচিত্র। কিন্তু তাহাতেও ক্ষতি নাই, যেহেতু পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার পূর্বে কল্পনায় নিশ্চয় উপলব্ধি হইয়াছিল, তাহার উপরে রাজসিংহের প্রভাব থাকা সম্ভব নয়। এইসব কারণে 'হয়তো' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। তবু এক জায়গায় রমেশচন্দ্রেরই জিত। রাজসিংহ সার্থকতর উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তম পটভূমি-সংযুক্ত মহত্তম উপন্যাস। জীবন-প্রভাত ও জীবন-সন্ধ্যা সার্থকতর ঐতিহাসিক উপন্যাস, বাংলা সাহিত্যের সার্থকতম ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহাতে উপন্যাস-শিল্পের দুর্গের উপরে ইতিহাসের পতাকাটাই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। শিল্পশক্তির অপেক্ষা ইতিহাসের মর্মজ্ঞান লেখকের অধিকতর ছিল। ইহার বিপরীত সম্ভব হইলে রমেশচন্দ্রের সাহিত্যিক স্মৃতি আজ উজ্জ্বলতর হইত।

২

ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিতে কোন্ শ্রেণীর রচনা বোঝায় তাহার সংজ্ঞা নির্ণয় সহজ নহে। তবে দুটি স্থূল বিষয় মনে রাখিলেই কাজ চলিতে পারে। এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক উপন্যাসে কোনো বিশেষ পর্বের ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা ব্যক্তি-গণকে নায়ক করিয়া গল্প রচনা করা যাইতে পারে, আবার ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে অন্তরালে বা গৌণ রাখিয়া কল্পিত চরিত্র সৃষ্টি করিয়াও গল্প রচনা করা চলে, তবে দেখিতে হইবে যে, গল্পের মধ্যে বিশিষ্ট পর্বের সত্য ইতিহাসের সীমানাকে অতিক্রম করিয়া না যায়। স্কট তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতে এই দুই দাবিকেই রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং বিশিষ্ট পর্বের সাধারণ ব্যক্তিদের চরিত্র দুটিতেই তিনি ইতিহাসের দাবি রক্ষা করিতে প্রাণপণ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক

ব্যক্তির চরিত্রচিত্রণে লেখক অনেকটা হাতপা-বাঁধা, কিন্তু সাধারণ লোকের চরিত্র-সৃষ্টিতে তিনি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। কিন্তু তাঁহাকে সর্বদা মনে রাখিতে হয় যে, সেই পর্বের সত্যকে লঙ্ঘন করিলে চলিবে না। কোনো কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনা দেবীচৌধুরাণীতে আছে বলিয়া পাছে কেহ তাহাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস মনে করিয়া বসে, তাই বঙ্কিমচন্দ্র ভূমিকায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। আনন্দমঠের সন্ন্যাসীবিদ্রোহ ঐতিহাসিক ঘটনা হইলেও উক্ত গ্রন্থ কোনোক্রমেই ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। আনন্দমঠের সন্ন্যাসীগণের দেশপ্রাণতা এবং দেবীচৌধুরাণীর নিষ্কাম কর্ম ঐতিহাসিক সত্য নয়, নিতান্তই লেখকের সমকালীন সত্য।

রমেশচন্দ্র বঙ্গবিজেতা গ্রন্থে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় পরোক্ষ রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। সরলা অমলা ইন্দ্রনাথ শকুনি সতীশচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই কাল্পনিক। যদিচ প্রসিদ্ধ টোডরমল্ল আছেন, তথাপি তিনি অনেকটা প্রচ্ছন্ন। কিন্তু কাল্পনিক চরিত্রগুলিতে তৎকালীন সত্য রক্ষিত হইয়াছে কি না বলা শক্ত, কারণ বাংলাদেশের তৎকালের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না। মাধবীকঙ্কণের নরেন্দ্র শ্রীশ হেমলতা শৈবলিনী প্রভৃতি কাল্পনিক হইলেও এই গ্রন্থের ঘটনাস্রোত দিল্লী আগরা মথুরা প্রভৃতির প্রবলতর ঐতিহাসিক স্রোতের সহিত মিশিয়া পূর্বতন লক্ষ্যের স্তিমিত ভাব অনেকটা হারাইয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে অধিকসংখ্যক ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঐতিহাসিক ঘটনা সংযোজিত। এখানিকে বলা চলে রমেশচন্দ্রের দুই শ্রেণীর ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যবর্তী সেতুবন্ধ। তাঁহার প্রথম শ্রেণীর রচনা বঙ্গবিজেতা; ইহা পরোক্ষ ঐতিহাসিক রচনা, ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা ঘটনা এখানে গৌণ। দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনা জীবন-প্রভাত এবং জীবন-সন্ধ্যা; ইতিহাসের ঘটনা ও নায়কনায়িকা এখানে মুখ্য। প্রতাপসিংহ সেলিম শিবাজী যশোবন্ত শায়েস্তা খাঁ মানসিংহ এবং ভারতেতিহাসের সুপরিচিত ঘটনাবলী এই দুইখানি গ্রন্থের প্রধান সম্পদ; কাল্পনিক চরিত্রগুলি স্বভাবতই অনেকটা প্রচ্ছন্ন ও নিষ্প্রভ। মাধবীকঙ্কণ এ দুইয়ের মধ্যবর্তী, এক শ্রেণী হইতে ভিন্ন শ্রেণীতে সংক্রমণের লক্ষণাক্রান্ত। জীবন-প্রভাত ও জীবন-সন্ধ্যার ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের চরিত্রে ও ঘটনায় ইতিহাসের মর্যাদা অধিকতর সংরক্ষিত, এ কথা বলা অন্যায় হইবে না কারণ তাঁহাদের চরিত্র স্থূল রেখায় সুপরিজ্ঞাত, আর সূক্ষ্মভাবে জানিবার মত পাণ্ডিত্য রমেশচন্দ্রের যে ছিল তাহা তো বলাই বাহুল্য।

৩

রমেশচন্দ্রের অপর দুইখানি উপন্যাস সংসার ও সমাজ। সংসার প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ সালে, আর সমাজ প্রকাশের সময় ১৮৯৪ সাল। সংসার প্রকাশের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাস প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে, আর সমাজ প্রকাশের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র গত হইয়াছেন। এ দুইখানি পূর্বোক্ত চারিখানি হইতে ভিন্নগোত্রের উপন্যাস। এ দুটি সামাজিক উপন্যাস। পূর্বোক্ত চারিখানি যেমন এক পর্যায়ভুক্ত, পরবর্তী দুইখানি তেমনি এক পর্যায়ের অন্তর্গত। বস্তুত সংসার ও সমাজকে একই গ্রন্থের দুই খণ্ড বলা উচিত। উভয় গ্রন্থের প্রধান পাত্রপাত্রী ও ঘটনাস্থান অভিন্ন; কালহিসাবে একটি পূর্বকাল অপরটি উত্তরকাল, একটির সূত্র অপরটিতে অনস্যূত।

ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচয়িতা রমেশচন্দ্র পরিণত বয়সে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের সামাজিক উপন্যাস লিখিতে গেলেন কেন। বাহ্য কারণ এই যে, ইতিমধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক উপন্যাস রচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু অন্য কারণও আছে, সেটা মানসিক। রমেশচন্দ্র সংসার ও সমাজের উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

> On principle inter-caste marriage is a duty with us, because it unites the divided and enfeebled nation, and we should establish this principle (as well as widow-marriage, etc.) safely and securely in our little society, so that greater Hindu society, of which we are only a portion and the advanced guard, may take heart and follow. I cannot tell you how deeply I have felt this for years past; of my last two novels, *Sansar* goes in for widow-marriage and *Samaj*···goes in for inter-caste marriage.

রমেশচন্দ্র সংসারে বিধবাবিবাহ এবং সমাজে অসবর্ণবিবাহ সমর্থন করিয়াছেন। সে সময়ে ইহা দুঃসাহসিক ছিল। বিধবাবিবাহ আইনত স্বীকৃত হইলেও সমাজে গৃহীত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র তত্ত্বত না হইলেও কার্যত বিধবাবিবাহের সপক্ষে ছিলেন না। কুন্দনন্দিনীকে মারিয়া না ফেলা অবধি তিনি স্বস্তি পান নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত ছিল যে, আইন করিয়া সমাজসংস্কার সম্ভব নয়, শিক্ষা প্রসারিত হইলেই আইনের কাজ আপনিই ঘটিতে থাকিবে। আমাদের মনে হয়, দুই দিক হইতেই

করিতে হইবে। শিক্ষাও চাই, আইনও চাই। শিক্ষার প্রসারে আইন প্রণয়নের সুবিধা হইবে, আবার আইন প্রণীত হইলে সংকুচিত ব্যক্তি উৎসাহ পাইবে। অসবর্ণবিবাহের তর্ক সেকালে আইনের ক্ষেত্রে যা আলোচনার ক্ষেত্রে অবধি দেখা দেয় নাই, কাজেই এ বিষয়ে সমাজসংস্কার বিষয়ক চিন্তানায়ক হিসাবে রমেশচন্দ্র বিশেষ অগ্রসর ছিলেন, খুব সম্ভব ঃকক ছিলেন। তাঁহার রচনার মূলে ও রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রেব প্রভাব দেখিয়াছি, কিন্তু উভয় মনাষীর পার্থক্যটাও অল্প নহে। সংসার ও সমাজের চিন্তাসূত্র রমেশচন্দ্রের নিজস্ব, তাহাকে বঙ্কিম বিরোধী বলিলেও অন্যায় হইবে না। অথচ রহস্য এই যে, দুইজনেরই পাণ্ডিত্য অগাধ ছিল এবং হিন্দুশাস্ত্র ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাও অপরিসীম ছিল। যে সংস্কারের ভার যুগধর্ম ও মানবচারিত্রের স্বাভাবিক গতির উপর ছাড়িয়া দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চিন্ত ছিলেন, রমেশচন্দ্র তাহাকেই আইনপ্রণয়ন ও শিক্ষের মাধ্যমে ত্বরান্বিত করিয়া তুলিতে সচেষ্ট ছিলেন, প্রভেদ এই মাত্র। এ প্রভেদ উভয়ের মানসিক গঠনের প্রভেদ।

৪

আনন্দমঠ দেবীচৌধুরাণী সীতারাম স্পষ্টত নীতিশিক্ষামূলক উপন্যাস। কিন্তু স্পষ্টত না হইলেও সূক্ষ্মত নীতিশিক্ষাদানের ভাব বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রায় প্রথম আমল হইতেই দেখা যায়। দুর্গেশনন্দিনীকে নিছক কাহিনী বলিলেও মৃণালিনীকে নিছক কাহিনী বলা চলে না। হেমচন্দ্রের দেশপ্রেম, দেশোদ্ধারের সংকল্প নীতি-শিক্ষার স্তরে পৌছিয়াছে। দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব বিষবৃক্ষের প্রধান বক্তব্য রমেশচন্দ্রের বঙ্গবিজেতা বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় একটি বিশুদ্ধ রোমান্স কাহিনী, অন্য কোনো উদ্দেশ্য ইহার নাই। দুর্গেশনন্দিনীর তিলোত্তমা ও আয়েষার আদর্শে বঙ্গবিজেতার সরলা ও বিমলা গঠিত। এই দুই জুড়ির ঐক্য আকস্মিক নয়, অনুকরণজাত বলিয়াই মনে হয়। আয়েষার মতই বিমলা দুর্গেশনন্দিনী দুইজনেই কোমলে-কঠিনে ধৈর্যে বীর্যে রচিত। এই দুই কাহিনীর অন্যান্য চরিত্রের মধ্যেও ঐক্য স্পষ্ট।

মৃণালিনীতে যে দেশপ্রেমের সূচনা, রমেশচন্দ্র তাহাকেই জীবন-সন্ধ্যা ও জীবন-প্রভাতে চরমে পৌছাইয়া দিয়াছেন। স্বদেশের প্রতি টান, তাহার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি গৌরবের ভাব লেখকের মনে এত অধিক মাত্রায় ছিল যে, তাঁহার চিত্তের আধার ছাপাইয়া তাহা উপন্যাস-দুটিকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছে।

মাধবীকঙ্কণে দাম্পত্য সম্বন্ধের দায়িত্বের সাক্ষাৎ পাই। বিবাহাতীত প্রেম যতই রমণীয় ও তীব্র হোক-না কেন দাম্পত্য বন্ধনকে তাহার ছিন্ন করা উচিত নয়, ইহাই মাধবীকঙ্কণের শিক্ষা। এ শিক্ষা হিন্দু-সমাজের শিক্ষা। সেই উৎস হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোনো-না-কোনো আকারে এই শিক্ষা ও নীতি বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসে বর্তমান। বিষবৃক্ষেও এই শিক্ষার রূপান্তর আছে। মাধবীকঙ্কণের শিক্ষার মূলে বিষবৃক্ষের ইঙ্গিত থাকাই সম্ভব। কিন্তু বৈধব্যের দ্বারা যেখানে দাম্পত্য বন্ধন অদৃষ্ট কর্তৃক ছেদিত সেখানে নূতন পতি গ্রহণ বিধেয়, সংসার উপন্যাসে রমেশচন্দ্র ইহাই বলিতে চান। এ দিক দিয়া বিচার করিলে রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। সে কথা আগেই বলিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসে সন্ন্যাসী ও তাহার অলৌকিক শক্তি সক্রিয়। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসেও সন্ন্যাসী ও তাহার অলৌকিক ক্রিয়া বর্তমান। খুব সম্ভব দুইজনেই স্কটের উপন্যাস হইতে এই সূত্রটি লইয়াছিলেন।

জীবন-সন্ধ্যা ও জীবন-প্রভাত এবং সংসার ও সমাজ এই চারখানি গ্রন্থ হইতে রমেশচন্দ্রের মানসিক গঠনের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে তাঁহার কর্মজীবন ও অন্যান্য পুস্তকের সাক্ষ্যের প্রয়োজন হইবে, কিন্তু সে তলব আমাদের বর্তমান এলাকার বাহিরে।

জীবন-প্রভাত ও জীবন-সন্ধ্যা হইতে জানিতে পারি যে, লেখকের হৃদয় দেশাত্মবোধে ভরপুর ছিল ; এ দেশের গৌরবময় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও আকর্ষণের অন্ত ছিল না। তাহা ছাড়া দেশের ইতিহাস সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান সুগভীর ছিল।

এ যেমন দেশের প্রাচীন কাল সম্বন্ধে, তেমনি বর্তমান কাল সম্বন্ধে লেখকের মনোভাব জানিতে পাই সংসার ও সমাজ হইতে। তিনি প্রগতিমূলক সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন, বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন কাম্য মনে করিতেন। ইংরেজি শিক্ষা ও প্রাচীন শিক্ষা, নূতন নাগরিক সভ্যতা ও প্রাচীন গ্রাম্য সভ্যতা এই দুই ধারার মধ্যেই ভালো-মন্দ আছে বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল, কোনোটাকেই সর্বথা ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য মনে করিতেন না, বা কোনো-এক ধারাকে অবলম্বন করিয়া আমরা চরিতার্থতা লাভ করিতে পারিব মনে করিতেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সমাজের কল্যাণ শিক্ষাদীক্ষার বিশেষ ধারার উপরে নির্ভর করে না, করে ব্যক্তির মনুষ্যত্বের উপরে। এই মনুষ্যত্ব বা চারিত্রের উপরেই তাহার

ঝোঁক সংসার ও সমাজ গ্রন্থদ্বয়ে। অসাধারণ মানসিক ভারসাম্য থাকিলে তবেই লেখকের পক্ষে এইরূপ মধ্যপন্থা অবলম্বন সম্ভব। রমেশচন্দ্রের তাহা প্রচুর পরিমাণে ছিল। এই গুণ স্মরণ করিয়াই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—তাঁহার চরিত্রে প্রাণের বেগের সঙ্গে অপ্রমত্ততার সম্মিলন ছিল।

৫

বাংলা সাহিত্যে রমেশচন্দ্রের স্থান কোথায় তাহা নির্ণয় করা সহজ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের তিন জন major বা মহৎ ঔপন্যাসিক। রমেশচন্দ্রকে এই দলভুক্ত বলা চলে না। বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস সংসার ও সমাজের সাহিত্যিক সীমাকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে। আবার সংসার ও সমাজকে সমস্যামূলক উপন্যাস বলিয়া ধরিলে গোরা ও ঘরে বাইরে তাহাদের চেয়ে অনেক অগ্রসর, অনেক গভীর। বঙ্গবিজেতা অপরিণত রচনা। মাধবীকঙ্কণ নাটকীয় সম্ভাবনায় পূর্ণ হইলেও ভাবান্ধতাদোষে দুষ্ট। আমার মনে হয়, শেষপর্যন্ত জীবন-সন্ধ্যা ও জীবন-প্রভাতের উপরেই তাঁহার সাহিত্যিক খ্যাতি নির্ভর করিবে। গভীরতর জ্ঞান, ব্যাপকতর দৃষ্টি ও প্রচুরতর শিল্পবুদ্ধির সমন্বয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিত না হওয়া অবধি এই দুইখানি গ্রন্থই বাংলা সাহিত্যে যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস-রূপে বিরাজ করিতে থাকিবে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

১৮৫৩-১৯৩১

বাংলা গদ্যের ও পদ্যের প্রকৃতিতে একটা মূলগত প্রভেদ আছে। বাংলা পদ্যের মূল এই দেশের মাটিতেই নিহিত ছিল, বাংলা গদ্যের মূলে বিলাতি মাটি। রবীন্দ্রনাথের পদ্যের সহিত হাজার বছরের পুরানো বৌদ্ধ গান ও দোঁহার সম্বন্ধ নির্ণয় করা সম্ভব কি না জানি না। তবে এ কথা ঠিক যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কাব্যের সহিত রবীন্দ্রকাব্যের জ্ঞাতিসম্বন্ধ খুব দূরস্থ নয়! চার-পাঁচ শ বছরে বংশধারায় যে পরিবর্তন দেখা যায়, তাহার বেশি নয়। আবার আন্‌কোরা সাহেব মাইকেলের অমিত্রাক্ষর খুব নূতন জিনিস বটে, ঐ আমরা যাহাকে বলিয়াছি বিলাতি মাটি, কিন্তু সেই বিলাতি মাটিরও বনিয়াদ বাংলাদেশের মাটি। কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাসের পয়ার সেই দেশি মাটি। ইহাদের পয়ার না পাইলে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ লিখিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি, দেশজ কবিত্বপ্রবাহের ধারাকে তাঁহারা আত্মসাৎ করিয়া লইয়া বলশালী হইয়াছেন, আবার সেই ধারাকেও পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। বাংলা কাব্যপ্রতিভায় কোথাও একটা বড় রকমের ছেদ পড়ে নাই।

কিন্তু বাংলা গদ্যের ধারা একেবারে স্বয়ম্ভু, হঠাৎ তাহার উদ্ভব বিলাতি মাটি ভেদ করিয়া তাহার প্রকাশ। সেই কারণেই বোধ করি এখনো বাংলা গদ্য বাঙালির ধাতস্থ হয় নাই। সাধু ভাষা বনাম কথ্য ভাষার যে তর্কটা মাঝে মাঝে এখনো শোনা যায় তার মূলে আছে বিলাতি মাটি ও দেশি মাটির দ্বন্দ্ব। লোকের মুখের ভাষা অর্থাৎ লোকভাষার উপরে বাংলা গদ্যের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হইলে এ তর্ক এ আকারে দেখা দিত না। বাংলা গদ্য পণ্ডিতের ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সংস্কৃত ভাষার উপরেও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, খাস বিলাতি গদ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এমন বস্তু যে আদৌ টিকিয়া আছে, পরিত্যক্ত বিলাতি হ্যাট-কোট-নেকটাইয়ের মত আবর্জনার স্তূপকে বাড়ায় নাই, ইহাই তো বিস্ময়ের। বিলাতি মাটিতে বাঁধানো বেদীর উপরে দেশি ঘাস ও গাছগাছড়া গজাইয়াছে; উপর হইতে বিদেশি বলিয়া ধরা পড়ে না, কিন্তু একটু সতর্কভাবে পা ফেলিলেই শক্ত শান পায়ে বাধে। অনেক সময়ে বাংলা গদ্য বুঝিতে না পারিলে মনে মনে তাহাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া লইবামাত্র সহজবোধ্য হইয়া পড়ে।

এখানে একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। বাংলা গদ্য ইংরেজি গদ্যের অনুকরণে গড়িয়া না উঠিয়া যদি লোকভাষার উপরে গড়িয়া উঠিত, তবে তাহার কি আকার হইত। মনে করা যাক, উইলিয়াম কেরি এ দেশে আসিলেন না, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হইল না, বিদ্যাসাগর জজপণ্ডিতি করিতে ত্রিপুরায় চলিয়া গেলেন। তাহা হইলেও কি বর্তমান গদ্যধারা গড়িয়া উঠিত? মনে হয়, না। অন্তত বর্তমান আকারে নয় যে, তাহা সোজা বটেই। অথচ ইতিমধ্যে কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া একটা বিরাট কর্মবহুল সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, কাজের তাগিদে ছোট ছোট গদ্যের ঝরনা বহিতেছে, এমন অবস্থায় বাংলা গদ্যের সূত্রপাত হইলে সে গদ্য অনেক পরিমাণে দেশের প্রকৃতিস্থ হইত। একটা আশঙ্কা এই ছিল যে, বাংলা গদ্যের বিবর্তনে আমরা আজ যেখানে পৌঁছিয়াছি তাহার অনেক পিছনে পড়িয়া থাকিতাম। এখনো হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে পড়িয়া থাকিতাম, অবশ্য সে বঙ্কিমচন্দ্রও আমাদের পরিজ্ঞাত বঙ্কিমচন্দ্র নন।

গদ্য কর্মবহুল সমাজের ভাষা। বাঙালি সমাজ যথেষ্ট পরিমাণে কর্মবহুল হইয়া উঠিবার আগেই বাংলা গদ্য গড়িয়া উঠিয়াছে, যদিচ সে গদ্যের মূলেও ছিল কর্মের তাগিদ। কেরির বাইবেল অনুবাদ করিবার আগ্রহ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যগ্রন্থের চাহিদা, রামমোহনের বাদানুবাদের প্রবৃত্তি—এইসব কারণ, বিশেষ ব্যবসাবাণিজ্যের ব্যাপকতা, সমাজের এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারিত যে-অবস্থাকে ভিত্তি করিয়া প্রতিভাবানের কলম যথার্থ দেশজ গদ্যধারার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইত। কিন্তু ইহাতেও আমাদের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না। দেশজ গদ্যের কি মূর্তি হইত? অনেকে বলিবেন, কেন, লোকের কথিত ভাষার উপরে গদ্যে প্রতিষ্ঠা হইলে আমরা যাহাকে কথ্য ভাষা বলিয়া জানি তাহারই উদ্ভব হইত, কিংবা একমাত্র কথ্যভাষাই ঘরনী হইত, সপত্নী সাধুভাষাকে লইয়া ঘর করিতে গিয়া অনবরত কলহের সৃষ্টি করিতে হইত না।

কিন্তু কথ্যভাষা বলিতে কি বুঝি? আলালী ভাষা, রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরের ভাষা, না বীরবলী ভাষা? এইগুলিই সাহিত্যিক কথ্যভাষার নমুনারূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে। আলালের ভাষা আজ অপ্রচলিত এবং দুরূহ তুলনায় সীতার বনবাস অনেক বেশি আধুনিক ও সুবোধ্য। ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ ছাড়া কথ্য-ভাষার আর কোনো লক্ষণ ঘরে বাইরের ভাষায় ও বীরবলী ভাষায় আছে কি না সন্দেহ। বস্তুত যে গদ্য কখনো গড়িয়াই উঠে নাই তাহার আদর্শ পাওয়া যাইবে কি করিয়া। তবু তাহার একটা আভাস পাওয়া কঠিন নয়। আমার ধারণা,

বিবেকানন্দের চিঠিপত্রে, যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির রেঢ়ো টান বিশিষ্ট বাঁকা বাংলায়, অবনীন্দ্রনাথের খেয়ালী রচনায় এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনায়, যে গদ্য হইতে পারিত অথচ হয় নাই, তাহারই একটা ছায়া পাওয়া যায়। পাছে কেহ ভুল বোঝেন, তাই বলিয়া রাখি, গদ্যলেখক হিসাবে কাহাকেও ছোট বা বড় করিবার বা কাহারও স্থাননির্ণয়ের উদ্দেশ্যে এ কথা বলিতেছি না।

২

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষার স্বকীয়তা তাঁহার বেনের মেয়ে (১৯২০) উপন্যাসে এবং শেষের দিকে লিখিত প্রবন্ধাদিতে সবচেয়ে পরিস্ফুট। তাঁহার কাঞ্চনমালা (১৯১৬) ও বাল্মীকির জয় (১৮৮১) প্রথমদিকের রচনা, দুখানিই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, বাল্মীকির জয় ১২৮৮ (১৮৮১) সালে, আর কাঞ্চনমালা ১২৮৯ (১৮৮২-৮৩ সালে। দুখানি গ্রন্থের ভাষাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব আছে, কাঞ্চনমালার কাহিনীবিন্যাসে তো আছেই। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব কি ভাষায়, কি কাহিনীর টেকনিকে কাটাইয়া উঠিতে তাঁহাকে অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছে। বেনের মেয়ে ১৩২৫ (১৯১৮-১৯) সালে নারায়ণে প্রকাশিত। ভাষা তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব, যদিচ কাহিনীবিন্যাসের রীতিতে কোথাও কোথাও বঙ্কিমচন্দ্রীয় টেকনিক দৃষ্ট হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার সহিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষার মিল ও অমিল দুইয়ের কথা বলা হইল, বঙ্কিমচন্দ্রের রীতি হইতে তাঁহার স্বকীয় রীতির বিবর্তনের ইঙ্গিতও দেওয়া হইল, তৎসত্ত্বেও এক জায়গায় একেবারে গোড়া ঘেঁষিয়া দুই জনের ভাষায় ঐক্য আছে। দুইজনেরই ভাষা মূলত যুক্তিসিদ্ধ মনের ভাষা। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে প্রচুর-পরিমাণে কবিত্বরস আছে, তৎসত্ত্বেও তাঁহার মন মূলত নৈয়ায়িকের মন। সে কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার চরম উৎকর্ষ তাঁহার উপন্যাস-গুলিতে নয়, তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে এবং কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে। শেষোক্ত শ্রেণীর রচনায় তাঁহার নৈয়ায়িক মন স্বভাবসিদ্ধ স্থানটি লাভ করিয়াছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মনও নৈয়ায়িক মন, যদিচ বাল্মীকির জয় এবং বেনের মেয়ে গ্রন্থদ্বয়ে কল্পনার অবকাশ সুপ্রচুর।

রবীন্দ্রনাথের মন মূলত কল্পনাপন্থী। প্রচুর কল্পনার জোগান না থাকিলে

রবীন্দ্রনাথের স্টাইলকে অনুসরণ বিপদের কারণ হইয়া পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের নৈয়ায়িক স্টাইল পদাচারী পথিক, তাহাকে অনুসরণ কঠিন নহে। অক্ষয় সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাহাকে অনায়াসে অনুসরণ করিয়াছেন। হরপ্রসাদ শেষ-পর্যন্ত স্বকীয়তায় পৌঁছিয়াছেন, অক্ষয় সরকার ও চন্দ্রনাথ বসু সম্বন্ধে সে কথা প্রযোজ্য না হইলেও তাঁহাদের গ্রন্থে ভাষাগত মুদ্রাদোষ দেখা দেয় নাই। কল্পনার সম্বল না লইয়া যাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করিতে গিয়াছেন, তাঁহাদের কয়-জনের সম্বন্ধে এমন কথা সাহস করিয়া বলা যায়।

এখানে আর-একটা জটিল সমস্যা আসিয়া পড়িল, নৈয়ায়িকের মন আর কল্পনাপন্থীর মন। বাঙালি সমাজের সমষ্টিগত মনে এই দুইটি উপাদানই আছে, বাঙালি নৈয়ায়িকও বটে, আবার কল্পনাপ্রবণও বটে। যে বাঙালি নব্যন্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে, সেই বাঙালিই বৈষ্ণব পদাবলী লিখিয়াছে—বাংলাদেশের মানসচিত্রে ভট্টপল্লী ও নান্নুর-কেন্দুলি পাশাপাশি অবস্থিত। কাঁঠালপাড়া হইতে ভাটপাড়া অধিক দূর নহে, নৈহাটি হইতে ভাটপাড়া আরও কাছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খুব সম্ভব নৈয়ায়িক-বংশের সন্তান।

আগে বাংলা সাহিত্যের মুখ্য ভাষা সম্বন্ধে একটা কল্পনার অবতারণা করিয়াছি। বর্তমান প্রসঙ্গ অবলম্বনে আর-একটা জল্পনার সূত্রপাত করা যাইতে পারে। এ দেশের রাজা ইংরেজ না হইয়া ফরাসি হইতে পারিত, এক সময়ে সে সম্ভাবনা ছিল। তেমন ঘটিলে বাংলা সাহিত্য কি আকার লাভ করিত? ইংরেজি সাহিত্য কল্পনাপ্রবণ, তাহাতে কাব্যটাই প্রবল; ইংরেজি গদ্য কল্পনাপ্রবণের গন্ত, সে গদ্য মূলত কাব্যধর্মী। এমন যে ইংরেজি সাহিত্য, তাহার প্রভাবে বাঙালি মনের কল্পনাপ্রবণ উপাদানগুলি জোর পাইয়াছে, বাঙালির কাব্য যেমন সতেজ হইয়া উঠিয়াছে গদ্য তেমন হইতে পায় নাই; বরঞ্চ ইংরেজি গদ্যের কাব্যধর্ম বাংলা গদ্যে সংক্রামিত হইয়া গিয়াছে। বাংলার নৈয়ায়িক মন ইংরেজি সাহিত্যের কাছে প্রশ্রয় পায় নাই। ফরাসি জাতি এ দেশের রাজা হইলে ফরাসি সাহিত্যের প্রভাব ইহার বিপরীত প্রক্রিয়াটা হইত মনে করিলে অন্যায় হইবে না। ফরাসি সাহিত্য যুক্তিপন্থী, তাহার গৌরব গদ্য। ফরাসি কাব্য গদ্যধর্মী, অর্থাৎ যুক্তির পথ ছাড়িয়া সে কাব্য অধিকদূর যাইতে সম্মত নয়। কর্নেই ও রাসিনের নাটক নৈয়ায়িক মনের কাব্য। ব্যাপকভাবে ফরাসি সাহিত্যের প্রভাব বাংলাদেশের উপরে পড়িলে বাঙালির নৈয়ায়িক মন সমর্থন পাইত, কাব্যাংশে বাংলা সাহিত্যে তেমন-সমৃদ্ধ হইত কি না জানি না। তবে এ কথা নিশ্চয় যে, বাংলা গন্ত একপ্রকার স্বচ্ছতা সরলতা

স্বচ্ছন্দগতি ও দীপ্তি লাভ করিত, বর্তমান বাংলা গদ্যে যাহার একান্ত অভাব। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কলমে যে গদ্য বাহির হইয়াছে, যে গদ্যকে বাংলা গদ্যের নিয়ম না বলিয়া নিয়মের ব্যতিক্রম বলাই উচিত, সেই ধারাটাই বাংলা গদ্যসাহিত্যের রাজপথ হইয়া উঠিত। এখন শাস্ত্রী মহাশয়ের বসতি বাংলা সাহিত্যের একটি গলিতে, বিধাতার অভিপ্রায় অন্যরূপ হইলে সেটা বড় সড়কের উপরে হইতে পারিত। ডুপ্লের কূটনীতির জয় হইলে ভট্টপল্লী বাঙালি মনের রাজধানী হইতে পারিত। কিন্তু এসব জল্পনা বোধ করি নিরর্থক; হয়তো এইটুকু অর্থ ইহাতে আছে যে, বাঙালি মনের গতিবিধি এবং প্রসঙ্গক্রমে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্টাইলের একটা ইঙ্গিত ও পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

৩

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্বকীয় স্টাইলের নমুনারূপে বেনের মেয়ে হইতে দুইটি অংশ তুলিয়া দিতেছি। প্রথমটিতে তারাপুকুরের একটি জলাশয়ে মাছ-ধরার বর্ণনা—

> ক্রমে জাল তারাপুকুরের মাঝামাঝি আসিয়া পৌঁছিল। তখন সূর্যদেবের রাঙা কিরণও আসিয়া তারাপুকুরের জল সোনার রং করিয়া দিল। কিন্তু এ কি? জাল যে আর টানা যায় না। জালের তলায় এত মাছ পড়িয়াছে যে, দুই নৌকার জেলেরাই জাল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না। তখন জালের দড়ি নোল করিয়া দেওয়া হইল। কতকগুলি মাছ ঘাই দিয়া লাফাইয়া জালের পিছনে গিয়া পড়িল। তাহারা যখন লাফায়, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন রূপার মাছ-বৃষ্টি হইতেছে। মাছগুলা রূপার মত সাদা, মাজা রূপার মত চক্‌চকে, একটার পর আর একটা পড়িতেছে। চক্‌চকে রূপার রঙের উপর সূর্যের সোনালি রং পড়িয়া গিয়াছে। সে রঙের মেশামিশিতে এক অপূর্ব শোভা। জাল হালকা হইল, আবার জালটানা আরম্ভ হইল। ক্রমে জাল আসিয়া অপর পারে পৌঁছিল। এইবার জাল গুটান আরম্ভ হইল। মাছেদের এইবার মরণ-কামড়। যত জাল গুটাইয়া আনিতে লাগিল, তাহাদের লাফালাফি ততই বাড়িতে লাগিল। রূপার ঝকঝকানিও ক্রমে উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতর, উজ্জ্বলতম হইয়া আসিল। ক্রমে তারাপুকুর যেন একপেশে হাঁয়ে দাঁড়াইল। পূর্ব, পশ্চিম দক্ষিণ পাড়ে কোথাও লোক নাই।

যেখানে জাল সেইখানেই লোক। একদিকে যেমন মাছের ঘপাঘপানি, আর একদিকে তেমনি লোকের কলরব।

দ্বিতীয় বর্ণনাটি গাজনের শোভাযাত্রার। হাতীর উপরে রাজগুরু ও গুরুপুত্র চাপিয়াছেন, তাঁহাদেরও দেখিতে পাইব—

তিনটার সময়ে রাজবাড়ীতে গাজনের সাজন হইল। মূল সন্ন্যাসীর মাথা নেড়া, লম্বা দাড়ী, গোঁপ কামান, গায়ে আলখাল্লা, তাঁহার গায়ে ছোট ছোট নানা রঙের রেশমের, পাটের, বাকলের টুকরা লাগান। তাঁহাকে রাজা আসিয়া নমস্কার করিলেন এবং তাঁহার হাত ধরিয়া একটা প্রকাণ্ড হাতীর হাওদায় তুলিয়া দিলেন। খুব সাজানো একটা হাতী, সর্বাঙ্গে শিঙ্গার করা, বড় বড় রাঙা রাঙা শাদা শাদা কাল কাল ডোরা দেওয়া, তাহার উপর কিংখাপের হাওদা, হাওদার চারিদিক দড়ি দিয়া ঘেরা খুব জাঁকাল, খুব জমকাল। রাজা গুরুদেবকে সেই হাতীতে চড়িতে ও সেই হাওদায় বসিতে বলিলেন। ক্রমে হাতী আসিয়া গুরুদেবের পদতলে উপুড় হইয়া পড়িল ও শুঁড় দিয়া তাহার পদসেবা করিতে লাগিল। হাতীর পিঠে একটা সিঁড়ি লাগিল, সেই সিঁড়ি বাহিয়া গুরুদেব হাতীতে উঠিলেন। তাঁহার সহিত একটা ছোকরা, তেমন সুন্দর ছেলে দেখা যায় না, যেন সত্য সত্যই রাজপুত্র, মাথাটি মুড়ান, বোধহয়, প্রায়ই খেউরি করা হয়, গোঁপ নাই, দাড়িও নাই। রংটি যতদূর ধবধবে হইতে পারে; চোখ দুটি পটল-চেরা; ঠোঁট দুটি পাতলা অথচ লাল, গাল দুটি বেশ গোলগাল দাড়িটি ক্রমে সরু হইয়া ছুঁচাল হইয়া গিয়াছে, কপালখানি ছোট, কম চওড়া; দুই রগের দিকে চুলগুলি একবার ভিতরের দিকে ঢুকিয়া আবার বাহিরে আসিয়া কোণ করিয়া কানের কাছে জুলপি হইয়া গিয়াছে।

এই ভাষাকেই আমরা মুখ্য ভাষার আদর্শ বলিতেছি। প্রথম লক্ষণীয়, ইহার ক্রিয়াপদগুলি সংক্ষিপ্ত নয়। অনেকের ধারণা, খেয়ালের ডাণ্ডা মারিয়া ক্রিয়াপদ-গুলির হাড়গোড় ভাঙিয়া দিলেই সাধুভাষা কথ্যভাষা হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে সেরূপ অপচেষ্টা নাই, তবু ইহা মুখ্য ভাষা, যেহেতু ইহার বিন্যাস এমন যে, সাধারণ কথাবার্তা বলিতে যেটুকু নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জোর দরকার ইহাতে ততোধিক জোরের প্রয়োজন হয় না। বিশ্রম্ভালাপের সময় কথা বলিতেছি এ চৈতন্য সব সময় হয় না, এই গদ্য পাঠকালেও প্রায় সেই রকম অবস্থা। ইহাতে তৎসম, তদ্ভব ও খাঁটি দেশি শব্দ কেমন সুকৌশলে মিশ্রিত, খাপে-খাপে খোপে-খোপে কেমন জোড়া

লাগিয়া গিয়াছে। ইহার তুলনায় আলালী ভাষা গ্রাম্য, বীরবলী ভাষা কৃত্রিম। এ ভায়া শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারে। খাঁটি সংস্কৃতর সঙ্গে খাঁটি দেশির মেলবন্ধন সামান্য প্রতিভার লক্ষণ নয়। মুখ্যভাষা রচনায় সেই প্রতিভার আবশ্যক। সেই প্রতিভা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীতে অসামান্য রকম ছিল।

৪

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচিত রসসাহিত্য বলিতে বাল্মীকির জয়, কাঞ্চনমালা এবং বেনের মেয়ে এই গ্রন্থ-তিনখানিকে বুঝি। তাঁহার প্রবন্ধাদির বিশেষ মূল্য থাকিলেও সেগুলি বর্তমান প্রবন্ধের পরিধির অন্তর্গত নয়।

বাল্মীকির প্রতিভার স্ফুরণ এবং সেই প্রতিভার প্রভাবে বিশ্বে ভ্রাতৃভাবের উদয় বাল্মীকির জয় গ্রন্থের বিষয়। আদিকবিকে অবলম্বন করিয়া কিছু লিখিবার ইচ্ছা লেখকমাত্রেরই পক্ষে স্বাভাবিক। বাংলা সাহিত্যে আদিকবিকে কেন্দ্র করিয়া দুখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে—রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকিপ্রতিভা ও হরপ্রসাদের বাল্মীকির জয়। দুখানি গ্রন্থই প্রায় সমকালে লিখিত। রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকিপ্রতিভার প্রথম প্রকাশ ১৮৮১ সালের ফাল্গুন মাসে; বাল্মীকের জয়ের প্রথম প্রকাশ ১৮৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে, তৎপূর্বে ১২৮৮ (১৮৮) সালের পৌষ মাঘ ও চৈত্র সংখ্যার বঙ্গদর্শনে ইহা আংশিক প্রকাশিত হইয়াছিল।

সমকালে ভূমিষ্ঠ গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে কে কাহার কাছে ঋণী বলা সহজ নয়, তবে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে বাল্মীকির জয়ের যে বিশদ আলোচনা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বলিতেছেন যে—

> যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্মীকিপ্রতিভা পড়িয়াছেন বা তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা কবিতার জন্মবৃত্তান্ত কখনো ভুলিতে পারিবেন না।' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথবাবুর অনুগমন করিয়াছেন।

হরপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের অনুগমন করিলেও বাল্মীকির জয়ে তাঁহার কল্পনায় বিশেষ স্ফুর্তি হইয়াছে, ব্রহ্মাণ্ডসঞ্চারী কল্পনার গতি বাল্মীকির জয়ে সমধিক বলিয়াই মনে হয়।

বাল্মীকির জয় আলোচনা করিতে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এক বিপদে পড়িয়াছিলেন, তিনি ইহার শ্রেণীনির্ণয় করিতে পারেন নাই। ইহা কোন্ শ্রেণীর গ্রন্থ? ইহা

উপন্যাস নয়, নাটক নয়, কাব্য নয়, জীবনী নয়, ইহাকে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধও বলা যায় না, এমনকি ইহাকে পুরাণ বলিয়াও স্বীকার করেন নাই। কিন্তু আমাদের মনে হয় গ্রন্থের যদি শ্রেণীনির্ণয় করিতেই হয়, তবে বাল্মীকির জয়কে এক অভিনব পুরাণ বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত। পুরাণ একপ্রকার ইতিহাস। একপ্রকার এই কারণে যে, বর্তমানে ইতিহাস বলিতে যাহা বুঝি পুরাণ সে শ্রেণীর ইতিহাস নয়। বর্তমান ইতিহাস 'পাথুরে প্রমাণ' ছাড়া কিছু স্বীকার করে না, পুরাণকারগণ যাবতীয় তথ্যকেই গ্রন্থভুক্ত করিতেন। এই বিচারে থুকিডাইটিস্ ঐতিহাসিক আর হেরোডোটাসের গ্রন্থ পুরাণ। বাল্মীকির জয় শেষোক্ত শ্রেণীর গ্রন্থ।

গ্রন্থের বক্তব্য কি? আবার বঙ্কিমচন্দ্রের শরণাপন্ন হইতে হইল। তিনি বলিতেছেন—

> ভালো, গ্রন্থের জাতিনির্বাচন করিতে না পারি, এক রকম পরিচয় দিতে পারিব। গ্রন্থকার নিজে টাইটেল পেজে একপ্রকার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লিখিয়াছেন The Three Forces—Physical, Intellectual and Moral। ইংরেজি ভাষার শপথ করিতেছি, যদি ইহার কিছু বুঝিয়া থাকি। Force তো দেখিলাম না, দেখিলাম কেবল তিনটি বিরাট মূর্তি, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র বাল্মীকি।

গ্রন্থকার ও সমালোচক দুজনের কথাই সত্য। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল একটি কাহিনী ও তিনটি চরিত্র অবলম্বন করিয়া তিনটি forceএর লীলা বর্ণনা করিবেন, কিন্তু কার্যত সেই লীলা প্রদর্শন কতদূর সত্য হইয়াছে জানি না, মূর্তি তিনটি একান্ত বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে; ভালোই হইয়াছে, যাহা নীরস প্রবন্ধ হইবার কথা, তাহা সরস আলেখ্য হইয়া দেখা দিয়াছে।

গ্রন্থকার বলিতে চান যে, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকি তিন জনে বিশ্বে সমতা ও ভ্রাতৃভাব আনিতে চাহিয়াছিলেন। বশিষ্ঠের সহায় জ্ঞান, বিশ্বামিত্রের সহায় বাহুবল, আর বাল্মীকির সহায় প্রীতি। জ্ঞানে মানুষকে এক করিতে পারে না, স্বতন্ত্র করিয়া দেয়; বাহুবলে মনের সঙ্গে মনের জোড় বাঁধিতে পারে না পরাধীন করিয়া পিণ্ডীকৃত করিয়া রাখিতে পারে—তাহা মনের মিলন নয়, বরঞ্চ বিজিত ও বিজেতার মধ্যে গোপন বিদ্বেষের সৃষ্টিকারক। কেবল প্রীতিই মানুষের সঙ্গে মানুষকে মনের মিলনে গাঁথিয়া এক করিয়া তুলিতে পারে। মানুষে মানুষে মিলন ঘটাইবার ইহাই একমাত্র উপায়। এই উপায় অবলম্বন করিবার ফলেই বাল্মীকির জয় আর বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের ব্যর্থতা।

কিন্তু এই নীতি বিশ্লেষণে বাল্মীকির জয়ের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হইল না। আবার বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণ করিব। তিনি এই বইখানি সম্বন্ধে বলিতেছেন—

> যেমন কল্পনা, তেমন বর্ণনা। ভাষা সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু আমরা এই গ্রন্থের বাংলাকে উৎকৃষ্ট বাংলা বলি। গ্রন্থখানি অতি ক্ষুদ্র কিন্তু গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় একটি উজ্জ্বলতম রত্ন। আর কোনো বাংলা গ্রন্থকার এত অল্প বয়সে এরূপ প্রতিভা ও মানসিক শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এমন আমাদের স্মরণ হয় না।
>
> বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির পরিবর্তনের প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই তবে যে বাল্মীকির জয় অধুনা উপেক্ষিত, তার কারণ সাময়িকভাবে বাঙালির সাহিত্যিক রুচিবিকৃতি ঘটিয়াছে। এই রুচিবিকারের অন্তে বাল্মীকির জয় তাহার যথার্থ আসন লাভ করিবে সন্দেহ নাই।

৫

কাঞ্চনমালা ও বেনের মেয়ে উপন্যাস। পুরাতত্ত্ববিদ্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ যে এক সময়ে উপন্যাস লিখিয়াছিলেন এ কথা আধুনিক যুগ ভুলিতে বসিয়াছে। কাঞ্চনমালা লিখিত হয় তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভে, ১২৮৯ সালে। আর বেনের মেয়ে ১৩২৫ সালের কার্তিক হইতে ১৩২৬ সালের অগ্রহায়ণ পর্যন্ত নারায়ণ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাকে তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের শেষাংশের রচনা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই সময়ের মধ্যে তিনি রসসাহিত্যের পথ পরিত্যাগ করিয়াছেন, ভারতবিখ্যাত পুরাতাত্ত্বিকরূপে স্বীকৃত হইয়াছেন। তবু বেনের মেয়ের রচনা দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে পাথুরে প্রমাণের আঘাতে তাঁহার সাহিত্যের কলম ভোঁতা হইয়া যায় নাই, বরঞ্চ আরও শক্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। উপন্যাসরচনায় পুরাতত্ত্বের জ্ঞান তাঁহার সহায় হইয়াছে, পাথরের চাপে মাটির শ্যামল তৃণদল শুকাইয়া মরিয়া যায় নাই।

কাঞ্চনমালা মহারাজা অশোকের পুত্র কুণালের পত্নী। কাঞ্চনমালা উপন্যাস তিষ্যরক্ষিতা কর্তৃক নিগৃহীত কুণাল ও কাঞ্চনমালার কাহিনী। কাহিনীর স্থল সেকালের পাটলিপুত্র ও তক্ষশিলা। ব্রাহ্মণ্যশক্তির সহিত বৌদ্ধশক্তির সংঘাত এবং শেষোক্ত শক্তির জয় এই কাহিনীর বৃহত্তর বিষয়, যেমন বাল্মীকির জয়

তন্নামখ্যাত গ্রন্থের বিষয় যেমন ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের যুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণগণের জয় বেনের মেয়ের উপন্যাসের বৃহত্তর বিষয়। এই রকম কোনো একটা ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক সূত্র অবলম্বন করিয়া রচনা করিতে হরপ্রসাদ যেন ভালোবাসিতেন, খুব সম্ভব তাঁহার অসাধারণ পুরাতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান ও প্রতিভা যেন একটা আশ্রয় পাইত। যে কারণেই হোক আলোচ্য তিনখানি গ্রন্থেই এই একই পন্থা দেখিতে পাই।

কাঞ্চনমালা কাঁচা গ্রন্থ; ইহার ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের, ইহার কাহিনী-বিন্যাসের রীতিও বঙ্কিমচন্দ্রীয়, আবার বাল্মীকির জয়ে যে চিন্তার স্বকীয়তা আছে এখানে তাহারও অভাব। তার উপরে সমসাময়িক যে তথ্যজ্ঞান বেনের মেয়েকে সত্য ও প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিয়াছে, কাঞ্চনমালায় তাহাও পাই না। তবে বিষয়নির্বাচনে লেখকের দৃষ্টির বাহাদুরি দেখিতে পাই। কুণালের তথা বৌদ্ধশক্তির জয় বর্ণনা করিয়া লেখক বলিতেছেন—

> এই দিবস যে কার্য হইল তাহার বলে এক্হাজার বৎসর ভারত বৌদ্ধ ছিল। সমস্ত এশিয়া এই দিনের কার্যবলে বৌদ্ধধর্ম আশ্রয় করে।

এই দৃষ্টি জন্ম-ঐতিহাসিকের দৃষ্টি। যাঁহারা হরপ্রসাদকে সাহিত্যিক বলিয়া স্বীকার করিবেন না, তাহাদেরও সাহস নাই যে তাঁহাকে ঐতিহাসিক না বলেন। তবে 'পাথুরে' প্রমাণে তাঁহার তত আস্থা ছিল না। ভাগ্যে ছিল না, তাই পাথর কুঁদিয়া তিনি বেনের মেয়ের মূর্তি সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

৬

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষার নমুনা আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি আরও করিয়াছেন। হাজার বছরের পুরানো বাংলা সমাজের নমুনা আবিষ্কার করিয়াছেন। বেনের মেয়ে হাজার বছরের পুরানো বাংলাদেশের সামাজিক উপন্যাস। তখন রূপা-বাগ্দী

> মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম সৌগত শ্রীশ্রী ১০৮ রূপনারায়ণ সিংহ উপাধি লইয়া প্রবল প্রতাপে সাতগাঁ সহর ও সপ্তগ্রাম ভুক্তি শাসন করিতেছেন।

সে সহজযানভুক্ত বৌদ্ধ। সপ্তগ্রামে বৌদ্ধ রাজ্য। গাজনের উৎসব উপলক্ষে

রাজগুরু সিদ্ধাচার্য লুইপাদ সাতগাঁয়ে আসিয়াছেন। এই লুইপাদের রচিত দোঁহা আছে, সেগুলিও হরপ্রসাদের আবিষ্কৃত। সাতগাঁয়ে ব্রাহ্মণ আছে, তবে তাহাদের প্রতাপ নাই। প্রতাপ আছে বেনেদের। বেনেদের বড দব্‌দবা। তাহারা সমুদ্র পার হইয়া নিজেদের অর্ণবপোতে দেশবিদেশে যায়, বিদেশের লক্ষীকে ঘরে আনে। এই বেনে-সমাজের শ্রেষ্ঠ বিহারী দত্ত। তাহার মেয়েই এই কাহিনীর নায়িকা। বেনেরা বৌদ্ধ নয়, কিন্তু তাহাদের ঐশ্বর্যের খাতিরে বৌদ্ধ রাজা তাহাদের ভয় করিয়া চলে। এই কাহিনী সম্বন্ধে লেখক মুখপাতে বলিতেছেন—

বেনের মেয়ে ইতিহাস নয়, সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়। কেননা, আজকালকার 'বিজ্ঞানসংগত' ইতিহাসের দিনে পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন ইতিহাসই হয় না। আমাদের রক্তমাংসের শরীর, আমরা পাথুরে নই, কখনো হইতেও চাই না। বেনের মেয়ে একটা গল্প। অন্য পাঁচটা গল্প যেমন আছে, এও তাই। তবে এতে এ কালের কথা নাই। সব সেই কালের, যে কালে বাঙালির সব ছিল। বাংলার হাতী ছিল, ঘোড়া ছিল, জাহাজ ছিল, ব্যবসায় ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, কলা ছিল।

লেখক ইহাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেন নাই, আমরাও নাই বলিলাম। তবে ইহাকে সামাজিক উপন্যাস বলিতে ক্ষতি দেখি না। তবে এক হিসাবে ইহা ইতিহাসেরও বাড়া, যেহেতু হাজার বছরের পুরানো বাঙালি সমাজের যে চিত্র ইহাতে আছে তাহা কোনো ইতিহাসে বা ঐতিহাসিক উপন্যাসে নাই। সে যুগটা বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে বৌদ্ধ প্রভাবের শেষ সময়। এই গ্রন্থেই দেখিতে পাইব বেনেদের ষড়যন্ত্রে বা সাহায্যে বৌদ্ধ প্রভাব দূরীভূত হইয়া ব্রাহ্মণ্য প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। বেনেরা হিন্দুসমাজের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকৃত হইল। যাহারা ব্রাহ্মণদের প্রভাব স্বীকার করিল তাহারা 'জল-চল' জাতি হইল, যাহারা স্বীকার করিল না তাহাদের জল অনাচরণীয় হইয়া রহিল। হরপ্রসাদ এই যুগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি যে সামাজিক ও ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন, বেনের মেয়ে উপন্যাসে সেসব কাজে লাগিয়া গিয়াছে। কাজেই তাঁহার বর্ণিত বিষয়গুলিকে অলীক মনে করা উচিত হইবে না, বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করাই সংগত। সেকালের যুদ্ধের বর্ণনায় এক জায়গায় তিনি বারুদের উল্লেখ করিয়াছেন। হাজার বছর আগে বারুদের ব্যবহার ছিল কি না জানি না। কিন্তু এই একটি দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কোথাও অসংগতি চোখে পড়ে নাই।

রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাসের রাজপথ। বড় বড় বীর,

রাজপুরুষ, ইতিহাসবিখ্যাত ব্যক্তিদের সেখানে ভিড়। বেনের মেয়ে ইতিহাসের গলিঘুঁজি। হরপ্রসাদ আর সকলের অজ্ঞাত গলিপথে সেকালে অখ্যাতদের রান্না-ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া তাহাদের হাঁড়ির খবর একালের গোচর করিয়া ছাড়িয়াছেন। সেই বিস্মৃত কালের সামাজিক আবহাওয়া-সৃষ্টিতেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। এক সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অসমাপ্ত উপন্যাস ডঙ্কানিশান হিসাবে না অনিলে, এ বিষয়ে বেনের মেয়ের জুড়ি নাই ; আর জুড়ি না থাকিলে অনেক সময়ে যেমন হয় তাহাই হইয়াছে, এই কাহিনীটি সম্পূর্ণ অনাদৃত। গ্রন্থাবলী সিরিজে ইহা দুর্লভ হইয়া আছে, এ সংবাদ বাঙালি রসিকের পক্ষে গৌরবের নয়। গ্রন্থাকারে সুলভ হইয়া বাঙালির ঘরে ঘরে ইহা বিরাজ করিবার যোগ্য, স্কুল-কলেজে ইহা পঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, ইহা একাধারে ইতিহাস ও রস-সাহিত্য। আর আজকার দিনে যাঁহারা সাহিত্যে সমাজচৈতন্য চান, তাঁহারা ইহাতে পেট পুরিয়া সমাজচৈতন্য পাইবেন। দেখিতে পাইবেন যথার্থ সমাজচৈতন্য কি বস্তু এবং কেমনভাবে তাহাকে সরস করিয়া তুলিতে হয়।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। একটা ছেলেভুলানো ছড়া বাংলাদেশের সবাই জানে—

আগ ডোম বাগ ডোম ঘোঁড়া ডোম সাজে
ডান মৃগল ঘাঘর বাজে।
বাজতে বাজতে পড়লো সাড়া,
সাড়া গেল বামন পাড়া।

এই প্রাচীন ছড়াটির অর্থ কেহ জানে কি? সকলেই নিরর্থক মনে করিয়া বকিয়া যায়। কিন্তু ইহাতে সেকালের ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ বিবাদের চিহ্ন যে বর্তমান, ইহা যে জীবন্ত 'সমাজচৈতন্য' হরপ্রসাদের বেনের মেয়ে পড়িবার আগে জানিতাম না। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বৌদ্ধদের যুদ্ধ আসন্ন। রাজা হুকুম দিলেন 'সব বাগ্‌দী সাজো।' বাগদীরা কেবল লড়ে। কিন্তু রাস্তা তৈয়ার করা শত্রুর গতিবিধি দেখা ডোমদের কাজ, আর ঘোড়সোয়ারও ডোম, দশ হাজার বাগ্‌দী সাজিলে সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ-হাজার ডোমও সাজিল। তাহারা আগে গিয়া রাস্তা দেখিতে ও তৈয়ার করিতে লাগিল, বাজনা বাজাইতে লাগিল। ঘোড়ায় চড়িয়া দেশের অবস্থা দেখিতে লাগিল। গান উঠিল 'আগ ডোম বাগ ডোম ঘোঁড়া ডোম সাজে' ইত্যাদি। ডোমদের সাড়া বামনপাড়ায় গেলে তাহারা ভারি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।

এবার ছেলেভুলানো ছড়াটির অর্থ কি স্পষ্ট হইয়া উঠিল না? এখন আর ইহাকে নিরর্থক ছাড়া মনে হইবে না, ইতিহাসের নজির মনে হইবে। ইহাই

সমাজচৈতন্যের যথার্থ সাহিত্যিক রূপ। কতকগুলা ঘটনার বিবরণ সমাজচৈতন্য নয়, তাহার জন্য সংবাদপত্র আছে।

বৌদ্ধরাজ্য নাশ হইল এবং হরিবর্মার হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। হরিবর্মা স্থির করিলেন গোটা ভারতবর্ষের গুণীজ্ঞানীদের ডাকিয়া এক সভা করিবেন এবং তাহাদের যথাযোগ্য পুরস্কার দান করিবেন। হরিবর্মার দূত ভারতবর্ষের গুণি-সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করিতে বাহির হইল। তাঁহার দূত মুঙ্গের পাটনা নালন্দা রাজগির ওদন্তপুরী বুদ্ধগয়া প্রভৃতি পার হইয়া কাশী হইয়া কনৌজ পর্যন্ত পৌছিল। সেখানে গিয়া শুনিতে পাইল যে, মুসলমানে ভারত আক্রমণ করিতে আসিতেছে, সবাই আসন্ন যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত; সভা করিতে কাহারও মন হইবে না, রাজদূত বুঝিতে পারিল। ভারগ্রস্ত মন লইয়া রাজদূত ফিরিয়া আসিল। কয়েকটি পরিচ্ছেদে লেখক প্রাচীন ভারতের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জনপদগুলির বর্ণনা করিয়াছেন। সে বর্ণনা ঐতিহাসিকের নয়, কারণ ঐতিহাসিক দেখে দূর হইতে একাল হইতে সে কালকে; এ বর্ণনা সেই শিল্পীর মানস-উদ্ভূত, ইতিহাসের জাহ্নবীকে যিনি গণ্ডূষে পান করিয়াছেন। এ দেখা ভিতর হইতে দেখা, কাছে হইতে দেখা, সেই কালে গিয়া সেকালকে দেখা। এই পরিচ্ছেদ-কয়েকটিকে ইতিহাসের মেঘদূত বলা উচিত। এগুলি পড়িবার সময়ে লেখকের জ্ঞান ও বর্ণনাশক্তি মুগ্ধ করিয়া দেয়, মনে হয় হরিবর্মার দূতের তলপি বহিয়া আমরাও সঙ্গে চলিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, এ দেশে যাহারা লেখে তাহারা পড়ে না, আবার যাহারা পড়ে তাহারা লেখে না। হরপ্রসাদ তাহার ব্যতিক্রম। কাঞ্চনমালায় সে ব্যতিক্রম তেমন স্পষ্ট নয়। বেনের মেয়ে পাঠ করিলে বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই তাঁহার ভ্রম স্বীকার করিতেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্যরচনার মূল প্রেরণা কোথা হইতে আসিল? নিছক আত্মপ্রকাশের প্রবৃত্তি হইতে তাহার উদ্ভব মনে হয় না। এই দেশকে, এই দেশের ঐতিহ্যকে তিনি নিগূঢ়ভাবে ভালোবাসিতেন। এই দেশের প্রাচীন কালের জটিল জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাঁহার অগাধ জ্ঞান সেই ভালোবাসাকে একটা বাস্তব ভিত্তি দিয়াছিল। এ ভিত্তির উপরে তাঁহার রসসাহিত্য প্রতিষ্ঠিত এবং ভালো-বাসার বন্ধনে তাহা সুবিন্যস্ত বলিয়া মনে হয়। সার্ ওয়াল্টার স্কট রাজনৈতিক

মতবাদে টোরি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সুগভীর স্বদেশপ্রেম তৎকালীন কোনো অনলবর্ষী বিপ্লবী বা উদারনৈতিকের চেয়ে কম ছিল না বরঞ্চ অনেকাংশে সত্যতর ছিল বলাই উচিত, যেহেতু স্কট বর্তমান কালকে অতিক্রম করিয়া যে ঐতিহাসিক কাল রহিয়াছে তাহাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন। তাঁহার উপন্যাসগুলি একাধারে এই প্রীতি ও জ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত। হরপ্রসাদ সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। তাঁহার রাজনৈতিক মত কি ছিল জানি না, জানিবার প্রয়োজনও অনুভব করি না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কেবল তাঁহার রসসাহিত্যের সাক্ষ্যের বলেই বলিতে পারি যে, দেশের প্রতি কেবল রাজনীতিকের বা অর্থনীতিকের দেশের প্রতি নয়, ব্যাপকতর ও গভীরতর অর্থে দেশের প্রতি তাঁহার অগাধ প্রেম ছিল, দেশের ঐতিহ্যের প্রতি অসীম আস্থা ও বিশ্বাস ছিল, এবং এসব স্মরণ করিয়া তিনি বিপুল গৌরব অনুভব করিতেন। তাঁহার রসসাহিত্য সেই গৌরবকে প্রকাশেরই চেষ্টা। যাহাকে গৌরবের মনে করিতেন তাহা সকলকে দেখাইতে চাহিয়াছেন। কাঞ্চনমালায় ভারতের গৌরবময় যুগকে দেখাইয়াছেন, বেনের মেয়েতে বাংলার গৌরবময় যুগকে দেখাইয়াছেন, আর বাল্মীকির জয়ে গৌরবময়ী পুরাণী প্রজ্ঞাকে, যাহাকে তিনি চিরন্তনী মনে করিতেন, দেখাইয়াছেন।

এ যুগের লেখকেরা দেশকে তেমন গভীরভাবে ভালোবাসেন কি? দেশ সম্বন্ধে তাঁহাদের ঔৎসুক্যে ও জ্ঞানে তেমন গভীরতা আছে কি? এমনকি দেশের সমস্যাকে তাঁহারা যেন বিদেশি চশমা দিয়াই দেখেন বলিয়া সন্দেহ হয়। তাঁহাদের রচনায় যে মর্মরশব্দটুকু শ্রুত হয় তাহা দেশের চিত্তকন্দর হইতে উত্থিত নয়, নিতান্তই সংবাদপত্র ও দলীয় বুলেটিনের আওয়াজ মাত্র। যথার্থ শিল্পধর্মচ্যুত এইসব রচনাকে 'সমাজচৈতন্য' নামের টীকা দিয়া পাঙ্‌ক্তেয় করিয়া লইবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু শিল্পধর্ম ও সমাজচৈতন্য তো পরস্পরবিরুদ্ধ নয়, একে অন্যের পোষক। দুইয়ে মিলিলে কি অপূর্ব সৃষ্টি হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত বেনের মেয়ে উপন্যাস। আধুনিকতম বিদেশি উপন্যাস যাঁহারা আগ্রহে লুফিয়া লন তাঁহারা একটু সময় করিয়া এই বইখানি পড়িলে উপকৃত হইবেন। হরপ্রসাদের মত লিখিবার শক্তি সর্বজনলভ্য নয়, কিন্তু তাঁহার মত দেশকে ভালোবাসিবার চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি? হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনা সেই চেষ্টার সহায় হইবে।

প্রমথ চৌধুরী

১৮৬৮-১৯৪৬

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে পুরাতন ও নবীন বাঙালি সাহিত্যিকদের মধ্যেকার যোগসূত্রটি ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। নিছক বয়সের কৌলীন্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও ভাবসূত্রে তিনি নবীন ও প্রবীণগণকে যুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রবীণ-তর আজিও যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহাদের সাহিত্যজীবন শেষ হইয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে। চৌধুরীমহাশয়ের কলম শেষ পর্যন্ত সবল ছিল। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে বয়ঃকৌলীন্যের কথা তুলিব না। যে ভাবসূত্রটি বাংলা সাহিত্যের দুই পুরুষের লেখকগণকে সংযুক্ত করিয়াছিল তাহার গ্রন্থি পড়িয়াছিল প্রমথ চৌধুরীর জীবনে।

পুরাতন ও নবীন বাঙালি লেখকদের মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, নবীনদের কলম ক্রমশ অধিক মাত্রায় বুদ্ধির বাহন হইয়া উঠিতেছে। সকলেই যে প্রখর মননশীল লেখক এমন কথা বলি না, কিন্তু হাওয়াটা বুদ্ধিবৃত্ত। বাংলা সাহিত্যের গাঙে আজ যে হাওয়া দিয়াছে সেটা বহিতেছে বুদ্ধির তীর হইতে। সেই বাতাসে ছোট বড় মাঝারি কত রকমের কত নৌকাই-না নোঙর খুলিয়া পাল তুলিয়া দিয়াছে। কতক নৌকা ধীরে চলিতেছে, কতক জোরে, কতক চলিতেছে লক্ষ্যের বিপরীতে, আবার বানচালের সংখ্যাও অল্প নয়। পুরাতন বঙ্গসাহিত্যের হাওয়াটা ছিল ভাবাবেগের উপকূল হইতে ছুটিয়া-আসা। নবীন হাওয়াকে যদি বলি বুদ্ধি-প্রসূত, প্রবীণ কালের হাওয়াকে বলা যায় বোধপ্রসূত। অবশ্য এই দুই কালকে আচ্ছন্ন করিয়া সর্বকালপতি রবীন্দ্রনাথ আছেন। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথকে প্রসঙ্গক্রমেও আনিয়া ফেলিলে তাঁহাকে লইয়াই আলোচনা করিতে হয়।

প্রবীণ সাহিত্যের আরও একটি সুবিধা ছিল। সেখানে যখন বুদ্ধির হাওয়া বহিত তখন ক্ষেত্রবিশেষে বহিত, অন্য ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ সে কদাচিৎ করিত। যেমন, বলা যাইতে পারে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে, আর প্রবন্ধাবলীতে ও কৃষ্ণচরিত্রে হাওয়া এক নয়। তাঁহার উপন্যাস বোধপ্রসূত, আর শেষোক্ত গ্রন্থগুলি বুদ্ধিপ্রসূত। কিন্তু সাধারণ লক্ষণ হিসাবে নবীন সাহিত্যকে মোটের উপরে বুদ্ধিপ্রসূত বলা যাইতে পারে। আধুনিক উপন্যাস ও গল্প, প্রবন্ধ ও নাটক, এমনকি কবিতা, বিশেষত গদ্যকবিতা, সমস্তই বুদ্ধির ভূমি হইতে উদ্ভূত। বরঞ্চ যাঁহাদের রচনায়

ই রসের কিছু কমতি, বর্তমান সাহিত্যিকসমাজে তাহারা অকুলীন। ইহা ভালো মন্দ সে আলোচনা নিরর্থক। ইহাই যুগধর্ম এবং খুব সম্ভব, জগতের যুগধর্ম। বং যুগধর্মের প্রভাবে এ পরিবর্তন বাংলা সাহিত্যেও অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিতেছিল, মথ চৌধুরীর কলম এবং তৎসম্পাদিত সবুজ পত্রের প্রকাশ তাহাতে বিশেষ ায্য করিয়াছে। সবুজ পত্র নবীন ও প্রবীণ বাংলা সাহিত্যের সংযোগসীমা, ন বঙ্গদর্শন ছিল আর-এক যুগসন্ধির সীমা।

যুগধর্মের সমস্ত বিক্ষিপ্ত রশ্মিকে আপন প্রতিভার দ্বারা সংহত করিয়া সবুজ ার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের পুরাতন ইন্ধনে প্রমথ চৌধুরী নূতন অগ্নিসংযোগ রিয়াছিলেন। এই কার্যে রবীন্দ্রনাথকে তিনি সহায়রূপে পাইয়াছিলেন। এই ন যজ্ঞবেদীতলে নবীন সাহিত্যিকগণ আসিয়া সমবেত হইলেন, এই নূতন বহ্নির থাতেই তাঁহারা দীপ প্রজ্বলিত করিয়া লইলেন। এত বড় যুগলক্ষণাক্রান্ত পার ঘটানো সামান্য প্রতিভার লক্ষণ নয়। ইহা যে তাঁহার পক্ষে সম্ভব য়াছিল তাহার প্রধান কারণ, প্রমথ চৌধুরী ছিলেন স্বভাবত বুদ্ধিবৃত্ত লেখক। লার নব্যন্যায়স্রষ্টাদের তিনি আধুনিকতম্ সাহিত্যিক বংশধর।

২

সবুজ পত্র সম্পাদনার আনুষঙ্গিকভাবে প্রমথ চৌধুরীর আর একটি সাহিত্যিক তিকে বিচার করা উচিত। বাংলা সাহিত্যে মৌখিক স্টাইল নামে ভাষার টি রীতি বিরাজমান। এই স্টাইলের প্রথম স্রষ্টা কে, সে ঐতিহাসিক বিচারের য প্রবেশ না করিয়াও নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ই এই ইলকে সাহিত্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দিয়া গিয়াছেন। সবুজপত্রই এই স্টাইলের ম ও অসন্দিগ্ধ বাহন। প্রধানত সবুজ পত্রের প্রভাবেই এই স্টাইল এত শীঘ্র লা সাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সবুজ পত্র প্রকাশিত না লে ভাষার মৌখিক রীতি বাংলা সাহিত্যে কখনোই গ্রাহ্য হইত না, এ কথা চলে না। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য এই যে, সবুজ পত্র প্রকাশিত হইবার ফলেই রীতির ঐ সময়ে প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভব হইয়াছিল। যুগমাহাত্ম্যে বাঙালি লেখক চিত্ত ভাষায় একটি নূতন রূপ সন্ধান করিতেছিল, যে-রূপের মধ্যে যুগোচিত লঘুসংশয় ও বুদ্ধির দীপ্তি বিরাজমান। মৌখিক স্টাইল অনেক পরিমাণে

ঐ দাবি মিটাইতে সক্ষম হইয়াছিল। অবশ্য যুগোচিত গদ্যের সমস্ত দাবি যে উক্ত মৌখিক স্টাইল মিটাইতে সমর্থ হইয়াছে এ কথা বলা চলে না। কিন্তু যতটুকু হইয়াছে প্রধানত তাহার কৃতিত্ব সবুজ পত্র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর প্রাপ্য মৌখিক স্টাইলকে প্রতিষ্ঠাদান এবং সবুজ পত্র সম্পাদনা, এ দুইকে একত্র করিয় দেখিতে হইবে; কারণ একটি আর-একটির বাহন, যথাসময়ে বাহন না পাইলে বাহিত সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ ও মর্যাদালাভ করিত কিনা সন্দেহ। এই কারণেই দুই কীর্তিকে আমরা একত্র উল্লেখ করিলাম। সবুজ পত্র বাঙালির যে মনোবৃত্তির সূচক, মৌখিক স্টাইলও বাংলা ভাষার সেই মনোভাবেরই সূচক, কাজেই দুইয়ে মিলিয়া এক।

অনেকে সাহিত্যে মৌখিক ভাষার প্রতিষ্ঠার প্রথম কৃতিত্ব আলালের ঘরে দুলালের লেখককে ও হুতোম প্যাঁচার নকশার লেখককে দিতে প্রস্তুত, প্রথম কৃতিত্ব প্রথম চৌধুরীকে দিতে তাঁহারা রাজি নহেন। আমার মনে হয় তাঁহাদের দাবি যুক্তিসম্মত নয়। মৌখিক ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা এক নয়। আলাল ও হুতোম প্যাঁচার নকশা বিশেষ আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত, তাহাদের ভাষাকে মৌখিক ভাষা বলা উচিত নয়। সাহিত্যের মৌখিক ভাষা সাহিত্যের লৈখিক ভাষার মতই দেশব্যাপী পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক, আঞ্চলিক ভাষা সে দাবি করিতে পারে না। বাংলা ভাষার লেখক বাংলাদেশের যে অঞ্চলেরই অধিবাসী হোক না কেন সে একটি সর্বজনবোধগম্য লৈখিক ভাষাতে লিখিয়া থাকে; আবার বাংলা ভাষার লেখক বাংলাদেশের যে অঞ্চলেরই অধিবাসী হোক না কেন, একটি সর্বজনবোধগম্য মৌখিক ভাষাতে লিখিতে পারে। এদিক দিয়া বিচার করিলে সাহিত্যের লৈখিক ভাষা ও মৌখিক ভাষা দুইই সমানভাবে লেখকের হাতে গড়া, ইচ্ছা করিলে ও অর্থে কৃত্রিম শব্দটির ব্যবহার করা যাইতে পারে। আঞ্চলিক ভাষা সে অর্থে কৃত্রিম নহে, কিন্তু তাহা সর্বজনবোধগম্য নহে, তাহার প্রভাব বিশেষ ক্ষেত্রেই আবদ্ধ।

তবে মৌখিক ভাষার বিশেষ আঞ্চলিক ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধা নাই, কিন্তু দেখিতে হইবে যে তাহা যেন কলমের গুণে আপন আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করিয়া যায়। প্রমথ চৌধুরী যে মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যিক পদবী দান করিয়াছেন, তাহার ভিত্তি কৃষ্ণনগরের শিক্ষিত জনসমাজের ভাষা। এ সত্য একাধিকবার স্বীকার করিয়াছেন। কৃষ্ণনগর ও তাহার ভাষা বহুকাল হইতে শি বাংলার শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্র। কলিকাতার আগে কৃষ্ণনগরই ছিল বাংলার সংস্কৃতি ক্ষেত্র। সৌভাগ্যবশত প্রমথ চৌধুরী অল্প বয়সে সেখানে গিয়া পড়িয়াছিলেন, আ

নই সঙ্গে কৃষ্ণনগরের ভাষাকে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন, তার পরে যখন সুযোগ । তাগিদ আসিল সর্বজনীনতার উপাদান মিশ্রিত সেই ভাষা অনায়াসেই তাঁহার ালমের গুণে সাহিত্যিক মৌখিক ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া গেল। বহুদিন হইতে হুজনের যাতায়াতে যাহা বিশেষ আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে উঠিয়াছিল তাহারই আশ্রয় 'ইল বলিয়া প্রমথ চৌধুরীর মৌখিক ভাষাতেও সর্বজনবোধগম্যতাগুণ বর্তিল। ·ইখানে আলাল ও হুতোমের উপরে তাঁহাব ভাষার জিত।

মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যিক পদবী দান করিযা বীরবল সাহিত্যকে সর্বজনের 'ক্ষে সুগম করিয়া দিযাছেন। আধুনিক যুগ ও আধুনিক সাহিত্য মহৎ এককের ালার ক্ষেত্র নয়, তাহা বহুতর ক্ষুদ্রের কর্মব্যস্ততার ডালহোসি স্কোয়ার। অর্থাৎ গ ও সাহিত্য দুইই গণধর্মী হইয়া পড়িয়াছে। এ সত্যটা প্রমথ চৌধুরী ভালো 'রিয়াই বুঝিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন—

> প্রথমেই চোখে পড়ে যে, এই নবসাহিত্য রাজধর্ম ত্যাগ করে গণধর্ম অবলম্বন করছে। অতীতে অন্য দেশের ন্যায় এ দেশের সাহিত্যজগৎ যখন দু-চারজন লোকেব দখলে ছিল, যখন লেখা দূরে থাক্ পড়বার অধিকারও সকলের ছিল না, তখন সাহিত্যরাজ্যে রাজা সামন্ত প্রভৃতি বিরাজ করতেন। এবং তাঁরা কাব্য দর্শন ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে, মন্দির অট্টালিকা স্তূপ স্তম্ভ গুহা প্রভৃতি আকারে বহু চিরস্থায়ী কীর্তি রেখে গেছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে আমাদের দ্বারা কোনোরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড করে তোলা অসম্ভব এই জ্ঞানটুকু জন্মালে আমাদের কারও আর সাহিত্যে রাজা হবার লোভ থাকবে না এবং শব্দের কীর্তিস্তম্ভ গড়বার বৃথা চেষ্টায় আমরা দিন ও শরীর পাত করব না। এর জন্য আমাদের কোনোরূপ দুঃখ করবার আবশ্যক নেই। বস্তুজগতের ন্যায় সাহিত্যজগতেরও প্রাচীন কীর্তিগুলি দূর থেকে দেখতে ভালো, কিন্তু নিত্য-ব্যবহার্য নয়। —বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ

আবার—

> অর্থাৎ ভবিষ্যতে কাব্যদর্শনাদি আর গাছের মত উঁচুর দিকে ঠেলে উঠবে না, ঘাসের মত চারিদিকে চারিয়ে যাবে। এক কথায়, বহুশক্তিশালী স্বল্প-সংখ্যক লেখকের দিন চলে গিয়ে স্বল্পশক্তিশালী বহুসংখ্যক লেখকের দিন আসছে। আমাদের মনোজগতে যে নব সূর্য উদয়োন্মুখ তার সহস্র রশ্মি অবলম্বন করে অন্তত ষষ্টিসহস্র বালখিল্য লেখক এই ভূভারতে অবতীর্ণ হবেন।
>
> —তদেব

উদ্ধৃত অংশ দুটি সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্বে লিখিত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে তখনই প্রমথ চৌধুরী আমাদের সাহিত্যের বর্তমান অবস্থাকে যেন দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্য আজ স্বল্পশক্তিশালী বহুসংখ্যক লেখকের, কি বলিব, লীলার ক্ষেত্র বলা উচিত হইবে না, বলা উচিত নিত্যব্যবহার্য বস্তু—ও নিত্যব্যবহার্য শব্দটাও প্রমথ চৌধুরী কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহার মতে আধুনিক সাহিত্য আর কীর্তির তাজমহল বা কুতবমিনার নহে; কখনো কখনো তাহা স্কাইস্ক্রেপার রূপে দেখা দিলেও তাহা নিত্যব্যবহার্যতার অতীত নহে। এই সত্যটি প্রমথ চৌধুরী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার মৌখিক ভাষার প্রধান গুণ নিত্যব্যবহার্যতা। তাঁহার ভাষা নব্য-সাহিত্যধর্মের সহিত সমগুণসম্প আধুনিক সাহিত্যিকদের উপরে তাঁহার প্রভাবের রহস্য এইখানে।

৩

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের গদ্যপদ্য প্রবন্ধনিবন্ধ এবং কবিতা, সমস্ত রচনা প্রধানত বুদ্ধিবৃত্তিসমুদ্ভূত। অন্যান্য বাঙালি গল্পলেখকদের সঙ্গে এইখানেই তাঁহা বিশিষ্ট প্রভেদ। এই কারণে তাঁহার গল্পগুলি অনেকটা প্রবন্ধাত্মক হইয়া উঠিয়াছে ইহাই তাঁহার গল্পের টেকনিক। তাঁহার কলমে প্রবন্ধের গল্প হইয়া উঠিতে এব গল্পের প্রবন্ধে পরিণত হইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। অনেক সময়ে প্রথ দৃষ্টিতে পাঠক ঠাহর করিয়া উঠিতে পারে না, রচনাটি কি, গল্প না প্রবন্ধ। রচনা এই বৈজাত্যরীতিতে আর Pun বা শ্লেষের ব্যবহারে ধর্মরসিক চেস্টার্টন তাঁহা গুরু। চেস্টার্টনের গল্প ও প্রবন্ধ এক ছাঁচে ঢালা। ইহাদের দুজনেরই সংবেদ পাঠকের বুদ্ধিতে।

কিন্তু চৌধুরীমহাশয়ের উপরে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বোধকরি রায়গুণাক ভারতচন্দ্রের। বাল্যকালে বহুদিন কৃষ্ণনগরে বাস করিবার ফলে চৌধুরীমহাশ নিজেকে কৃষ্ণনাগরিক বলিতেন। কৃষ্ণনগরের ভাষা ও ভারতচন্দ্রের কাব্য তাঁহা বুদ্ধিবৃত্ত স্বভাবকে দিগ্‌দর্শন করাইয়াছিল; কারণ প্রাচীন বাংলা কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্র নিজেও বুদ্ধিবৃত্ত লেখক ছিলেন। এ কথা একরকম নিশ্চয় করিয়া বল যায় যে, চৌধুরীমহাশয় ভারতচন্দ্রের যুগে জন্মিলে রায়গুণাকরের গোষ্ঠীর কবি হইতেন, আবার ভারতচন্দ্র বর্তমান যুগে জন্মিলে সবুজপত্রের লেখকরূপে সাহিত্যে অমরকীর্তি স্থাপন করিয়া যাইতেন।

ভারতচন্দ্রের পরেই উল্লেখ করা যাইতে পারে ফরাসি গদ্যসাহিত্যের প্রভাব। ফরাসি গদ্যসাহিত্যের প্রাঞ্জলতা, স্বচ্ছতা, বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণতা প্রমথ চৌধুরী অনেক পরিমাণে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন। লঘুচালের ভাষায়, বুদ্ধিদীপ্ত স্টাইলে এবং শ্লেষ ও যমকের ব্যবহারে তিনি যে প্রবন্ধসাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন বাংলা ভাষায় তাহা অভিনব। ঐ গুণগুলি তাঁহার প্রকৃতিদত্ত। তবে ফরাসি গদ্যের সহিত পরিচিত না হইলে তাঁহার গদ্যরচনা এমন মার্জিত হইয়া উঠিত কি না সন্দেহ। ফলত দাঁড়াইতেছে এই যে, ভারতচন্দ্রের কাব্য ও ফরাসি গদ্যের প্রভাবে তাঁহার প্রতিভা পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়াছিল। তিনি জীবনে বিংশ শতাব্দীর লোক হইলেও ভাবজীবনে অষ্টাদশ শতকের অধিবাসী ছিলেন। ইউরোপের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতক বলিতে ভাবের একটি বিশিষ্ট রূপ বোঝায়। হৃদয়াবেগনির্মুক্ত বুদ্ধির স্বচ্ছ শুভ্র স্ফটিকের মাধ্যমে ভল্‌টেয়ার সুইফট্‌ পোপ প্রভৃতি অষ্টাদশ শতকের প্রধান লেখকেরা জীবনকে দেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন। আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে যদিচ ইউরোপের তৎকালীন ইতিহাসের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না, তথাপি কি গূঢ় কার্যকারণের ইঙ্গিতে ভারতচন্দ্রও সেই ইউরোপীয় দৃষ্টির অধিকার যেন লাভ করিয়াছিলেন।

৪

প্রমথ চৌধুরীর প্রধান কীর্তি সবুজ পত্র সম্পাদনা; তাহার কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। সবুজ পত্র সম্পাদনা বলিতে শুধু একখানা কাগজ চালানো বোঝায় না, সমভাব ও সম-আদর্শে বিশ্বাসী একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গঠন করিয়া সাহিত্যের ইতিহাসকে নূতন দিগ্‌দর্শন দান বোঝায়। এইজাতীয় কাজকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের কর্মকাণ্ড বলিয়াছেন। এ কাজের জন্য বিশেষ একটি শক্তির প্রয়োজন এবং সে শক্তি খুব সুলভ নয়। আর এই কাজ যিনি সুষ্ঠুভাবে করিতে পারেন তিনি সাহিত্যের একটি মহদুপকার সাধন করেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রধান স্রষ্টা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর এই গুণটি ছিল। এই গুণ যোগে বহু লোকের সমবায় ঘটাইয়া তিনি সাহিত্য-পরিষৎ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রে এই শক্তি প্রচুর পরিমাণে ছিল—যাহার বিকাশ দেখিতে পাই সমভাবাপন্ন একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গঠন করিয়া বঙ্গদর্শন-চালনায়। এই দুটি ঘটনাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দুটি পতাকা-স্থান। প্রাচীনতর কালে উইলিয়ম

কেরিতে এই গোষ্ঠীশক্তির বিকাশ দেখিতে পাই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সমভাবাপন্ন পণ্ডিতগণকে সমসূত্রে স্থাপন করিয়া তিনি বাংলা গদ্যরচনার সূত্রপাত করিয়া দিয়াছিলেন। এগুলি বাংলা সাহিত্যের মহৎ ঘটনা। সবুজ পত্র সম্পাদনাও তেমনি একটি মহৎ ঘটনা, নূতন সম্ভাবনায় ও নূতন সংকেতে পূর্ণ যুগলক্ষণাক্রান্ত একটি ব্যাপার। এই ব্যাপার যাঁহার নেতৃত্বে ঘটিয়াছিল, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার আসন চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সাহিত্যরচনার গৌরবের অপেক্ষা সাহিত্যঘটনার গৌরব লঘুতর নয়, অনেক সময়েই গুরুতর। এই গৌরবের আসনে বাংলা গদ্যের ঘটয়িতা উইলিয়ম কেরি, বঙ্গদর্শন-সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-প্রতিষ্ঠাতা রামেন্দ্রসুন্দরকে সবুজ পত্র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী সঙ্গীরূপে পাইবেন, এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সতীর্থগণের সান্নিধ্যে অমর হইয়া বিরাজ করিতে থাকিবেন।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৭০-১৮৯৯

যে কয়জন প্রতিভাশালী বাঙালি সাহিত্যিক স্বল্পস্থায়ী জীবনে সাহিত্যলীলা সমাপ্ত করিয়া অকালে মৃত্যুর রহস্যময় দিগন্তে অস্তমিত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সতীশচন্দ্র রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে। সত্যেন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া দিলে ইহাদের কাহারও রচনার পরিমাণ খুব বেশি নহে। এইসব মুষ্টিমেয় রচনায় প্রতিভার নিঃসন্দিগ্ধ ছাপ আছে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি করিয়া আছে প্রতিভার পূর্ণতর দীপ্তির আভাস। ইহাদের রচনা পাঠককে যেমন আনন্দ দেয়, তেমনি অসম্পূর্ণতার মধ্য দিয়া তাহার মনে আগ্রহ জাগাইয়া দেয়। যাহা হইয়াছে তাহারই পটে যাহা হইতে পারিত পাঠকের চিত্তকে আন্দোলিত করিতে থাকে। এ রকম ক্ষেত্রে ইহাদের রচনার সমালোচনা অনেক পরিমাণে সম্ভাবনার ইতিহাস হইতে বাধ্য।

এই সাহিত্যিক-চতুষ্টয়ের মধ্যে সতীশচন্দ্র সবচেয়ে অল্প বয়সে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স একুশ বৎসরের অধিক হয় নাই।

একুশ বৎসরের যুবককে বালক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; অধিকাংশ বাঙালি যুবক এই বয়সে কলেজের ছাত্র। অথচ সতীশচন্দ্রের গদ্য ও পদ্য প্রতিভার দীপ্তিতে ভাস্বর। ঘূর্ণমান নীহারিকার ভাস্বরতা, প্রচণ্ড বেগ ও অস্থায়িত্ব তাঁহার রচনায় বিদ্যমান। বয়ঃপরিণতির সঙ্গে-সঙ্গে এই নীহারিকামণ্ডল সংহত হইয়া স্থায়ী নক্ষত্রপুঞ্জের সৃষ্টি করিতে পারিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিয়া ওঠে নাই। তবে এটুকু নিশ্চিত বুঝিতে পারা যায়, সতীশচন্দ্র মূলত কবি ছিলেন। কবিদৃষ্টির উদারতা ও গভীরতা, কাব্যের সৌন্দর্যসন্ধ নেত্র, কবিসুলভ রসপিপাসা তাঁহার রচনায় প্রত্যক্ষ। জীবনপরিণামলাভের সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিলে তিনি বাংলা-দেশের একজন মহৎ কবি হইতেন বলিয়া বিশ্বাস। আর, গদ্যরচনা যতই তিনি লিখুন-না কেন, সকলের উপরেই মহৎ কবির মুদ্রা অঙ্কিত থাকিত।

অজিতকুমার বত্রিশ বৎসর বয়সে মারা যান। এই বয়সে শক্তির দিক্‌নির্ণয় ঘটিয়া যায়, কিন্তু শক্তি তাহার পূর্ণলক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে না। এই দিক্‌নির্ণয়ের সূত্র ধরিয়া বলা যায় যে, অজিতকুমারের বিশ্লেষপ্রবণ চিত্ত উত্তরোত্তর সমালোচনার পথেই চলিত। তাঁহার সব রচনাই বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা। তাঁহার রচিত

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন-চরিত বাংলাদেশে তৎকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমালোচনা ছাড়া আর কিছু নয়। এই পুস্তকখানি সমালোচনার চৌখুপি গ্রাফপেপার। ইহারই খোপে খোপে দেবেন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তিনি বসাইয়া দিয়াছেন। খণ্ডকে সংহত করিয়া জীবনচরিত-রচনার বস্‌ওয়েলি পন্থা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নহে। অজিতকুমারের পরিণত রচনা প্রধানত হইত আলোচনা ও সমালোচনাত্মক প্রবন্ধ। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিলে বাংলাদেশের মহৎ সমালোচক হইতে পারিতেন। রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া দিলে মহত্তম সমালোচক হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুকালে বয়স হইয়াছিল চল্লিশ। এই বয়সে প্রতিভার দিক্-নির্ণয় ও পরিণতি দুইই ঘটিয়া যায়। সত্যেন্দ্রনাথ মূলত কবি। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত কবিজীবন একরূপ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল বলিলেও চলে। তাঁহার শ্রেষ্ঠ কয়টি কবিতা ফুলের ফসল এবং কুহু ও কেকায় সঞ্চিত। এ দুইখানি কাব্য, রবীন্দ্রকাব্যের বাহিরে যে কয়খানি উচ্চাঙ্গের বাংলা কাব্য আছে তাহাদের অন্যতম। তাঁহার চাবাক ও মঞ্জুভাষা বাংলাসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। তাঁহার পরবর্তী বহু কবিতাই বিচিত্র ছন্দের পরীক্ষাক্ষেত্র বলা চলে। শতদলবাসিনী সরস্বতী ফুলের ফসল এবং কুহু ও কেকার যুগ্ম পদ্ম হইতে চরণযুগল নামাইয়া পরবর্তী সব কাব্যে তারের উপর দিয়া হাঁটিবার লীলাকৌশল দেখাইতে বাধ্য হইয়াছেন। এই ছন্দের কসরত-প্রদর্শনে কবি বিরক্ত হইয়া পড়িলে কি করিতেন? কোন্ জাতীয় রচনায় আত্মনিবেশ করিতেন? ছন্দসরস্বতীতে সমালোচনার সংহতি বা প্রত্যক্ষগতি নাই। ভাষায় প্রসাধনকলা ও ভাবের অতিব্যাপ্তি ইহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া দিয়াছে। ডঙ্কানিশান রচনা পড়িয়া মনে হয়, সত্যেন্দ্রনাথ প্রাচীনকালের পটে উপন্যাসরচনায় কলম চালনা করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেন। তাঁহার প্রধান অন্তরায় অতিব্যাপ্তি উপন্যাসকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিত না—যদিচ তাহা তাঁহার কবিতাগুলিকে, বিশেষ ব্যঙ্গকবিতাকে, শরবৎ ঋজুগতি হইতে ভ্রষ্ট করিয়া অনেক স্থলে লক্ষ্যহীন ঊর্ধ্বাকাশের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় অন্তরায় তাঁহার পাণ্ডিত্য। মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য তাঁহাদের কণ্ঠে পুষ্পমাল্যের মত, তাহাতে শোভাবর্ধন করিয়াছে কিন্তু রচনাকে ভারগ্রস্ত করে নাই। সত্যেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য তাঁহার শেষজীবনের রচনার ঘাড়ে আড়াই-মনি তোয়ঙের মত চাপিয়া বসিয়াছে। ছন্দের ভাঁজে ভাঁজে বাহকের আর্তধ্বনি শ্রুত হইতে থাকে।

বলেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুর বয়স মাত্র উনত্রিশ। সতীশচন্দ্রকে বাদ দিলে, এই চতুষ্টয়ের মধ্যে তিনি সবচেয়ে অল্প বয়সে মারা গেলেও সাহিত্যিক সম্ভাবনাতে তিনি বোধ করি সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

২

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র ও রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি বাল্যকালে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। সেখানে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিবার পর হেয়ার স্কুলে চলিয়া যান এবং হেয়ার স্কুল হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অল্প বয়সেই তাঁহার সাহিত্যানুরাগ প্রকাশ পায় এবং তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে জোড়াসাঁকোর বাড়ি হইতে প্রকাশিত বালক নামে পত্রে তিনি লিখিতেন। পরে সাধনা পত্রিকার নিয়মিত লেখক হইয়া ওঠেন। পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের চালনায় ও প্রভাবে তাঁহার সাহিত্যজীবন গড়িয়া ওঠে।

কিন্তু সাহিত্যসাধনাই বলেন্দ্রনাথের জীবনের একমাত্র বিষয় ছিল না। তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়দান উপলক্ষে ঋতেন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

> ইহার পরে তিনি বাণিজ্যব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। এ বিষয়েও তাঁহার প্রবল কল্পনা ছিল; একটা কিছু মস্ত ব্যাপার করিয়া তুলিব এই আশা তাঁহার মনে অহরহ জাগ্রত ছিল। স্বদেশিবস্ত্রের কারবারে তিনি প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। রবীন্দ্রনাথও পরে যোগদান করেন। বলেন্দ্রনাথের যত্নেই প্রথম স্বদেশি ভাণ্ডার আদির একরূপ সূত্রপাত হয় বলা যায়। তিনি জীবনের শেষ-ভাগে আর্যসমাজ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কিসে আর্যসমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজের মিলন ও একতা সাধিত হয় তাহার জন্য তাঁহার মনের একাগ্রতা। তিনি নিজে লাহোরে গিয়া পাঞ্জাবি আর্যসমাজীদিগের মধ্যে থাকিয়া এই কায করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

বলেন্দ্রনাথের বিবাহ হয় ১৩০২ (১৮৯৩) সালের ২২এ মাঘ। বলেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান ছিলেন।

ইহাই সংক্ষেপে বলেন্দ্রনাথের বাস্তব জীবন। তাঁহার মানসজীবনের পরিচয় বহন করিতেছে তাঁহার রচনাগুলি।

বলেন্দ্রনাথের রচনার পরিমাণ বড় অল্প নহে। গদ্য ও পদ্য দুই শ্রেণীর রচনাই তিনি লিখিয়াছেন। গদ্যের ভাগই বেশি। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলীর ডিমাই আকারের পুস্তকের গদ্যাংশ ৬৯২ পৃষ্ঠা। মাধবিকা (১৮৯৬) ও শ্রাবণী (১৮৯৭) নামে দুখানি কাব্যগ্রন্থও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, অধিকাংশই প্রেমের কবিতা। বর্তমান প্রবন্ধে গদ্যরচনাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনার বহুলতার চেয়েও অধিকতর উল্লেখযোগ্য তাহার বিষয়-বৈচিত্র্য। স্বল্পস্থায়ী সাহিত্যজীবনে নানা শ্রেণীর রচনা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। সমালোচনাজাতীয় রচনাই বেশি, সমালোচনারও আবার কত রকম উপশ্রেণী। সাহিত্যসমালোচনার অন্তর্গত সংস্কৃত ও বাংলা কাব্যের আলোচনা আছে। চিত্র-সমালোচনা আছে। সামাজিক প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। দেশীয় আচার-ব্যবহার-বিষয়ক প্রবন্ধও রহিয়াছে। দেবস্থান পীঠস্থান প্রভৃতিও তাঁহার মনোযোগ অকর্ষণ করিয়াছে। ইহা ছাড়া আর এক শ্রেণীর প্রবন্ধ আছে, যাহাকে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা 'পার্সন্যাল এসে' নাম দেওয়া যাইতে পারে। ইহাদের সংখ্যা অল্প নয়। আর আছে কতকগুলি নিছক প্রকৃতিবর্ণনা। ন্যারেশন বা কথাভাসপূর্ণ রচনারও অভাব নাই। গ্রন্থাবলীখানিতে ভালো-মন্দ পরিণত-অপরিণত সব জাতের রচনা একত্র ঠাসিয়া ভর্তি করিয়া রাখা হইয়াছে। অনিয়ন্ত্রিত ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে বাংলা সাহিত্যের অনেক শ্রেষ্ঠ রচনা সমাহিত হইয়া পড়িয়া আছে, বাঙালি পাঠকের পক্ষে না তাহা গৌরবজনক, না তাহা লাভজনক। অবিলম্বে বলেন্দ্রনাথের রচনার একখানি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া উচিত।

৩

বলেন্দ্রনাথের স্বকীয় প্রতিভার বিশিষ্ট স্বরূপটি কি? যেসমস্ত রচনা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার অধিকাংশই সমালোচনাজাতীয়। অজিতকুমারের অধিকাংশ রচনাও সমালোচনাশ্রেণীর। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। অজিতকুমারের সমালোচক-দৃষ্টি অখণ্ডকে ভাঙিয়া সত্যকে দেখিতে চাহিয়াছে, বলেন্দ্রনাথের সমালোচক-দৃষ্টি খণ্ডকে জুড়িয়া সৌন্দর্য দেখিতে চাহিয়াছে। এক-জনের দৃষ্টি সত্যসন্ধ, অপরের সৌন্দর্যসন্ধ। অজিতকুমারের কাছে সমালোচনা বিজ্ঞান, বলেন্দ্রনাথের কাছে সমালোচনা কলা; অজিতকুমার সমালোচনায় বৈজ্ঞানিক, বলেন্দ্রনাথ সমালোচনায় শিল্পী; একজনের কাছে সমালোচনা তত্ত্ব

ছাড়া আর কিছু নয়, অপরের কাছে তাহা সৃষ্টিকার্য। বলেন্দ্রনাথের মন মূলত কবির মন। কবির মনের কাছে জগৎ এবং সাহিত্য শিল্প ও চিত্রাদি অর্থাৎ প্রকৃতির সৃষ্টি ও মানুষের সৃষ্টি একই রূপ, একই সৌন্দর্যময় সত্তা উদ্ঘাটিত করিয়াছে। তিনি সৌন্দর্য ভোগ করিয়াছেন, এবং অপরের চোখে আঙুল দিয়া, কখনো বা তাহার উত্তরীয়প্রান্ত টানিয়া তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাহাকে সেই সৌন্দর্য দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার কবিমন অখণ্ডকে খণ্ডিত করিতে, সৌন্দর্য নিঙড়াইয়া তত্ত্ব বাহির করিতে অত্যন্ত পীড়া বোধ করে। সৌন্দর্য জগৎ ব্যাপারের পরিণাম ও পরা নিয়ম, ইহাই যেন তাঁহার ধারণা। সৌন্দর্যে বিশ্বরূপ-দর্শনই মানবজীবনের মহৎ কর্তব্য, ইহাই যেন তিনি বলিতে চাহেন। সৌন্দর্য-দর্শনের ও সৌন্দর্যভোগের এমন কীট্সীয় দৃষ্টি ও মন লইয়া আর কোনো বাঙালি লেখক জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইহাই বলেন্দ্রনাথের প্রতিভার একাধারে বৈশিষ্ট্য এবং সীমা।

এই বিশিষ্ট গুণকে দুইটি সাহিত্যিক প্রভাব বলবত্তর করিয়াছিল: সংস্কৃত সাহিত্য এবং রবীন্দ্রসাহিত্য। বলেন্দ্রনাথের রচনায় সংস্কৃতজ্ঞানের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা প্রধানত কালিদাস ও কাদম্বরী হইতে প্রাপ্ত। কালিদাসের সৌন্দর্যানুরাগ এবং বাণভট্টের সুন্দর চিত্রাঙ্কনস্পৃহা বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যরস প্রবণ প্রতিভাকে শক্তিশালী করিয়াছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রভাবও তাহার উপরে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া করিয়াছে। বলেন্দ্রনাথের প্রতিভাবিকাশের সময় আর মৃত্যুর সময় ভিন্ন নয়, এই সময়টা রবীন্দ্রনাথের কল্পনা কাব্য ও প্রাচীন সাহিত্যর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশের কাল। কল্পনা নির্বাসিত সৌন্দর্যের কাব্য, প্রাচীন সাহিত্যে কালিদাস-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি সমালোচনার সৃষ্টিকার্য। আব আগেই বলিয়াছি যে, সৌন্দর্যদর্শন ও সমালোচনার সৃষ্টিকার্য বলেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট গুণ। এ দুইও আবার ভিন্ন নয়; মানুষের সৃষ্টি ও প্রকৃতির সৃষ্টির মধ্যে অখণ্ডরূপের সন্ধান, যাহার অপর নাম সৌন্দর্যসন্ধান, ইহাই বলেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা। রবীন্দ্র সাহিত্যের এই বিশিষ্ট পর্বটা পরিণত বলেন্দ্রনাথের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়া তাঁহাকে বলশালী হইতে সাহায্য করিয়াছে।

স্বকীয় বিশিষ্ট গুণের অনুরূপ গুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া মানবজীবনের একটা বিশেষ সৌভাগ্য। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রভাব-বৈষম্যের ফলে মানুষের জীবন খণ্ডিত ও বিকৃত হইয়া পড়ে। মিল্টনের স্বাভাবিক সৌন্দর্যরস-

প্রবণ চিত্ত পিউরিটান ফিলজফির মরুভূমি অতিক্রম করিতে গিয়া কি দুঃখভোগই-না করিয়াছে। খণ্ডিত প্রতিভা মহৎ সার্থকতা লাভের প্রধান অন্তরায়। বলেন্দ্রনাথের প্রতিভা যে শ্রেণীরই হোক, এই দুর্ভাগ্য হইতে অন্তত তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন।

তাঁহার সৌন্দর্যদর্শনরূপ মূলশক্তি সংস্কৃত কাব্যের ও রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ সৌন্দর্যবাদ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে অল্পবয়সে তাঁহার শক্তি অনেক পরিমাণে পরিণতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এবং পদে পদে তাঁহাকে নিজের সহিত লড়াই করিতে হয় নাই বলিয়া তাঁহার রচনার পরিমাণও সমধিক হইতে পারিয়াছিল।

আবার এই স্বভাবজ সৌন্দর্যপিপাসা ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবের সঙ্গেই তাঁহার স্টাইলের ও ভাষার সমস্যা জড়িত। যথার্থ সৌন্দর্যরস-প্রবণতা মানুষকে সংযম শালীনতা ও আধ্যাত্মিক আভিজাত্য দান করে। এইগুলি তাঁহার ভাষা ও স্টাইলের গুণ। আবার কাদম্বরী ও কালিদাসের প্রভাবও একই সঙ্গে তাঁহার রচনায় বিদ্যমান। বর্ণাঢ্য শব্দাঢ্য ভাষা, উপমা-ও অলংকার-বহুল স্টাইল তাঁহার বৈশিষ্ট্য, এগুলির জন্য তিনি প্রধানত সংস্কৃত সাহিত্যের নিকট ঋণী। বলেন্দ্রনাথের রচনা পাঠ করিলে একটি আধ্যাত্মিক আভিজাত্যের পরিচয় পাঠকের মনে ছাপ রাখিয়া যায়। এই আধ্যাত্মিক আভিজাত্য লেখকের অন্তর্নিহিত বিশিষ্ট প্রতিভার প্রকাশ বাহরূপ ছাড়া আর কিছু নয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, বলেন্দ্রনাথের রচনার আলোচনা কতক পরিমাণে সম্ভাবনার আলোচনা হইতে বাধ্য। জীবনের স্বাভাবিক দীর্ঘতা পাইলে তাঁহার রচনার কি পরিণাম ঘটিত? তাঁহার পরিণত রচনা যাহা বর্তমান তাহার অধিকাংশই নিছক সৌন্দর্যভোগস্পৃহা হইতে সঞ্জাত। তাঁহার কাব্যবিচারও সমালোচনার বেনামিতে সৌন্দর্যসৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁহার উড়িষ্যার দেবতা-দেউলের আলোচনাও ভাবায় মধ্যে পাথরের সৌন্দর্যকে ফুটাইবার চেষ্টা ছাড়া আর কি।

কিন্তু, এই কীট্‌সীয় সৌন্দর্যভোগস্পৃহাতে আর যেন তিনি স্বস্তি পাইতেছিলেন না, তাঁহার সৌন্দর্যভোগের মনোবৃত্তিতে কোথায় যেন এক ফাটল ধরিয়া উঠিতেছিল; এবং এই ফাটলের অবকাশে জীবনের বৃহত্তর কর্মজীবনের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িবার একটা অব্যক্ত আকুতি যেন তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার প্রমাণ কি? তাঁহার জীবনীকার বলিয়াছেন যে, তিনি এক সময়ে বাণিজ্যব্যাপারে ও স্বদেশিভাণ্ডার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। আর, জীবনের

শেষভাগে তিনি আর্যসমাজ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন। আর্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কার্যপ্রণালীর সমন্বয় সাধন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি পঞ্জাবে যান। এইসব প্রচেষ্টার মূলে কোন্ মনোভাব সক্রিয় ছিল? বলেন্দ্রনাথ কর্মী ছিলেন না, কর্ম তাঁহার প্রতিভার ও চরিত্রের স্বাভাবিক বাহন ছিল না। তবে এই কর্মোদ্যোগ কেন? আত্মজীবনকেন্দ্রী মোহময় সৌন্দর্যলোক তাঁহাকে পীড়িত করিয়া তুলিতে ছিল, এই মোহজগৎ হইতে কর্মজগতে বাহির হইয়া পড়িবার চেষ্টাই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তাঁহার এইসব কর্মোদ্যোগে। কিন্তু ইহাও নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতে পারে যে, তিনি জীবিত থাকিলে একদিন এই বাহ্যকর্মানুষ্ঠানও তাঁহাকে বিরক্ত করিয়া তুলিত। তিনি কর্মের বাহ্যজগৎ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নবীনতর উৎসাহে আবার সাহিত্যলোকে ফিরিয়া আসিতেন। কিন্তু সে সাহিত্য কোন্ শ্রেণীর? নিশ্চয় তাহা আর পূর্বতন নিছক সৌন্দর্যসৃষ্টির সাহিত্যলোক নয়। খুব সম্ভবত তিনি কাহিনীরচনার দিকে মনঃসংযোগ করিতেন, যাহার অস্ত্রবিস্তর সূত্রপাত আছে চন্দ্রপুরের হাট এবং পুলেন ধারে প্রভৃতি রচনায়। গল্প উপন্যাস ও কাহিনী যতই সৌন্দর্যময় হোক-না কেন, তাহাদের আত্মকেন্দ্রী সৌন্দর্য বলা চলে না। যেহেতু একবার গল্পের সূত্র ধরিয়া অবতীর্ণ হইলেই লেখক নিজের জীবন হইতে বাহির হইয়া সংসারের বৃহত্তর জীবনের মধ্যে নামিয়া আসিতে বাধ্য হয়। গল্পের নায়কনায়িকা ও ঘটনাপ্রবাহ লেখককে তাঁহার অভীষ্ট পথ হইতে টানিয়া লইয়া চলে। তাহাদের জীবনের দাবির নিকটে লেখকের ব্যক্তিগত দাবি ও অভিরুচিকে খর্ব করিতে হয়। আত্মতন্ত্র সেখানে পরতন্ত্রের নিকটে নতমস্তক। গল্প-উপন্যাসের কর্মজগৎ পরোক্ষে বৃহত্তর জীবনের কর্মজগৎ ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের বিশ্বাস, বলেন্দ্রনাথ জীবনপরিণাম ভোগ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিলে কাহিনীরচনার কর্মজগতে প্রবেশ করিয়া স্বস্তি ও চরিতার্থতা লাভ করিতেন, এবং তাঁহার হস্তক্ষেপে বাংলার উপন্যাস-সাহিত্য নূতন সার্থকতা লাভ করিত।

৪

কিন্তু কি হইতে পারিত, নূতন কোন্ ঐশ্বর্য লাভ করিত তাঁহার রচনা, ইহাতেই সমালোচনা পর্যবসিত হইলে তাঁহার প্রতি সুবিচার করা হইবে না। যেসব রচনা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহাদের মধ্যে যে ঐশ্বর্য ও প্রতিভার চিহ্ন আছে তাহাতেই তিনি বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিবেন।

বলেন্দ্রনাথের প্রধান ঐশ্বর্য তাঁহার দৈবী ভাষা ও দিব্য কল্পনা। ভাষার এমন মহিমা রবীন্দ্রসাহিত্যের বাহিরে বড়-একটা চোখে পড়ে না। শব্দাঢ্য অলংকৃত উপমাবহুল ভাষার কি চতুরঙ্গ ঐশ্বর্য। অধিকাংশ লেখকের কাছেই ভাষা ভাব-প্রকাশের একটা উপায় মাত্র। ভাবের তল্পি বহিয়া পীড়িত ও নিঃস্ব ভাষা তাহাদের ভাবের অনুগামী মাত্র, তাহাদের ভাষার যেন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। বলেন্দ্রনাথের ভাষা আদৌ সে শ্রেণীর নয়। তাঁহার ভাষা রাজকন্যার বহুরত্নাদিবিভূষিত নানা-চিত্রাদিসুশোভিত কারুকার্যের মহিমায় উজ্জ্বল শিবিকার মত; আর সেই শিবিকার বাহকদেরই বা কি সাবলীল গতি, সৌকর্য্যও মন্দ নহে। রাজকুমারী হয়তো অনবদ্যরূপা, কিন্তু তাহার শিবিকাখানিও তুচ্ছ নয়। শিবিকার তিরস্করণীর অন্তরালবর্তিনীর মূর্তি চোখে না পড়িলেও নিতান্ত দুঃখ করিবার কিছু নাই, শিবিকার সৌন্দর্যেই চক্ষু ধন্য হইয়া যায়—

> কণারকে এখন কিছুই নাই, ধূ ধূ প্রান্তর মধ্যে শুধু একটি অতীতের সমাধিমন্দির—শৈবালাচ্ছন্ন জীর্ণ দেবালয় এবং তাহারই বিজন কক্ষের মধ্যে পুরাতন দিনের একটি বিপুল কাহিনী। সেই পুরাতন দিন, যখন এই মন্দির দ্বারে দাঁড়াইয়া লক্ষ লক্ষ শুভ্রকান্তি ব্রাহ্মণ যাজক যজ্ঞোপবীতজড়িত হস্তে সাগরগর্ভ হইতে প্রথম সূর্যোদয় অবলোকন করিতেন; নীল জল শুভ্র আনন্দে তাঁহাদের পদতলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত এবং নীল আকাশ অবারিত প্রীতিভরে অকণিম আশীর্বাদধারা বর্ষণ করিত।...
>
> এই বিলাসখচিত মন্দিরের দ্বারে কত লোকে কত দিন অন্তরের দারুণ নির্বেদ লইয়া আসিয়াছে। সংসার পাছে কামনার উদ্রেক করে, পাছে কোনোদিন স্ত্রীর মুখ দেখিয়া মোহ উপস্থিত হয়, সন্তানের মায়া কাটানো না যায়, বৃদ্ধ পিতামাতার অশ্রুজল বন্ধনছেদনে বাধা দেয়, গৃহ স্ত্রী পিতা মাতা সমস্ত পরিজন পরিত্যাগ করিয়া লোকে দেবদ্বারে আসিয়া হত্যা দিয়া পড়িয়াছে, হে দেবতা রক্ষা কর, মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া দাও, আমি তোমার দ্বারে চিরদিন সন্ন্যাসী হইয়া রহিব। হায়, জড় দেবতা, সে যদি বুঝিত তুমি কি অন্ধকার মোহরাশিতে গঠিত। ক্ষীণ দীপালোকে তোমারই সম্মুখ-প্রাঙ্গণে নিত্য মদনবিলাসের এক-এক অঙ্ক অভিনীত হয়!
>
> পরিত্যক্ত পাষাণস্তূপের নির্জন নিকেতনে নিশাচর বাদুড় বাসা বাঁধিয়াছে, হিমশিলাখণ্ডোপরি বিষধর ফণিনী কুণ্ডলী পাকাইয়া নিঃশব্দ বিশ্রামসুখে লীন হইয়া আছে; সম্মুখের ঝিল্লিমুখরিত প্রান্তরদেশ দিয়া গ্রাম্য পথিকজন যখন

কদাচিৎ দূর তীর্থ উদ্দেশে যাত্রা করে, একবার এই জীর্ণ দেবালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে চাহিয়া দেখে এবং বিলম্ব না করিয়া আসন্ন সূর্যাস্তের পূর্বেই দ্রুতপদে আবার পথ চলিতে থাকে।—কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মত, মায়ার মত; যেন কোন্ প্রাচীন উপকথার বিস্মৃতপ্রায় উপসংহার শৈবালশয্যায় এখানে নিঃশব্দে অবসিত হইতেছে এবং অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিরেখায় ক্ষীণপাণ্ডু মৃত্যুর মুখে রক্তিম আভা পড়িয়া সমস্তটা একটা চিত্রাদৃশ্যের মত বোধ হয়। —কণারক

বাস্তবিক বলেন্দ্রনাথের ভাষা কণারকের পরিত্যক্ত মন্দিরের মতই। কণারকের মন্দিরের মতই তাহাতে বলিষ্ঠ বিশালতার সঙ্গে কমনীয় সৌন্দর্যের কি অপরূপ সমন্বয়; আবার কণারকের মন্দিরের মতই তাহা নিঃসঙ্গ এবং পরিত্যক্ত; আর কণারকের মন্দিরের বাহ্য মদনোৎসবের অভ্যন্তরে যেমন সুকঠিন বৈরাগ্যের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, বলেন্দ্রনাথের শিল্পও তেমনি একাধারে অনুরাগ ও বিরাগের লীলাস্থল, শিল্পের ইন্দ্রিয়বিলাসের তলে শিল্পীর কঠোর বৈরাগ্য অভিমূর্ত। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্যের বাহিরে আর এমন ভাষা অধিক আছে কি? সত্যই এ ভাষা কণারকের মন্দিরের মত নিঃসঙ্গ এবং পরিত্যক্ত। ভাষার এমন ছন্দঃস্পন্দ, এমন স্বপ্রতিষ্ঠিত মহিমা বাংলা সাহিত্য হইতে যেন লোপ পাইয়াছে। মেঘদূতের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, কালিদাসের আমলের তুলনায় বর্তমান যেন অনেক পরিমাণে ইতর হইয়া পড়িয়াছে। বাংলা ভাষা যে ইতর হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন ভাষার প্রতি লেখকদের আর 'প্রেমিকের দৃষ্টি' নাই, নিতান্তই ভৃত্যের দৃষ্টিতে তাঁহারা ভাষাকে দেখিয়া থাকেন। এখন বাংলা ভাষার গতি বাড়িয়াছে, শব্দসম্পদ বাড়িয়াছে নমনীয়তাও কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের ভাষায় যে আভিজাত্য, যে মহিমময় পদক্ষেপ, যে উদার আড়ম্বর দৃষ্ট হয়, তাহা কি লোপ পায় নাই? ভাষার সে রাজকীয়তা আর নাই, ভাষা এখন নির্বাচনোত্তীর্ণ এম. এল. এ.র স্তরে, বিচক্ষণ কারিগরের স্তরে নামিয়া আসিয়াছে। ভাষা এখন ভাবপ্রকাশের যন্ত্রমাত্র, ভাষা আর স্বপ্রতিষ্ঠ নহে। হয়তো কালের গতিতে ইহাই অনিবার্য। রাজকীয় কালের সঙ্গে রাজকীয় ভাষাও গিয়াছে। বহুজনের আত্মপ্রকাশের পথ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে ভাষাকে এখন বিস্তৃত হইতে হইয়াছে; তাহাতে পুরাতন ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের কিছু সংকোচ অপরিহার্য। বলেন্দ্রনাথের ভাষার 'রাজবত্নন্নতধ্বনি' ছন্দঃস্পন্দকে বর্তমানের রাজতন্ত্রবিরোধী জনগণ স্বভাবতই কিছু সংশয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকে।

বলেন্দ্রনাথের ভাষার সেই ধ্বনি আর ফিরিবে না, কিন্তু লোপও পাইবে না। কণারকের মন্দিরের অনুরূপ আর গঠিত হইবে না সত্য, কিন্তু সে ভগ্নাবশেষ যে অবলুপ্ত হইবে এমন সন্দেহ করিবারও কারণ নাই। বিস্তীর্ণ বালুশয্যা অতিক্রম করিয়া লোকে কণারকের শোভাসৌন্দর্য দেখিতে যাইবে; বলেন্দ্রনাথের ভাষার ঐশ্বর্যভোগ করিবারও লোকের অভাব হইবে না। তাই বলিতেছিলাম, তাঁহার ভাষা কণারকের মন্দিরের মতই নিঃসঙ্গমহিম এবং প্রাচীন আড়ম্বরের লীলাস্থল। বলেন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবন লাভ করিলে নূতন কি সম্পদের সৃষ্টি করিতে পারিতেন তাহা ব্যর্থ জল্পনার অন্তর্গত, কিন্তু ভাষার মহিমার জন্যই যে তিনি বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবেন, ইহা সুনিশ্চিত। তাঁহার বহুতর রচনার বালুশয্যা পার হইয়া ভাষার কণারক দেখিতে খুব বেশি লোকের যাইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু কষ্টসংকল্পী যে রসিকেরা একবার সেদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন তাঁহাদের সকল অধ্যবসায় যে সার্থক হইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৭১-১৯৫১

বহুমুখীপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির দুর্ভাগ্য এই যে, অনেক সময়েই এক দিকের খ্যাতির তলে তাঁহার অন্য দিকের কৃতিত্ব চাপা পড়িয়া যায়; সব দিকের কৃতিত্ব কদাচিৎ সমানভাবে স্বীকৃত হয়। তার কারণ, প্রতিভার বহুমুখিতার প্রতি সাধারণ মানুষের কেমন যেন একটা অবিশ্বাসের ভাব আছে। তাই সে একটা মাত্র কৃতিত্বকে আদরে বাছিয়া লইয়া অন্যগুলিকে অবহেলা করে। পাঠকের রসাস্বাদে বহুমুখিতার অভাব প্রতিভার বহুমুখিতার অস্বীকৃতির অন্যতম কারণ।

রবীন্দ্রনাথের মত বহুমুখী প্রতিভা বিরল। অলোকসাধারণ সাহিত্যিক বিরাট-পুরুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে তাঁহার যে অপ্রত্যাশিত বিলম্ব ঘটিয়াছিল তার একটি প্রধান কারণ তাঁহার প্রতিভার বহুমুখিতা। এখন তিনি সর্বজনস্বীকৃত কবিগুরু, কিন্তু বহুমুখিতার স্বাভাবিক অভিশাপ হইতে সম্পূর্ণভাবে যে তিনি মুক্ত হইতে পারিয়াছেন তাহা মনে হয় না। লোকসমাজে কবিরূপেই তিনি অবিসংবাদী। এই কবিখ্যাতির ফলেই তাঁহার অন্যান্য খ্যাতি কিয়ৎপরিমাণে দ্বিধাগ্রস্ত। তিনি পঞ্চাশখানার বেশি নাটক লিখিয়াছেন, তাঁহার উপন্যাস ও গল্প-গ্রন্থের সংখ্যা বিংশোত্তীর্ণ, প্রবন্ধাদির সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু কবিকৃতিত্বের উচ্চতম শৃঙ্গটির আড়ালে এইসব উচ্চশৃঙ্গ কতক পরিমাণে প্রচ্ছন্ন। যে সৌভাগ্যবান পাঠক দুরূহ অধ্যবসায়ে তাঁহার কাব্যশিখরে আরোহণ করিয়াছেন, কেবল তিনিই অন্যান্য শৃঙ্গের উচ্চতা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন; ভূতলচারীদের কাছে প্রধানত তিনি কবিই থাকিয়া যাইবেন। দুঃসাহসী পাঠক দেখিবেন, তাঁহার অপরাপর মহিমা কবি-মহিমার চেয়ে কম নয়। সমগ্রকে অখণ্ডদৃষ্টিতে দর্শনই সমালোচনার মর্মরহস্য। সমালোচক বিরল।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই যদি বহুমুখিতার এই অভিশাপমুক্ত না হন, তবে অন্যের আর আশা কোথায়। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভাও কতক পরিমাণে এই অভিশাপের দ্বারা খণ্ডিত। তাঁহার প্রতিভাও বহুমুখী; বহুমুখী এবং ভিন্নমুখী, যার ফলে তাঁহার মহিমা সর্বতোভাবে, যথার্থভাবে স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অবনীন্দ্রনাথের প্রধান কৃতিত্ব তাঁহার চিত্রশিল্প, এবং ইহাই তাঁহার প্রথম কৃতিত্ব। আর এই প্রথম কৃতিত্বের আড়ালে তাঁহার সাহিত্যিক পরিচয় কেবল গৌণভাবেই প্রকাশিত।

অবনীন্দ্রনাথ শিল্পী এবং শিল্পীগুরু। শিল্পের এবং শিল্পের ইতিহাসে কোথায় তাঁহার আসন, সে আলোচনা যথেষ্ট হইয়াছে; কিন্তু সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের আসন-নির্দেশের চেষ্টা এ পর্যন্ত হয় নাই। ইহা দুঃখের হইলেও বিস্ময়ের নহে; কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, বহুমুখিতার স্বীকৃতিতে সাধারণের একটা কেমন যেন অনুদ্যম আছে। অথচ বিচারে নামিলে দেখা যাইবে, সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের আসন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের নীচে নয়, আর বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের অন্তর্বর্তী যুগের লেখকদের অধিকাংশের উপরে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া দিলে যে কয়জন লেখক গদ্য-রচনার দ্বারা খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, গদ্যরচনাভঙ্গির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য যাঁহাদের আছে, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সত্ত্বেও নিজেদের মনের ছাপ গদ্যভঙ্গির উপরে যাঁহারা আঁকিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অল্প নয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজস্ব একটি গদ্যরীতি আছে, কিন্তু তার উপরে বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীনন্দ্রনাথ কাহারও প্রভাব নাই। কিন্তু এ বিষয়ে তিনিই বোধ হয় একক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয় সরকার—দুজনেরই নিজস্ব গদ্যরীতি আছে; কিন্তু তাঁহাদের রচনার কাঠামো বঙ্কিমচন্দ্রের শেষজীবনের গদ্য। শ্রীযোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির গদ্যরীতি বিচিত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের ভাষা না পাইলে ইহাদের গদ্যরীতি সম্ভব হইত কি না সন্দেহ। বীরবলী গদ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনে শিল্পদক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ণ রবীন্দ্র প্রভাবের সময়েও শরৎচন্দ্র গদ্যরচনায় যে স্বকীয়তা দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার মনীষা প্রকাশ পায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গির উপরেই তাঁহার স্টাইল প্রতিষ্ঠিত। ইহাদের সকলের মতই এবং সকলের চেয়ে বেশি করিয়া অবনীন্দনাথের গদ্য নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির পরিণত প্রকাশ রাজকাহিনী (১৯০৯), নালক (১৯১৬) প্রভৃতি গ্রন্থে এবং তাহার চরম ঘরোয়া (১৯৪১) এবং জোড়াসাঁকোর ধারেতে (১৯৪৪)। এই স্টাইলেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে, কিন্তু লেখকের স্বকীয়তা অতিশয় স্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ একাধিক স্টাইল ব্যবহার করিয়াছেন। অন্যান্য যাঁহাদের নাম করিলাম, তাঁহাদের স্টাইল একাধিক নয়। অবনীন্দ্রনাথও একটিমাত্র স্টাইল ব্যবহার করিয়াছেন। বাংলার ব্রত (১৯১৯) ও বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলীতে (১৯২১-২৯। প্র. ১৯৪১) যে প্রভেদ তাহা কেবল বিষয়বস্তুর পার্থক্যেই ঘটিয়াছে; সে প্রভেদ কেবল শাখাপ্রশাখায়, মূল কাণ্ডটা একই।

২

সাহিত্যের ছন্দ তিন ভাগে বিভক্ত। ইহাদের নাম দেওয়া যাইতে পারে গীতিস্পন্দ বাক্যস্পন্দ এবং লেখনীস্পন্দ। কাব্যে এই তিন স্পন্দই অত্যন্ত স্পষ্ট এবং উদাহরণও প্রচুর মিলিবে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতেই সমস্ত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইতে পারে।

ক্ষণিকার অধিকাংশ কবিতা বাক্যস্পন্দের অন্তর্গত; মুখের বাক্যভঙ্গিকে সামান্য আয়াসে বাঁকাইয়া তাহার সঙ্গে ছন্দের জ্যা যুক্ত করিয়া এই কাব্য গঠিত। গদ্যকবিতাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত; কিন্তু তাহাকে পদ্যের কোঠায় না ফেলিয়া গদ্যের কোঠায় ফেলিয়া বিচার করাই উচিত।

লেখনীস্পন্দের উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দ কবিতা। ইহা বাক্যভঙ্গিও নয়, গীতিভঙ্গিও নয়; কলমের ডগা ছাড়া এ বস্তু লিখিত হইতে পারে না। মানুষ কথা বলে, মানুষ গান করে, আবার মানুষ লেখে। প্রাচীন কালে মানুষ কেবল কথাই বলিত এবং গান করিত; তখন লিখিত না। কিন্তু বহুকালের অভ্যাসে মানুষ মসীজীবী বা লেখক হইয়া পড়িয়াছে। এই লিখনশীলতা মানুষের স্বাভাবিক নয়, অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত। লিখনশীলতা মানুষের প্রকাশের সীমাকে অনেক পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছে। অনেক কথা যাহা না বাচ্য, না গেয়, তাহা লেখ্য! লেখনীর ঘটকালি না ঘটিলে তাহা কখনো প্রকাশ পাইত কি না সন্দেহ। ভাষা ও ছন্দ কবিতা তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

গীতিস্পন্দের উদাহরণ অবিরল। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানেই গীতিস্পন্দ আছে; সুরযুক্ত বলিয়াই যে আছে তাহা নয়, গীতিস্পন্দ আছে বলিয়াই সুরযুক্ত হইয়াছে। অধিকাংশ বৈষ্ণবপদ গীতিস্পন্দপ্রধান। সুরে গীত না হইলেও এগুলি গীতিকবিতা, ইউরোপীয় অলংকারশাস্ত্রমতে লিরিক।

এ যেমন পদ্যে, তেমনি গদ্যেও এই তিন স্পন্দের লীলা দেখা যায়। সীতার বনবাসের স্পন্দ লেখনীস্পন্দ; ও জিনিস গীত হইবার নয়, উক্ত হইবার নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গদ্য, বীরবলী গদ্য, রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা বাক্স্পন্দপ্রধান; কমলাকান্তের দপ্তরও তাই। প্রত্যেকটারই আদর্শ মুখের ভাষা; কোনোটাতে বেশি, কোনোটাতে কম এই মাত্র। গীতিস্পন্দের উদাহরণ গদ্যে বিরল। লিপিকার কোনো কোনো অংশ, রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার কোনো কোনো কবিতা গীতিস্পন্দপ্রধান।

বাংলা গদ্যে গীতিস্পন্দের প্রধান দৃষ্টান্তস্থল অবনীন্দ্রনাথের গদ্য অবনীন্দ্রনাথের

স্টাইলে যে স্বকীয়তার উল্লেখ করিয়াছিলাম তাহা এই জন্যই। এ দিক দিয়া বাংলা সাহিত্যে একেবারে দ্বিতীয়রহিত না হইলেও নিঃসন্দেহ তিনি প্রধান।

সাহিত্যের এই গীতিস্পন্দ, বাক্স্পন্দ ও লেখনীস্পন্দের মধ্যে গীতিস্পন্দ প্রাচীনতম; কারণ মানুষ কথা বলিবার আগে গান করিতে শিখিয়াছে, আর তাহার লিখিতে শেখা সে তো সেদিনের কথা। সে এত অল্পদিনের কথা যে কলমের সঙ্গে আজও তাহার সম্পূর্ণ বোঝাপড়া যেন হয় নাই; মনের অনেক কথাই আজও মানুষ কলমে প্রকাশ করিতে অর্ধক্ষম মাত্র। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে, যাঁহারা লেখ্য ভাষা ও মৌখিক ভাষা লইয়া বিতর্ক বাধাইয়া থাকেন, তাঁহাদের মনে করাইয়া দেওয়া আবশ্যক, সাহিত্যের ভাষা দুইটি মাত্র নয়, তিনটি; লেখ্য ভাষা ও মৌখিক ভাষার সঙ্গে গেয় ভাষাকে যোগ করিতে হইবে। আর, লেখ্য ও মৌখিক ভাষার মধ্যে প্রভেদ কেবল ক্রিয়াপদগঠনের মাত্র নয়; ছন্দের প্রভেদ রহিয়াছে, আর ছন্দের প্রভেদ যে আছে তার কারণ ভাবের ও বিষয়ের প্রভেদ।

মানুষের প্রাচীনতম ভাবের বাহন গান, গদ্য পরবর্তী যুগের। আবার গদ্যের মধ্যে প্রাচীনতম—গীতিস্পন্দযুক্ত গদ্য। মানুষের অধিকাংশ রূপকথা এই গীতিস্পন্দের গদ্যে কথিত। কিন্তু রূপকথা যখন হইতে লিখিত হইতে আরম্ভ হইল, তখন গোলমাল বাধিল। যাহা গীতিস্পন্দে কথিত হইত লিখিবার সময়ে অনেক ক্ষেত্রেই তাহা লেখ্য ও মৌখিক ভাষায় লিপিবদ্ধ হইল, কদাচিৎ কখনো গীতিস্পন্দযুক্ত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথের প্রধান কৃতিত্ব এই যে, তিনি রূপকথাকে রূপকথার ভাষায় অর্থাৎ গীতিস্পন্দের ভাষায় লিখিয়াছেন। তাঁহার পরিণত স্টাইলের মধ্যে বহুযুগের মায়ের কোলের দোল ও মাতামহীর মুখের সুর সঞ্চিত হইয়া আছে; তাঁহার রাজকাহিনী, নালক, ভূতপত্রীর (১৯১৫) গদ্য পঠিত হইবামাত্র এই সুর গুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়া মানুষের শৈশবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তখনই ব্যক্তির শৈশব আর মানুষের শৈশব এক সঙ্গে জড়িত হইয়া গিয়া নিবিড় রূপকথার অপরূপ রাজ্যের সৃষ্টি করিতে থাকে। রূপকথা-কথন কঠিন, আর রূপকথা-লিখন?—অবনীন্দ্রনাথের রচনা না পাইলে অসম্ভব বলিয়াই মনে হইত।

আজকাল গণচৈতন্যপ্রসঙ্গে গণশিল্পের কথা শোনা যায়। কালীঘাটের পট নকল করিয়া ছবি আঁকা বা চাষার কাহিনী লইয়া গল্পনাটক রচনা গণশিল্প নয়; কারণ, গণত্ব ঘটনার মধ্যে নাই; যে-মন রচনা করিতেছে তাহার উপরেই সব নির্ভর করিতেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেখকের মন সাম্প্রদায়িক মন, সে মনের

যোগ্য বাহন লেখ্য ভাষা। লেখাতে মানুষে মানুষে তফাত; আবার অল্প লোক লিখিতে জানে, অধিকাংশই জানে না। অর্থাৎ লেখ্য ভাষা এমন একটা পথ যে-পথের সন্ধান 'গণ' জানে না, আর জানিলেও সে সংকীর্ণ পথে জনতার স্থান সংকুলান হইবে না। একমাত্র গানের প্রাচীনতম ও উদারতম জগন্নাথক্ষেত্রে সকল মানুষের স্থান আছে। যখন সমাজে শ্রেণীবিভাগ ঘটে নাই তখন হইতেই গানের সঙ্গে জাতিহিসাবে মানুষ পরিচিত, গানের মারফতে মানুষে মানুষে পরিচয়; সে পরিচয় আজিও সুপ্তভাবে মানুষের মনে সঞ্চিত আছে, গানের সুরে তাহা জাগিয়া ওঠে; জাগিয়া উঠিয়া শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের বাঁধ ভাঙিয়া সব একাকার করিয়া দিয়া মানবসমাজকে এক করিয়া দেয়। চাষার বিষয়ে লিখিত নাটক গণসাহিত্য নয়, এমন কি খাঁটি চাষার লিখিত রচনাও গণসাহিত্য নয়। কারণ সে পথ জনগণমনের পথ নয়। পরীক্ষা কঠিন নয়। গণনাটকের আসরে কোনো প্রকৃত 'গণ'কে বসাইয়া দিলে সে কিছুই বুঝিতে পারিবে না। আমাদের গণসাহিত্য নিতান্তই আমাদের জন্য লিখিত। রূপকথাই প্রকৃত গণসাহিত্য এবং অবনীন্দ্রনাথ সেই গণসাহিত্যের রাজা। অবনীন্দ্রনাথ সমাজের যে স্তরে এবং যে ঘরেই জন্মিয়া থাকুন-না কেন, প্রতিভার রহস্যে তিনি দেশের সেই উদার ক্ষেত্রে জন্মিয়াছেন যেখানে দেশের সর্বশ্রেণীর আসন; যেখানে দেশের মানুষ গল্পলিপ্সু, যেখানে গল্প শুনিবার লোভে সকল মানুষ বয়োভেদ ভুলিয়া চিরকালের শিশু। অভিজাতঘরের দক্ষিণের বারান্দায় গণসংগীত যে কি ভাবে গিয়া পৌঁছায় জানি না; হয়তো যে দাসীদের দ্বারা শৈশবে তিনি পালিত হইয়াছিলেন, তাহাদের মুখের কাহিনীতে, গলার সুরে রূপকথার দীক্ষা তিনি পাইয়া থাকিবেন, হয়তো মাতৃস্তন্যের সঙ্গেই রূপকথার রসপান করিয়াছিলেন; হয়তো প্রতিভার দুর্ভেদ্য রহস্যের মধ্যে ইহার সূচনা ছিল। কিংবা শ্রেণীতে শ্রেণীতে অভিজাতে দরিদ্রে যে দুস্তর বাধা আমরা কল্পনা করিয়া থাকি তাহা সত্য নয়; অন্তরঙ্গ কোনো মিল আছে, নতুবা কলিকাতার ধনীর ঘরে সমাজছাড়া ঘরের ঘরকুণো একটি বালক কোন্ মন্ত্রে গণসাহিত্যের রাজা হইয়া উঠিল! ইহার পরীক্ষাও কঠিন নহে। ভূতপতরী, বুড়ো আংলা (১৯৪১), রাজকাহিনী পড়িয়া শোনাও, শ্রেণী-শিক্ষা-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলে বুঝিবে, বুঝিয়া আনন্দ পাইবে। অক্ষর-পরিচয়ের উপরে ইহাদের রস নির্ভর করে না। অক্ষরগুলো ইহাদের ন্যূনতম অংশ। এমন কথা বাংলা সাহিত্যের কখানি পুস্তক সম্বন্ধে বলা যায়! শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের চেয়ে উচ্চতর আসনের অধিকারী হইতে পারেন; কিন্তু সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের গৌরব এই

যে, সাহিত্যের আসরে তিনি নিম্নতম আসনে বসিয়াছেন, একেবারে মাটির উপরে, সম্রাট অশোকের মত। মাটির উপরে বসিয়া তিনি মাটির মানুষের মন কাড়িয়া লইয়াছেন, যে মাটিতে চিরকালের ফসল ফলে, মানুষের শিশু নিত্য ভূমিষ্ঠ হয়।



গীতিস্পন্দপ্রধান গদ্যের উপজীব্য কি? বাক্যস্পন্দপ্রধান গদ্যে তর্কবিতর্ক করা চলে, তাহা সামাজিক মনের বাহন। লিখনস্পন্দপ্রধান গদ্যে চিন্তা করা চলে। গীতিস্পন্দপ্রধান গদ্যে গল্প বলা চলে; সে গল্প রূপকথার গল্প। রূপকথার গল্পে মূলে একটা স্থূল প্রভেদ আছে। অন্য গল্পের মত রূপকথায় রিয়ালিজ্‌মের স্থান নাই। আজ যাহা রিয়ালিজ্‌ম কাল তাহা রিয়ালিজ্‌ম-বর্জিত; সাহিত্যে নিত্যই একটা রিয়ালিজ্‌ম-বর্জনের প্রক্রিয়া চলিতেছে। কাহিনী হইতে রিয়ালিজ্‌মের বিষ ঝরিয়া গেলে তবেই তাহা রূপকথায় স্থান পাইবার যোগ্য হয়। এই রিয়ালিজ্‌ম-বর্জনের জন্য কিছু সময় দরকার। ঠিক কতটা সময় লাগিবে তাহা ইতিহাসের গতির উপরে এবং লেখকের শক্তির উপরে নির্ভর করে; সামান্য নিয়মের দ্বারা নির্দেশ করা চলে না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। নেপোলিয়নের জীবনী এবং ইতিহাস বাস্তব ব্যাপার। টলস্টয়ের ওয়র অ্যাণ্ড পীস্ উপন্যাসে তাহা একদফা রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহা লিখনস্পন্দপ্রধান ভাষায় লিখিত। কারণ, এই গল্পের সূত্রে লেখক মানবজীবন সম্বন্ধে কতকগুলি চিন্তনীয় কথা বলিতে চাহিয়াছিলেন। আবার নেপোলিয়নের কাহিনী লইয়া ফরাসি কবি বেরেঞ্জার গান লিখিয়াছেন; তাহাতে অনুভূতির কথা আছে, চিন্তার কথা নাই। ইহা বাস্তব ঘটনার আর এক রকম রূপান্তর। আবার এই একই কাহিনী হার্ডির হাতে দি ডাইনাস্টস্ কাব্যে জন্মান্তর পাইয়াছে। কিন্তু কোনোটাই রূপকথার পর্যায়ে পড়ে নাই। বরঞ্চ বেরেঞ্জারের কোনো কোনো গান রূপকথার সীমার মধ্যে যেন আসিয়া পড়িয়াছে। বেরেঞ্জারের একটি গানে আছে—একজন বৃদ্ধ সৈনিক, সে নেপোলিয়নকে দেখিয়াছিল, ছোট ছেলেদের গল্পচ্ছলে বলিতেছে, আমি তাঁহাকে এই গ্রামের মধ্য দিয়া বহু রাজার দ্বারা অনুসৃত হইয়া যাইতে দেখিয়াছি। ইহা প্রায় রূপকথার পর্যায়ভুক্ত। নেপোলিয়নের ইতিহাস বাস্তববিষয়বর্জিত হইয়া একটি ছত্রে সত্যতর হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র ইতিহাসের অভিজ্ঞতা ওই একটি ছত্রে ঘনীভূত। রিয়ালিজ্‌ম সত্য; অতি-রিয়ালিজম বা সুপার রিয়ালিজ্‌ম

সত্যতর। রূপকথার কারবার এই সুপার-রিয়ালিজ্‌মের উপাদান লইয়া। কিন্তু নেপোলিয়নের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের রিয়ালিজ্‌ম এখনো সম্পূর্ণরূপে খসিয়া যায় নাই। ইউরোপের ইতিহাসে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও রাষ্ট্রনীতি এখনো সক্রিয়। হয়তো পাঁচ শ বছর পরে কিংবা হাজার বছর পরে নেপোলিয়নের ব্যক্তিত্বের বিরাট ঈগলকে রূপকথার রূপার খাঁচায় ভরিবার সময় আসিবে। তখন নেপোলিয়ন আর সম্রাট থাকিবেন না, তিনি Jack the Gient Killer জাতীয় একটা রূপকাহিনীতে পর্যবসিত হইবেন; যে বামন জ্যাক একাকী ইউরোপীয় বহুরাজক অরাজকতার দৈত্যকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বস্তুত জ্যাক ও জায়েন্টের কাহিনীর মূলে বহুযুগপূর্ববর্তী প্রচণ্ড একটা ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনা আছে; এখন তাহা প্রমাণের পরপারবর্তী অনুমানের রাজ্যে গিয়া পড়িয়াছে। প্রমাণের কম্পাসে রিয়ালিজ্‌মের সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়; রূপকথার রাজ্যের জাদুমন্ত্র-পড়া বাতায়ন হইতে যে দুস্তর সমুদ্র দেখা যায় তাহার একমাত্র কম্পাস—অনুমান।

যে কথা প্রমাণযোগ্য নয়, অনুমান যার একমাত্র সম্বল, তাহা লইয়া তর্কবিতর্ক করা চলে না, চিন্তা করা চলে না; কেবল সুরের দ্বারাই তাহা প্রকাশযোগ্য। সেইজন্য রূপকথার প্রধান সম্বল গীতিস্পন্দপ্রধান ভাষা।

অবনীন্দ্রনাথের সব কথাই রূপকথা। তাঁহার প্রথমতম গ্রন্থ হইতে শেষতম জোড়াসাঁকোর ধারে অবধি সবই রূপকথা। তাঁহার সমস্ত রচনা যে একখানা সুদীর্ঘ মসলিনের থান, ক্রমে ক্রমে অকুণ্ডলীকৃত হইয়া খুলিয়া চলিয়াছে। প্রথম দিকে তার সুতাগুলি মোটা, বুনানি তেমন জমাট নয়; কিন্তু কালক্রমে তাহা সূক্ষ্মতর ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিয়াছে। আবার এই সাদা জমিনের উপর নানা রঙের ছাপ আছে। কোনোখানে ক্ষীরের পুতুল (১৮৯৬), শকুন্তলার (১৮৯৫) ছাপ; কোনোখানে বা নালক, রাজকাহিনীর ছাপ; শেষের দিকে সুতা যেখানে অতিশয় সূক্ষ্ম সেখানে ভূতপত্‌রী, খাতাঞ্চির খাতা (১৯২১), বুড়ো আংলার ছাপ; শেষ দুইটি ছাপ দেখিতেছি ঘরোয়া এবং জোড়াসাঁকোর ধারের। এই মসলিনের থানের সবটাই একই হাতের বুনন বলিয়া ইহার যে-কোনো অংশ সমগ্রের স্বাদ দিতে সক্ষম। অবনীন্দ্রনাথের সব রচনার একই রস বলিয়া কোনো একখানা বই পড়িলে একরকম সব বই পড়ার কাজ হইয়া যায়।

ক্ষীরের পুতুল তো প্রকৃত রূপকথার বস্তু। কালিদাসের শকুন্তলা রূপকথা নয়। কিন্তু দীর্ঘ কালাতিপাতের ফলে শকুন্তলা-কাহিনী এখন রূপকথার বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। রাজকাহিনীর কাহিনী ঐতিহাসিক, ইচ্ছা করিলে

ঐতিহাসিকের অণুবীক্ষণ যোগে ইহা দেখা যাইতে পারে, তাহাতে ইতিহাসের রস পাওয়া যাইবে। কিন্তু লেখক ঐতিহাসিকের অণুবীক্ষণ ফেলিয়া রূপকথার দূরবীক্ষণ চোখে লাগাইয়াছেন; ফলে কাছের জিনিস তথ্য বর্জন করিতে করিতে দূরে সরিয়া গিয়া রূপকথার রাজ্যে রূপান্তরিত হইয়াছে (দূরবীক্ষণ দূরের জিনিস কাছে টানিয়া আনে, ওটা রিয়ালিজ্‌মের সত্য)। ভূতপত্‌রী, খাতাঞ্চির খাতার বুনানি এতই সূক্ষ্ম যে, আছে কি না সন্দেহ হয়; বৈদেশিক রূপকথার রাজার সেই নূতন পোশাকের কথা মনে করাইয়া দেয়। বুড়ো আংলার কাহিনী মূলত বিদেশি হইলেও মনে রাখিতে হইবে রূপকথায় দেশ-বিদেশের রিয়ালিজ্‌ম-গত প্রভেদ নাই। সেখানে সব দেশই এক দেশ, সব মানুষই এক মানুষ, অর্থাৎ শিশু। রূপ-কথার রাজ্যই আন্তর্জাতিকতাবাদীদের পরিকল্পিত অখণ্ড পৃথিবী; রূপকথার শ্রোতা শিশুই আন্তর্জাতিকতাবাদীদের পরিকল্পিত জাতিসম্প্রদায় ধর্ম-দেশ-বিমুক্ত মানব; রূপকথার সত্যযুগ ইতিহাসের বিস্তৃতির পরপারবর্তী অতীত কালে, কোনো অনিশ্চিত ভাবিষ্যতে নয়।

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের সবচেয়ে কৃতিত্ব এই যে, ঘরোয়া ও জোড়াসাঁকোর ধারের সমসাময়িক ইতিহাসকে তিনি রূপকথায় পরিণত করিয়াছেন। এ কেমন করিয়া সম্ভব হইল? আগে বলিয়াছি যে, রূপকথায় পরিণত হইতে বাস্তবের কিছু সময় লাগে, কিন্তু ঠিক কতটা সময় লাগে তাহা বলি নাই, কারণ তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। জোড়াসাঁকোর ইতিহাস সমসাময়িক হইলেও তাহার এত শীঘ্র রূপকথায় রূপান্তরিত হইবার অনুকূলে কিছু কারণ আছে।

প্রথমত, জোড়াসাঁকোর ইতিহাসের প্রথম অঙ্ক বাংলাদেশের একটা বিগত যুগের কথা। সে যুগ অল্পদিন গত হইলেও ইতিমধ্যেই যেন বহুযুগ আগে গিয়া পড়িয়াছে। সেদিনের পল্লী-কলিকাতার সঙ্গে আজিকার যান্ত্রিক-কলকাতার যে প্রভেদ তাহা কেবল সময়ের নহে, দুই জীবনভঙ্গির প্রভেদ। পল্লীর জীবনভঙ্গি হইতে আজ আমরা বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছি; দুই-তিন পুরুষকালের মধ্যে বহুকালের তফাত ঘটিয়া গিয়াছে; প্রায় 'এই জনমে ঘটালে মোর জন্মজন্মান্তর' গোছের। দুইয়ের রসই আলাদা হইয়া গিয়াছে। লেখক এই রসভেদের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়ত, সময়ের দূরত্বের উপরে ইতিহাসের ঘটনা ঘনীভূত হইয়া চাপিয়া বসিয়া তাহাকে নূতন অর্থ, নূতনতর দূরত্ব দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নামে একটি শিশুর জন্ম হইতে রবীন্দ্রনাথ নামে মহাকবির মৃত্যু সামান্য কয়েক বছরের মধ্যে (রিয়ালিজ্‌ম

বলে, আশি বছর কয়েক মাস) এই বাড়িতে ঘটিয়া গিয়াছে। ইহা যে কত বড পৃথিবী-নাড়া-দেওয়া ঘটনা তাহা চোখে দেখিয়াছি বলিয়াই বিশ্বাস হইতেছে না, বিস্ময় বোধ হইতেছে না। চোখে না দেখিয়া ইতিহাসে পড়িলে বিস্ময়ের অন্ত থাকিত না। এই সামান্য আশি বছরের উপর অনেক শতাব্দীর ভার যেন ঘনীভূত। সামান্য অঙ্গারের উপর ভূস্তরের দুর্বহ চাপ পড়িয়া হীরকের সৃষ্টি করে। সামান্য কয়েক বছরের উপব বহু শতাব্দীর নিহিতার্থ ঘনীভূত হইয়া একটা পারিবারিক কাহিনীকে রূপকথার অলৌকিকত্ব দান করিয়াছে। অঙ্গার প্রকৃতির রিয়ালিজ্‌ম ; প্রকৃতির রূপকথা হীরক।

তৃতীয়ত, লেখকের বিশেষ সাহিত্যিক গুণ।

৪

সাহিত্যিক হিসাবে অবনীন্দ্রনাথ যে সাধনোচিত মর্যাদা পান নাই তার অন্যতম কারণ, পাঠকে তাঁহাকে শিশুসাহিত্যিক মাত্র মনে করে, যেন শিশুসাহিত্যিক সাহিত্যিকশিশু, নিতান্তই নাবালক। আর একবার নাবালক বলিয়া ধরিয়া লইলে কিছুতেই তাহাকে সাবালকের আসনটি দিতে মন সরে না। কিন্তু মনে রাখা উচিত, পৃথিবীর অধিকাংশ সাহিত্যিক রচনাই শিশুসাহিত্য, অধিকাংশ সার্থক রচনা তো বটেই। এমন হয় তার কারণ, মানুষমাত্রেই মূলত শিশু, গল্প-শোনার শৈশব তার কিছুতেই কাটে না। এ সেই সিন্দবাদের স্কন্ধারোহী বৃদ্ধের বিপরীত আখ্যান। মানুষমাত্রেই সিন্দবাদ, কেবল বার্ধক্যের বদলে প্রত্যেকে নিজের শিশুসত্তাকে বহন করিয়া জীবনের পথে চলিয়াছে। সাহিত্যের সংবেদন এই শিশুটার প্রতি। তা ছাড়া অপর সংবেদনও অবশ্য আছে। শিশুর বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপরে নানা রকম সংস্কারের স্তর জমিয়া উঠিতে থাকে এবং শেষে এমন এক সময় আসে যখন ভিতরের শিশুটি বাহিরের স্তরবাহুল্যে চাপা পড়িয়া যায়। পদ্মের পাপড়ি একটির পর একটি খসাইয়া লইলে ভিতরের বীজকোষটিকে অব্যাহত দেখা যাইবে। সেই বীজকোষটিই মানুষের অন্তর্নিহিত শিশুসত্তা। অবশ্য, অনেক সময়ে সংস্কারের চাপে শিশুর মৃত্যু ঘটে। তাহারা নিতান্ত দুর্ভাগা ; ভালো মন্দ কোনো সাহিত্যের সংবেদনই তাহাদের প্রতি নাই। নিম্নশ্রেণীর সাহিত্যের সংবেদন কেবল সংস্কারের স্তরগুলির উপর। প্রচারসাহিত্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত। শাশ্বত ((classics) শ্রেণীর সাহিত্যের সংবেদন স্তরগুলির

উপরেও, আবার এইসব স্তরোত্তীর্ণ শিশুটির প্রতিও। আর, রূপকথা-সাহিত্যের প্রধান সংবেদন সরাসরি স্তরাতিক্রমী শিশুটির প্রতি। এ দিক দিয়া শাশ্বত সাহিত্যে ও রূপকথায় ঘনিষ্ঠ ঐক্য; দুইয়ের মধ্যে সংবেদনের সাম্যে গোড়ায় একটা মিল আছে। সেইজন্যই দেখা যায় যে, পৃথিবীর অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ বই শিশুসাহিত্য না হইয়াও শিশুদের চিরপ্রিয়। ডন-কুইক্‌সোটের ইতিহাস, গ্যালিভারের ভ্রমণ, রবিন্‌সন্ ক্রুশোর কাহিনী, লা ফঁতেনের উপকথা, পিক্‌উইকের কীর্তিকাহিনী, পঞ্চতন্ত্র ও কথাসরিৎসাগর এই জাতীয় গ্রন্থ। আবার অনেকগুলি বিখ্যাত বই যাহা প্রধানত শিশুসাহিত্য নামে পরিচিত তাহা বয়স্কদেরও প্রিয়। দেশ বিদেশে-প্রচলিত রূপকথার কথাই ভাবিতেছি। হ্যান্‌স্ অ্যাণ্ডারসন কর্তৃক সংগৃহীত গ্রন্থ এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কোনো বই সত্যিই শিশুসাহিত্য কি না তাহার প্রধান পরীক্ষা তাহা বয়স্কদের পাঠ্য কি না। কোনো বইয়ে যদি শিশু-মনের প্রতি প্রকৃত সংবেদন থাকে তবে তাহার বয়স্কের সংস্কারের স্তর ভেদ করিবার সামর্থ্যও থাকে। তাহার সে ক্ষমতা না থাকিলে তাহা নিশ্চয় শিশুসাহিত্য নয়। কোনো শিশুর ভালো লাগিলেও লাগিতে পারে, চিরশিশুর কখনোই ভালো লাগিবে না। এই মনের দ্বারা বিচার করিলে বলিতে হইবে, অবনীন্দ্রনাথের বই শ্রেষ্ঠ অর্থে শিশুসাহিত্য, অর্থাৎ তাহা একেবারে শিশুর ও বয়স্কের, অর্থাৎ মানুষের অন্তঃস্থ চিরশিশুর প্রিয়। তাহার রাজকাহিনী, নালক, ভূতপত্‌রী কোন্ শিশুর না প্রিয়? কোন্ বয়স্কের না প্রিয়? এমন বয়স্ক যদি কেহ থাকে যে তাহার এসব বই প্রিয় নয়, তবে বুঝিতে হইবে নানা সংস্কারের চাপে তাহার চিরশিশুর মৃত্যু ঘটিয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যের বাদশাহ এবং সেই কারণেই তিনি বয়স্কের সাহিত্যের রাজা।

৫

রূপকথার রূপ শব্দটির অর্থ কি? বিশেষ কোনো অর্থ আছে, না উপকথার অপভ্রংশে এমনটি দাঁড়াইয়াছে? যেমনি হোক, রূপকথায় একটি বিশেষ ইঙ্গিত আছে যাহা উপকথায় নাই। রূপকথা কাহিনীর পট মেলিবার সঙ্গে সঙ্গে চোখের সমুখে একটা রূপের সৃষ্টি করিতে থাকে; এই রূপসৃষ্টির সার্থকতার জন্য ইহার নাম রূপকথা। কিন্তু ইহা তো বিশেষ ভাবে রূপকথার লক্ষণ নয়। সাহিত্যমাত্রেরই কাজ রূপের সৃষ্টি, তবে রূপকথার জন্য এই সামান্য লক্ষণের দাবি করি কি ভাবে।

কিন্তু তবু একটু প্রভেদ আছে। রূপকথা কেবল রূপেরই সৃষ্টি করে। অন্যান্য কাব্যসাহিত্য রূপেরও সৃষ্টি করে, সঙ্গে সঙ্গে অন্য রসেরও সৃষ্টি করে; পাঠকের চিন্তার উদ্রেক করে, পাঠকের ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করে। রূপের বেসাতি তাহার একমাত্র কাজ নয়; তাহার কাজ অনেক জটিল। সেইজন্যই তাহা বিশেষ ভাবে রূপকথা নয়। রূপকথার ও শাশ্বত সাহিত্যের মিলের উল্লেখ করিয়াছি; সে মিলটা এইখানে, রূপসৃষ্টিতে। অমিলের উল্লেখও করিয়াছি, তাহাও এইখানে; রূপকথার লক্ষ্য মাত্র একটি, অন্য সাহিত্যের লক্ষ্য একাধিক, কেবল রূপসৃষ্টি করিলে তাহার চলে না। চলে যে না, তার কারণ অন্য সাহিত্য বয়স্ক মানুষের জন্য সৃষ্টি, তাহার চাহিদা বিস্তর, কেবল রূপবিস্তার করিয়া তাহার চোখকে তৃপ্ত করিলে চলে না, তাহার চিৎশক্তিকে, তাহার ইচ্ছাশক্তিকে খোরাক যোগাইতে হয়, তাহার নানা সংস্কারকে পোষণ করিতে হয়। শিশুমনের চাহিদা অনেক সরল, কেবল রূপসৃষ্টি করিয়া তাহারা চোখদুটিকে তৃপ্ত করিতে পারিলেই আর কিছু সে চাহে না। রূপকথার প্রধান লক্ষণ নিছক রূপসৃষ্টি।

রূপকথার দ্বিতীয় লক্ষণ উহাতে দেশ ও কালের কৈবল্য-সাধন। বিশিষ্ট-লক্ষণযুক্ত দেশহীনতা এবং কালহীনতা ইহার প্রধান সহায়। অর্থাৎ রূপকথার ভূগোল ও ইতিহাস নাই। সব দেশের বাইরে কোনো দেশে রূপকথার লীলা। আর, কালের স্রোত সেখানে স্তব্ধ। সেখানে বয়স হয় তো বাড়ে, কিন্তু স্বভাব বদলায় না; বড়জোর শিশুর বয়স বাড়িয়া সেখানে চিরশিশুতে রূপান্তরিত হয়। ডন্‌কুইকসোট্ ও পিক্‌উইক এই সময়হীন সময়ের অধিবাসী; তাহাদের বয়স হয়তো বাড়িয়াছে কিন্তু স্বভাবের পরিবর্তন হয় নাই।

রূপকথার জগৎ বিশিষ্টার্থে দেশহীন ও কালহীন বলিয়াই এখানে কিস্তুত-রস বা আজগবি রসের সৃষ্টি এমন সহজ। কিস্তুত-রস আর কিছুই নয়, জীবনের স্বাভাবিক তালপরিবর্তনই কিস্তুত-রস। যে তালে আমরা প্রাত্যহিক জগতে পা ফেলি কিস্তুত-জগতের পা ফেলার তাল তাহা হইতে স্বতন্ত্র। প্রাত্যহিক দেশ ও কালকে বিদায় করিয়া দিয়া এই স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করা হয়।

অবনীন্দ্রনাথের রচনা হইতে সবগুলি লক্ষণেরই দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। রাজস্থানের বীরপুরুষ ও রমণীরা ইতিহাসের এক বিশেষ সময়ের লোক। কিন্তু রাজকাহিনীর জগতে আসিয়া যখন তাহারা প্রবেশ করিতেছেন তখন তাঁহারা কালোত্তীর্ণ দেশোত্তীর্ণ ব্যক্তি; তাঁহারা রূপকথার মানুষ। তখন আর তাঁহাদের বয়সের প্রশ্ন, স্বভাবের প্রশ্ন মনে ওঠে না। সংসারে মানুষ জীবনযাপন করে;

যাপন শব্দের মধ্যে গতির ইঙ্গিত আছে। কিন্তু রূপকথার জগতে নরনারী লীলা করে মাত্র; লীলার মধ্যে চঞ্চলতা আছে, কিন্তু গতি নাই। গতি স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়, চঞ্চলতা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আবার পুরাতন স্থানেই লইয়া আসে; কিন্তু চঞ্চলতা আছে বলিয়াই পূর্বতন পুরাতন হয় না, তাহাকে বলি আমরা নিত্য।—ইহার অপর নাম নৃত্য। রূপকথার জগৎ নৃত্যের জগৎ, প্রাত্যহিক জগৎ শতগজি দৌড়ের জগৎ; এই সংস্কারের আধুনিক নাম প্রগতি।

আবার কিভুত-রসের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ভূতপত্রীর দেশে; খাতাঞ্চির খাতায়, বুড়ো আংলাতে। ভূতপত্রীর দেশ উলটা-ছায়ার দেশ; জীবনের সত্য তাহাতে আছে, কেবল উল্টাভাবে মাত্র আছে; এই উল্টাকে স্বাভাবিক করা হইয়াছে দেশ ও কালের স্বভাবকে গোড়া হইতেই বর্জনের দ্বারা। সেখানে পালকি চলে কিন্তু এগোয় না; সেখানে উপরে উঠিতে হইলে নীচে নামিতে হয়, সেখানে চোখ মেলিয়া ঘুমানো, আবার তাকাইয়া থাকিলে তবেই ঘুম পায়।

এমন কি পথে-বিপথের (১৯১৯) মত বই, যাহার অধিকাংশ গল্পই গঙ্গায় ষ্টিমারে-বেড়ানোর গল্পমাত্র, লেখকের কলমের জাদুকাঠিতে তাহাও রূপকথার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। ইহা অতিশয় কঠিন কাজ। এক পা সত্যের নৌকায় আর-এক পা রূপকথার নৌকায় রাখিয়া চলার মত কঠিন কাজ আর কিছু আছে বলিয়া জানি না। আনাড়ির যাহাতে পদে পদে পতনের আশঙ্কা, অবনীন্দ্রনাথের তাহাতে ওস্তাদির অন্ত নাই। স্বপ্ন ও সত্যের মিশ্রণে তাঁহার যেমন কৃতিত্ব এমন আর কিছুতে নয়: এই বিষম ধাতুতে তৈয়ারি তাঁহার ভূতপত্রীর দেশ বুড়ো আংলা, খাতাঞ্চির খাতা; এমন কি পথে-বিপথেও এই বিষয়ের রচনা। সত্য কথা বলতে কি, অবনীন্দ্রনাথ সত্য ও স্বপ্নের সীমান্তপ্রদেশের লেখক; এই দুই জগতের খবর তাহার রচনায় যেমন পাই, এমন তো আর কোথাও দেখি না।

৬

সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা করিয়া সাহিত্যরস বুঝানো সম্ভব নয়। তবু সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনার প্রয়োজন আছে। কারণ, রসবিচারই, সাহিত্যের একমাত্র বিচার নয়। সাহিত্যক্ষেত্রে তত্ত্ববিচার গৌণ, রসবিচার মুখ্য। আবার রসবিচারের প্রকৃষ্টতম পন্থা রচনাপাঠ। রচনাপাঠ ছাড়া আর কোনো উপায়েই রচনার উপলব্ধি সম্ভব নয়। এবারে অবনীন্দ্রনাথ হইতেই কোনো-কোনো অংশ উদ্ধার করিয়া তাঁহার যথার্থ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব—

পুষ্পবতী যত্ন ক'রে নিজের কালো চুলের চেয়ে মিহি, আগুনের চেয়ে উজ্জ্বল, একগাছি সোনায় তার, সরু হতেও সরু একটি সোনার ছুঁচে পরিয়ে একটি ফোঁড় দিয়েছেন মাত্র, আর চাঁপার কলির মতো পুষ্পবতীর কচি আঙুলে সেই সোনার ছুঁচ বোলতার মতো বিঁধে গেল!

যন্ত্রণায় পুষ্পবতীর চোখে জল এল; তিনি চেয়ে দেখলেন, একটি ফোঁটা রক্ত জ্যোৎস্নার মতো পরিষ্কার সেই রুপোর চাদরে রাঙা এক টুকরো মণির মতো ঝক্ঝক্ করছে। পুষ্পবতী তাড়াতাড়ি নির্মল জলে সেই দাগ ধুয়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন; জলের ছিটে পেয়ে সেই এক বিন্দু রক্ত ক্রমশ ক্রমশ বড় হয়ে, একটুখানি ফুলের গন্ধ যেমন সমস্ত হাওয়াকে গন্ধময় করে, তেমনি পাতলা ফুরফুরে চাদরখানি রক্তময় করে ফেললে।...

হঠাৎ সন্ধ্যার অন্ধকারে ডানার একটুখানি ঝটাপট্ সেই ঘুমন্ত শিকরে পাখির কানে পৌঁছল, সে ডানা ঝেড়ে ঘাড় ফুলিয়ে বাদশার হাতে সোজা হয়ে বসল। আল্লাউদ্দিন বুঝলেন, তাঁর শিকারী বাজ নিশ্চয়ই কোনো শিকারের সন্ধান পেয়েছে। তিনি আকাশে চেয়ে দেখলেন, মাথার উপর দিয়ে দুখানি পান্নার টুকরোর মতো এক-জোড়া শুক-শারী উড়ে চলেছে। বাদশা ঘোড়া থামিয়ে বাজের পা থেকে সোনার জিঞ্জীর খুলে নিলেন; তখন সেই প্রকাণ্ড পাখি বাদশার হাত ছেড়ে নিঃশব্দে অন্ধকার আকাশে উঠে কালো দুখানা ডানা ছড়িয়ে দিয়ে শিকারীদের মাথার উপরে একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল, তার পর একেবারে তিন শ' গজ আকাশের উপর থেকে, একটুকরো পাথরের মতো সেই দুটি শুক-শারীর মাঝে এসে পড়ল।—রাজকাহিনী

রূপকথার প্রধান দায়িত্ব রূপের বা ছবির সৃষ্টি। উদ্ধৃত অংশ দুটিতে ছবি কি নিখুঁত; আর সে ছবির রঙের ছায়াতপের কি সুষমা। শুকশারীর রং পান্নার চেয়ে গাঢ়, কিন্তু ঘননীল আকাশের পটে তাহাদের রং তুলনায় লঘুতর হইয়া পান্নার স্বচ্ছতায় নামিয়া আসিয়াছে।

পদ্মিনী কাহিনীতে অর্ধরাত্রে চিতোরেশ্বরীর আবির্ভাব এবং সখীসহ পদ্মিনীর জৌহর ব্রতে আত্মবিসর্জন, পাঠককে আর একবার পড়িতে অনুরোধ করি। এ দুটিও রূপসৃষ্টি, কিন্তু একটি কি করুণ, আর-একটি কি ভয়ংকর—গা ছম্ ছম্ করিয়া ওঠে।

নালকের একটি বর্ণনা—

সন্ধ্যাবেলা। নীল আকাশে কোনোখানে একটু মেঘের লেশ নেই,

চাঁদের আলো আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত নেমে এসেছে, মাথার উপর আকাশ-গঙ্গা এক টুকরো আলোর জালের মতো উত্তর থেকে দক্ষিণ দিক পর্যন্ত দেখা দিয়েছে। দেবল ঋষি গ্রামের পথ দিয়ে গেয়ে চলেছেন 'নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়'; মায়ের কোলে ছেলে শুনছে 'নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়'; ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মা শুনছেন 'নমো নমো'; বুড়ি দিদিমা ঘরের ভিতর থেকে শুনছেন 'নমো'; অমনি তিনি সবাইকে ডেকে বলছেন, ওরে নোমো কর্। গ্রামের ঠাকুরবাড়ির শাঁখ-ঘণ্টা ঋষির গানের সঙ্গে এক তানে বেজে উঠছে, নমো নমো! রাত যখন ভোর হয়ে এসেছে, শিশিরে ধুয়ে পদ্ম যখন বলছে নমো, চাঁদ পশ্চিমে হেলে বলছেন নমো, সমস্ত সকালের আলো পৃথিবীর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যখন বলছেন নমো, সেই সময়ে ঘুম ভেঙে নালক উঠে বসেছে আর অমনি ঋষি এসে দেখা দিয়েছেন।

আবার জোড়াসাঁকোর ধারের পনেরো অধ্যায়ে গঙ্গার যে ছবি আছে তাহা পাঠককে বারংবার পড়িতে অনুরোধ করি। একবার এই ছবির মাধুর্যের জন্য, দ্বিতীয়বার অবনীন্দ্রনাথের মনের পরিচয় পাইবার জন্য। বার-দুই পড়িলে আরও পড়িতে হইবে, এমনি মোহ আছে এই ছবিতে, এমনই মোহ আছে অবনীন্দ্রনাথের সব লেখায়। গঙ্গাকে এমন করিয়া আর কে দেখিয়াছে; গঙ্গাকে আর কে এমন ভালোবাসিয়াছে। ভক্তরা শুধু মন দিয়া গঙ্গাকে দেখে; আর এই শিল্পী-ভক্ত সুরধুনীকে মন দিয়া, প্রাণ দিয়া, চোখ দিয়া দেখিয়াছেন; তাই তো অবনীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করিয়াছেন—

> তারা [আধুনিক ভারতীয় শিল্পী] ভারতকে দেখতে শেখে নি, দেখে নি। এ আমি অতি জোরের সঙ্গেই বলছি। আমি দেখেছি, নানারূপে মা-গঙ্গাকে দেখেছি।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পরীতিতে নানা দেশের প্রভাব থাকিতে পারে কিন্তু এমন ভারত-দেখা চোখ, ভারত-ঘেঁষা মন, দেশ-ভালোবাসা প্রাণ আর কোথায়? তিনি একান্তভাবে ভারতীয় বলিয়াই নানা রীতির প্রভাব সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কারণ, মূলে এক জায়গায় সংকীর্ণ না হইলে বৃহৎকে গ্রহণ করা যায় না। মৌলিক সেই সংকীর্ণতার নামই ব্যক্তিত্ব। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার শেষতম দুইখানি বইয়ে আসিয়া পড়িয়াছি, ঘরোয়া ও জোড়াসাঁকের ধারে। নানা কারণে এ দুখানি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

৭

অবনীন্দ্রনাথের রচনাবলীর মধ্যে ঘরোয়া ও জোড়াসাঁকোর ধারে বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই দুইখানিতে তাঁহার রচনারীতি চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং এই দুইখানিতে একাধারে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ও সামাজিক মানুষ অবনীন্দ্রনাথের জীবনকথা লিপিবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা, এবং অবনীন্দ্রনাথের ঘরোয়া ও জোড়াসাঁকোর ধারে এই চারখানি বইয়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সামাজিক ইতিহাস পাওয়া যায়। যে আবহাওয়ার মধ্যে লোকোত্তর দুইজন মনীষী জন্মিয়াছেন, বাড়িয়া উঠিয়াছেন, যে আবহাওয়ায় তৎকালীন নব্যবঙ্গসংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, এই বই-চারখানি তাহার ইতিহাস বুঝিতে যেমন সাহায্য করে এমন আর কোথায়? যে যুগে ইহারা জন্মিয়াছিলেন সে যুগ এখন ইতিহাসের অঙ্গগত, সে ঘটনার পরিণাম প্রায় পঞ্চম অঙ্কের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে: যবনিকা পড়ি পড়ি করিতেছে, বিদায়ঘণ্টার ধাতুফলক লক্ষ্য করিয়া ঘণ্টাবাদকের নির্মম হস্ত উদ্যত-প্রায়। সে যুগ ছিল ময়লা চাদরের, পাদুকাহীন কর্দম-অঙ্কিত পায়ের; সে যুগ ছিল ঝাড়লণ্ঠনের, প্রশান্ত জাজিম-পাতা উদার ফরাশের। মৌচাকেব মত কক্ষবহুল বাড়িগুলি নিকট ও দূর আত্মীয়স্বজনের উপস্থিতিতে মৌচাকের মতই গুঞ্জনমুখর থাকিত। মূল্যবান চেয়ারের অনমনীয় সংকীর্ণতা তখনো আহ্বানের উদারতাকে সংকুচিত করিয়া তোলে নাই। আধুনিক সভ্যতার সদাগরপুত্রের জাহাজখানা সবে ঘাটে আসিয়া ভিড়িয়াছে, সে তখনো ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিয়া আপনাকে পর করিবার সর্বনাশা মন্ত্রে সকলকে স্বার্থপরতার দীক্ষাদান করিতে সমর্থ হয় নাই। শহর ও পল্লী তখনও শৈশবের ঐক্য ঘুচাইয়া এমন নিষ্ঠুর স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে নাই। কেবল রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ যে সেই সময়ের মানুষ এমন নয়, যে নব্যবঙ্গসংস্কৃতির গৌরব আমরা করিয়া থাকি তাহাও সেই যুগের স্তন্যে লালিত। এই যুগের সামাজিক মনের ও মনের প্রতিক্রিয়ার পরিচয় যেমন এই বইগুলিতে আছে বাংলা সাহিত্যে তেমন আর কোথাও দেখি নাই। এবং এই দিক দিয়া বিচার করিলে বই-চারখানা বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের একটা সময়ের দলিলরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু দলিল হিসাবে যে মূল্যই ইহাদের থাকুক, ইহাদের মুখ্য মূল্য সাহিত্য হিসাবে। এই মুখ্য ও গৌণ রূপ মিলাইয়া ইহাদের গ্রহণ করিতে হইবে।

সেকালের জোড়াসাঁকোর বাড়ির যে ছবি জোড়াসাঁকোর ধারে ও ঘরোয়াতে পাই, তাহার তুলনা নাই। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি বাংলা সাহিত্যের স্থবিত

পাষাণের প্রাসাদ। বাংলাদেশের প্রভাতের আশা এবং অপরাহ্নের ম্লানিমা এখানে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিরাজমান। এই প্রাসাদ এককালে পুরাতন আভিজাত্যের বিবিক্ত উদারতা দেখিয়াছে, আবার নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্থূল কর্মোদ্যমেরও ইহা সাক্ষী। গত দেড় শ বছরের কলিকাতায় কোন্ ধনী মানী জ্ঞানী, কোন্ অভিজাত না এই বাড়িতে সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় গৌরবে পদার্পণ করিয়াছেন; আবার নূতন-ক্ষমতাপুষ্ট মধ্যবিত্তসম্প্রদায় সেদিন শোকের শ্রাবণের অপরাহ্নে বাঁধভাঙা বন্যার উচ্ছ্বাসে প্রবেশ করিয়া সমগ্র জাতির সম্মিলিত অশ্রুর প্রবাহে কবিগুরুর মৃতদেহ ভাসাইয়া লইয়া গেল, এই প্রাসাদ সেই যুগলক্ষণাক্রান্ত ঘটনারও সাক্ষী। প্রাচীন পল্লী-কলিকাতার কেন্দ্রশায়ী এই প্রাসাদ আধুনিক যন্ত্রগঠিত কলিকাতার একান্ত-শায়ী। ইহা আর কেবল ধনীপরিবারমাত্রের বাস্তুভিটা নয়, ইহা দুই যুগের প্রত্যন্তসীমায় প্রহরীরূপী দুর্গপ্রাসাদ।

রূপকথার ওস্তাদ শিল্পীর কলম তুলির স্পর্শে এই বাড়ির কর্তা-মনিব আত্মীয়-আগন্তুক চাকর দাসী, মায় গাছপালাগুলি পর্যন্ত জীবন্ত, রূপকথার অলৌকিকতায় সমৃদ্ধ। দক্ষিণের বারান্দায় পুরুষানুক্রমে চৌকি পাতিয়া বসা; একদিন বাড়ির ছোট ছেলেটি বয়স্কদের আনাচে কানাচে ঘুরিত, কিছুকাল পরে সে আবার বয়সের গৌরবে চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল, তাহার পায়ের কাছে ছেলেরা আবার তেমনি করিয়া ঘোরা-ফিরা করে; দক্ষিণের বারান্দার প্রবীণ শিল্পীর পায়ের কাছে ক্রমে ক্রমে নবীন শিল্পীদের ভিড় জমিতে থাকে। ও-বাড়ির তেতলার ছাদে সন্ধ্যাবেলায় আসর জমে, কিশোর কবির নবীন গান; গভীর রাত্রে তেতলার ছাদে দীর্ঘছায়ানিক্ষেপী বাণীর ছায়াপ্রতীকের মত যুবক কবির নিঃশব্দ পদচারণ; শরৎ-কালের প্রভাতে চাদরের প্রান্তে একমুঠা বেলফুল বাঁধিয়া দক্ষিণের বারান্দায় কবির নীরব বৈতালিক; দক্ষিণের বারান্দায় স্বপ্নপ্রয়াণ-পাঠরত কবির ও রসিক শ্রোতা রাজনারায়ণ বসুর উচ্চকিত অট্টহাস্য ও-বাড়ির বালক দূর হইতে শুনিতে পায়; ও বাড়ির বালক শিল্পী উঁকি মারিয়া দেখিতে পায়, এ-বাড়ির বারান্দায় দ্বিপ্রহরের আহারান্তে কর্তা-দাদামহাশয় আলবোলায় ধূমপান করিতেছেন; কখনো দেখিতে পায়, শালের পাগড়ির তলে বঙ্কিমচন্দ্রের ললাট ও মুখমণ্ডল; এ-বাড়ির বালক-কবি দেখিতে পায়, ও-বাড়ির নাচঘর আলোয় আলোময়; দেউড়িতে জুড়িগাড়ির ভিড়; নাচঘর হইতে উচ্ছ্বসিত গানের সঙ্গে হাসির শুভ্র ফেনা; দক্ষিণের পুকুর-পাড়ে নানা প্রকৃতির স্নানার্থীর জনতা; পুরানো বটের প্রতিদিন নূতন ছায়ানিক্ষেপ, দক্ষিণের বাগানে বিকালবেলা চৌকি পাতিয়া ও-বাড়ির কর্তাদের আসর

জমিয়া ওঠে ; ফোয়ারার জল পিচকারি ছোঁড়ে, আর কৃত্রিম হাঁসের দল ভাসিয়া বেড়ায়।

যুগে যুগে কত-না আগন্তুক এই বাড়িতে! পালকি হইতে দেওয়ানজীর অবতরণ ; চটি-চাদরে বিদ্যাসাগর ; ভাঙা গলায় টানা সুরে মাইকেলের মেঘনাদবধ-আবৃত্তি; আত্মনিমগ্ন বিহারীলালের সারদামঙ্গলের স্বগতভাষণ ; তানপুরা-মাত্র-সঙ্গী শ্রীকণ্ঠ সিংহ ঘরে ঘরে গান গাহিয়া ফিরিতেছেন, দরজায় লাট-বেলাটের ছাপ মারা গাড়ি, তার পর কতকাল চলিয়া যায়, ক্রমে শিল্পী সাধক রসিকেরা আসিতে থাকে। জাপানি পুতুলের মত জাপানি সাধক ওকাকুরা, তপস্বিনী উমার সহোদরার মত ভগিনী নিবেদিতা, চৌকাঠের কাছে ইতস্ততঃশীল ব্রহ্মবান্ধব। তার পরে আরও যুগ যায়। শিরা-বাহির-করা দৃঢ় মুষ্টিতে ধৃতযষ্টি গান্ধীর প্রবেশ ; দ্রুতপদ-বিক্ষেপে কাঠের সিঁড়ি দিয়া বালকের উৎসাহে জহরলাল দোতলায় উঠিতেছেন। রামমোহন হইতে গান্ধী! উনবিংশ শতকের ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতে বিংশ শতকের মধ্যাহ্নে! ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রারম্ভ হইতে ব্রিটিশ রাজত্বের উপান্ত! সদ্যজাগ্রত আভিজাত্যের আদি হইতে ক্লান্তপ্রায় মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ের যুগান্ত। নব্যবঙ্গসংস্কৃতির সমগ্র সুরসপ্তকের সঙ্গে পরিচিত এই প্রাসাদ। ভারতীয় সংস্কৃতির ধ্বনি ও বিশ্বসংস্কৃতির প্রতিধ্বনি এখানে বসিয়া শোনা যায়। জোড়াসাঁকোর এই বাড়ি বাংলা সাহিত্যের ক্ষুধিত পাষাণ।

এই ক্ষুধিত পাষাণের কথা আছে ঘরোয়া আর জোড়াসাঁকোর ধারে-তে। সবটাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে অপরাহ্নিক বিষাদের একটা ছায়া, যুগাবসানের শান্তি, জীবনাবসানের প্রশান্ত করুণতা। যে আদর্শের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ জন্মিয়াছিলেন সেই আদর্শের নিষ্ফল অভিসার জীবনের সায়াহ্নে শিল্পীকে আজ ভিতরে ভিতরে ব্যথাইয়া তুলিয়াছে। চারি দিক সেই আদর্শের কীর্তিচূড়ার স্খলনে ধ্বনিত ; তার তলে শিল্পীর হৃদয় চাপা পড়িয়া গুমরিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। কান পাতিয়া শুনিলে বই দুইখানিতে সেই চাপা আর্তনাদ শুনিতে পাওয়া যায়—

> কত অভিনয় কত খেলা করে, কত সুখদুঃখের দিন কাটিয়ে, সেই জোড়াসাঁকোর বাড়ি মাড়োয়ারী ধনীকে বেচে বের হতে হল যেদিন আমার নিজের ছেলেপিলে বউঝি নিয়ে···

একটি যুগলক্ষণাক্রান্ত বিশেষ ঘটনা। কেবল পরিবার-বিশেষের বাস্তুভিটা-পরিত্যাগ নয়। দেউলে পুরাতন আদর্শের নূতনকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়া পথে

বাহির হওয়া। গৃহলালিত শিল্পের বাজারে আসিয়া দোকান-তোলা। নূত যুগের নূতন হাওয়া—

বরজ করজোড়ে কহিল, প্রভু, মোদের সভা হল ভঙ্গ।

এখন আসিয়াছে নূতন লোক, ধরায় নব নব রঙ্গ।

এ আর শুধু বরজলালের গানভঙ্গ নয়, একেবারে তাহার গৃহভঙ্গ।

কথায় কথায় অবনীন্দ্রনাথের শেষজীবনে আসিয়া পড়িয়াছি। তিনি নিজে তাঁহার জীবনান্তের সমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। জীবনকথা-লেখক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া আর একবার শৈশবে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখন আবা নূতন করিয়া তাঁহার ছেলেখেলা শুরু হইয়াছে। রং কৌশল শিল্পজটিলতা একে একে সব ঝরিয়া গিয়াছে, আছে কেবল তাঁহার শিশুদের পুতুলগুলি। একদি শৈশবে পুতুল খেলিয়াছেন; আজ পরিণত শৈশবে তিনি পুতুল তৈরি করিয়া সময় যাপন করেন; যে পুতুল লইয়া তাঁহার অন্তরের চিরশিশু খেলা করে। এখন আর তিনি রাজকাহিনীর বর্ণাঢ্য রচনা লেখেন না; বর্ণবিরল ঘটনাবিরল যাত্রা লেখেন, মারুতির পুঁথির কিস্তূতের দেশে চিরশিশু যথেচ্ছ বিহার করিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহার চিত্রও এখন বর্ণরূপ ও পারিপাট্য ত্যাগ করিয়া সরলতম রেখায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে; 'আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলংকার।'—

অলংকার রংছুট ময়ূরী এল। সে জগতে সে রঙের অপেক্ষা রাখে না। সেই যে কুঞ্জে নূপুর বাজে সেখানে রংছুট ময়ূরী খেলা করে। বিরহের গভীর সুর বাজে। মন-ময়ূরী একলা।…রংছুট ছবি। ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে এলো সবুজ রং।—জোড়াসাঁকোর ধারে।

অবনীন্দ্রনাথের পরিণত শিল্প, কি চিত্রে, কি সাহিত্যে, এই রংছুট ময়ূরী। শিল্পের চিত্রবর্ণকলাপ ঝরিয়া গিয়া আজ সে শুভ্র ডানা বিস্তার করিয়াছে। এই শুভ্রতাই পূর্ণতা। যে খেলাঘরে শিল্পী আজ রংছুট ময়ূরীর সঙ্গে পুতুলখেলায় নিরত সেই খেলাঘর জীবন-তানের সম; যে শিশু আজ তিনি পুনরায় হইয়াছেন সেই শিশুই চিরশিশু, যাহার সন্ধান তিনি সারা জীবন করিয়া ফিরিয়াছেন; রূপকাহিনীর শিশুচরিত্র সৃষ্টি করিয়া যাহাকে পান নাই, আজ তাহাকে তিনি নিজের মধ্যেই পাইয়াছেন।

কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৪০—১৯২৬

॥জীবচন্দ্রের রচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, লেখকের প্রতিভা থাকাই ॥থেষ্ট নয়, সঙ্গে কিছু গৃহিণীপনা থাকা আবশ্যক। ঐ গৃহিণীপনার অভাবে প্রতিভা থোচিত ফল ফলাইতে পারে না। ঐ গৃহিণীপনা থাকিলে কেবল একটিমাত্র ।চনার জোরেও লেখক টিকিয়া থাকে, যেমন ফিট্‌জেরাল্ড ওমর-খৈয়ামের অনুবাদের জারে টিকিয়া আছেন। আবার ঐ গৃহিণীপনার অভাবেই অনেক লেখক তলাইয়া ।ান। যেমন ওদেশে ল্যান্‌ডর, এদেশে রবীন্দ্রনাথের মতে সঞ্জীবচন্দ্র। আমরা সই-সঙ্গে তাঁহার অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম করিতে পারি।

দ্বিজেন্দ্রনাথের সমালোচক-ভাগ্য অসামান্য। তৎকৃত মেঘ দূতের পদ্যানুবাদ ।ড়িয়া মধুসূদন বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।[১] আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক ছিলেন, অযথা প্রশংসা করিবার লাক তিনি ছিলেন না; তিনিও স্বপ্ন প্রয়াণ কাব্যের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন।[২] ।বীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে স্বপ্নপ্রয়াণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এসব ছাড়া ।রো তিনটি রচনা আমার চোখে পড়িয়াছে।[৩] কাজেই দেখা যাইতেছে যে সেই ৮৭০ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত, সামান্য কম এক শতাব্দী, প্রায় তিন

১ "আমার ধারণা ছিল বাঙ্গালায় ভাল কবিতা রচিত হ'তে পারে না; মঘদূত প'ড়ে দেখছি, সে ধারণা ভুল।" —পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্যায়

মধুসূদন যে "দেবেন্দ্র ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের কবিত্বে" মুগ্ধ ছিলেন এমন মন্তব্য অন্যত্রও দেখিয়াছি।

২ "আজকালকার ছেলেরা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' গ্রন্থখানির ।হিত বিশেষ পরিচিত নহে। কিন্তু অত originality, অমনরচনা-সৌষ্ঠব আমি ।য় কুত্রাপি দেখি নাই। ভাব সকল যেন luscious! যদি কেহ বাঙ্গালা ।াহিত্যের মধ্যে শেলীর আস্বাদ পাইতে চায়, তাহা হইলে এই গ্রন্থখানি হইতে ।াইবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে Somehow or other it never came to the surface." —পুরাতন প্রসঙ্গ, ১ম পর্যায়।

৩ প্রিয়নাথ সেন, প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি; সতীশচন্দ্র রায়, রচনাবলী; শ্রীকানাই ।ামন্ত, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫২।

প্রজন্মকাল দ্বিজেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট গুণগ্রাহীর অভাব ঘটে নাই। মাইকেল ছা
আর সকলেই তাঁহার স্বপ্ন প্রয়াণের গুণানুকীর্তন ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন—সকে
একবাক্যে এই কাব্যকে অমরতার আশ্বাস দিয়াছেন।[৪]

কিন্তু কালের বিচিত্র গতিতে দেখা যাইতেছে যে উচ্চ আদালতের রায় কাবে
অনুকূলে হওয়া সত্ত্বেও কবির বিশেষ লাভ হয় নাই। তিনি নামে মাত্র বাঁচি
আছেন, তাঁহার কাব্যের নামটাও বোধ করি অনেকেরই স্মৃতির অতীত! এ
আশ্চর্য ঘটনা। এ কেমন করিয়া সম্ভব হইল? গৃহিণীপনার অভাবই কি ইহ
কারণ! আমার মনে হয় একটা কারণ, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। আরো বি
কারণ আছে, আর সে-কারণ কালধর্মে ও পরবর্তী কাব্যধর্মে নিহিত। স্ব
প্রয়াণের মত অমর কাব্যের বিস্মৃতিতে বাঙালা ও বাংলা সাহিত্যেরও পরি
নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়। এক বিষয়ের অনুসন্ধানে নামিলে একাধি
বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যাইবে ভরসায় অগ্রসর হইতেছি।

২

দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনকথা তাঁহার রচনার চেয়ে অধিকতর বিদিত, খুব সম্ভব রবীন্দ্র
অগ্রজরূপে যে কৌতূহল তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ফলেই এমনটি হইয়াছে
নতুবা নিজেকে বিদিত বা বিজ্ঞাপিত করিবার ঝোঁক তাঁহার ছিল না। সংক্ষে
তাঁহার জীবনকথা বলা যাইতে পারে, ঘটনাবৈচিত্র্যবহুল তাঁহার জীবন নয়। এখা
কেবল সেই সকল তথ্যেরই উল্লেখ করিব বর্তমান প্রবন্ধের পক্ষে যাহা প্রাসঙ্গিক।

১৮৪০ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম হয় আর আঠারো বছর বয়সে ১৮৫৮ সা
তিনি বিবাহ করেন। এই সময়ে বা ইহার এক-আধ বছর পরে তিনি মেঘদূ
কাব্যের বাংলা অনুবাদ করেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের উৎসাহে
আনুকূল্যে যে চৈত্র মেলা বা হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠিত হয় দ্বিজেন্দ্রনাথ তাহাতে অন্যত
অগ্রণী ছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার দীর্ঘজীবনে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজ, বেঙ্গ
থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও ভারতী

৪ স্বপ্নপ্রয়াণ গ্রন্থাকারে ১৮৭৫ (?) সালে প্রকাশিত হইলেও ১৮৭৩ সা
অংশতঃ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৭৩ মাইকেলের মৃত্যুর বৎসর
মাইকেলের চোখে পড়িলে এই অপূর্ব কাব্যের তিনি প্রশংসা করিতেন বলিয়া
আমার ধারণা।

তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি পত্রিকার সহিত অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। মহর্ষির জীবিতকালে তিনি কলিকাতাতেই থাকিতেন। তার পরে মহর্ষির মৃত্যু হইলে ১৯০৫ বা ১৯০৬ সালে তিনি স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে আসিয়া বাস করেন। সেখানে ১৯২৬ সালের ১৯শে জানুআরি তারিখে এই মহানুভব মনীষী লোকান্তরে প্রয়াণ করেন। পঁচাশি বছরের বেশী এই দীর্ঘজীবনের তথ্যপুঞ্জ একমুষ্টির অধিক নয়। তাই বলিয়া তাঁহার ঘটনাবিরল জীবন ভাবনাবিরল নয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত অত্যাবধি গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত তাঁহার রচনাসমূহ গ্রন্থাবলী-আকারে ছাপিলে মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্ত রচনা সমষ্টিকে অতিক্রম করিবে বলিয়াই মনে হয়, অন্ততঃ সরেজমিনে সে পরীক্ষা না হওয়া অবধি প্রতিকূল মত প্রকাশ করিবার পথ বন্ধ।

দ্বিজেন্দ্রনাথের মুখ্য রচনাগুলির একটি তালিকা দিতেছি।[৫]—

১	মেঘদূত	১৮৬০
২	তত্ত্ববিদ্যা ৪ খণ্ড	১৮৬৬-১৮৬৯
৩	স্বপ্ন প্রয়াণ	১৮৭৫
৪	পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম	১৮৯৮
৫	রেখাক্ষর বর্ণমালা	১৯১২
৬	গীতাপাঠ	১৯১৫
৭	নানা চিন্তা	১৯২০
৮	প্রবন্ধমালা	১৯২০
৯	কাব্যমালা	১৯২০
১০	চিন্তামণি	১৯২২

কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাঁহার প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় নয়। কেননা, গদ্য ও পদ্য ছাড়াও নানা বিষয়ে তিনি নিজেকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। জ্যামিতি, স্বরলিপি উদ্ভাবন, কাগজের বাক্স রচনাপ্রণালী উদ্ভাবন ও বাংলা শর্টহ্যাণ্ড অক্ষর রচনার প্রচেষ্টাও তিনি করিয়া গিয়াছেন। প্রতিভার সঙ্গে গৃহিণীপনা থাকলে ইহাদের যে-কোন একটি ধারাকে অনুসরণ করিয়া লোকে চরিতার্থতা লাভ করিতে পারিত, কিন্তু সেদিকে তাঁহার যেন দৃষ্টিই ছিল না। তিনি অনেক নূতন পথ

৫ পূর্ণতর তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর," সাহিত্যসাধকচরিতমালা, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ।

আবিষ্কার করিয়াছেন কিন্তু কোন পথেরই চূড়ান্ত পর্যন্ত পৌঁছিবার চেষ্টা করেন নাই ; শক্তির অভাব ছিল না, ছিল সেই গৃহিণীপনার অভাব। জীবনস্মৃতি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ অগ্রজের প্রতিভার প্রাচুর্যের উল্লেখ করিতে গিয়া উদাসীনতার প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন।—

বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে তেমনি স্বপ্ন প্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই।

এই উদাসীনতা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ, ইহা তাঁহার ব্যক্তিত্বের ধর্ম। গদ্য, পদ্য ও বিচিত্রমুখী রচনার কোনটাতেই তাঁহার প্রতিভার চূড়ান্ত পরিচয় নাই। তাঁহার রচনা পড়িতে শুরু করিলে মনে হয় ভাণ্ডারের চরম রত্নগুলি যেন তিনি হাতে রাখিয়া দিয়াছেন, তাই একপ্রকার অস্পষ্ট অতৃপ্তি পাঠকের মনকে পীড়িত করিতে থাকে। এ হেন লোকের পক্ষে, লেখকের পক্ষে পাঠকসমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়া কঠিন। দ্বিজেন্দ্রনাথ কিংবদন্তী ছাড়া আর কোথাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন কি ?

এ উদাসীনতাকে দার্শনিকের চরিত্রগত লক্ষণ বলিলে ভুল হইবে, ইহা নিতান্তই তাঁহার ব্যক্তিগত স্বভাব। তিনি দার্শনিক না হইলেও ইহার ব্যতিক্রম হইত না। সাংসারিক বিষয়ে অনাসক্তি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তাঁহার সাংসারিক অনাসক্তির একটি উদাহরণ দিতেছি। সরলা দেবী লিখিয়াছেন—

পিতৃদত্ত মাসহারার সবটাই জ্যেষ্ঠপুত্র দীপেন্দ্রনাথের হাতে যেত, নিজে কিছুই রাখতেন না। দীপেন্দ্রনাথই পরিবারে যথাযথভাবে বণ্টন করিতেন। তাঁর নিয়মিত আহারবস্ত্রের কখনো অপ্রতুল হ'ত না। কিন্তু একটি কাম্যবস্তুর অভাব মধ্যে মধ্যে অনুভব করতেন, সেটি লেখার জন্য ও বাক্স তৈরির জন্য কাগজ। একদিন শুনি জোড়াসাঁকোতে তাঁর চাকরকে কাকুতি-মিনতির স্বরে বলছেন, 'দীপুকে গিয়ে বলিস আজ যদি আমায় একটি দোয়ানি দেন তবে আমি একখানি খাতা আনাই।' একটি দোয়ানির ভিখারী লক্ষপতি।

যে উদাসীনতা তাঁহাকে একটি দোয়ানি সঞ্চয় করিতে দেয় নাই সেই উদাসীনতার উত্তর-বাতাসে "স্বপ্নপ্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত।" আবার সেই উদাসীনতাই ছিল তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্তরায়। এই উদাসীনতা ও রবীন্দ্রনাথ-কথিত গৃহিণীপনার অভাব এক কি না, ভাবিয়া দেখিবার মত। প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে একটুখানি নারীস্বভাব নিহিত থাকে, সেটি গৃহিণী-পনার ভার নয়। এখন, পুরুষ ষোল আনা পুরুষ হইলে গৃহিণীপনার সুবিধাটুকু

হইতে সে বঞ্চিত হয়। তাহার অসুবিধার অন্ত থাকে না। একটি অসুবিধা আত্মপ্রতিষ্ঠায় অক্ষমতা। সংসারে যেখানে যে-কেহ প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে প্রথম কয়খানি ইঁট তাহাকে স্বহস্তে প্রোথিত করিতে হইয়াছে, তার উপরে ইমারত তুলিয়াছে। নিজের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠার জন্য দ্বিজদ্রেনাথের এতটুকুমাত্র উৎসাহ ছিল না। এ যুগে এ রকম মনোবৃত্তি একান্ত বিরল।

৩

দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিভার ধর্ম কি? তিনি মূলতঃ কবি না দার্শনিক? এ তর্কের মীমাংসা করিয়া লইয়া তবে অগ্রসর হওয়া উচিত, তাহাতে অনেক কুয়াশা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। প্রথম-যৌবনে তিনি কিছুকাল কবিতা লিখিয়াছেন, তার পরে আর কাব্য রচনা করেন নাই, তত্ত্ববিদ্যার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। কোল্‌রিজের সাহিত্যজীবনের সঙ্গে তাঁহার সাহিত্যজীবনের যেন মিল পাওয়া যায়। কোল্‌রিজের যা-কিছু উল্লেখযোগ্য কাব্য তাহা প্রথমজীবনের রচনা, শেষজীবন দর্শন ও সমালোচনাতত্ত্ব লিখিয়া তিনি অতীবাহিত করিয়াছেন। আবার, দুজনেরই কবি-কল্পনা কিঞ্চিৎ উন্মার্গগামী, অলৌকিকের পাড়ায় তাহাদের গতিবিধি। কোল্‌রিজের এনশেন্ট ম্যারিনার, কুব্‌লা খাঁ ও ক্রীস্টাবেল, দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ। বাহিরের এই মিল সত্ত্বেও দুজনের প্রতিভার ধর্ম ভিন্ন, কোল্‌রিজ মূলতঃ কবি, দ্বিজেন্দ্রনাথ মূলতঃ দার্শনিক।

স্বপ্নপ্রয়াণের গুরুত্ব এই যে, এ গ্রন্থ কবিত্ব ও তত্ত্বের টানা-পোড়েনে গ্রথিত; ইহার কঙ্কালটা তত্ত্বের, রক্তমাংস কবিত্বের, আর প্রাণসঞ্জীবন মন্ত্র কল্পনার। স্বপ্নপ্রয়াণ প্রকাশের পূর্বেই চার খণ্ডে সম্পূর্ণ তাঁহার তত্ত্ববিদ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। স্বপ্নপ্রয়াণের পরে তিনি আর কাব্য রচনা করেন নাই। আগেও তত্ত্ব, পরেও তত্ত্ব, মাঝখানে একবারের জন্য কাব্যে ও তত্ত্বে গ্রন্থি বাঁধিয়া গিয়াছে—আবার তার পরেই দ্বিগুণিত বেগে তত্ত্ববিদ্যার প্রবাহ ছুটিয়াছে, কাব্যের প্রবাহ স্বপ্নপ্রয়াণেই সমাপ্ত। এই একটি কারণ যে জন্য তাঁহার প্রতিভার ধর্মকে আমি মূলতঃ তাত্ত্বিক প্রতিভা বলিতে চাই।

আরো কারণ আছে। কাব্যে ও তত্ত্বে তিনি একই ভাষারীতি ব্যবহার করিয়াছেন, সে ভাষারীতি সর্বত্র গদ্যাত্মক, অর্থাৎ যুক্তি, শৃঙ্খলা ও প্রাঞ্জলতা তাহার প্রধান গুণ। প্রকৃত কাব্যের ভাষারীতি বা স্টাইল যুক্তিকে লঙ্ঘন করিয়া, শৃঙ্খলা

ছত্রভঙ্গ করিয়া উধাও হইয়া যায়, তাহার প্রাঞ্জলতা মেঘলোকের প্রাঞ্জলতা, স্বচ্ছ সরোবরের প্রাঞ্জলতা নয়। কাব্যের এই ধর্ম দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণে খুঁজিতে মিলিবে না, মিলিবে শ্রেষ্ঠ গদ্যরীতির ধর্ম। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ গদ্যরীতির জনক।

এখন কিছু কিছু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

কবিবর কথার বুঝিয়া মর্ম,
বলিল, যে অস্ত্রাঘাত সহিতেছে জানিছেন ধর্ম,
ভঙ্গ দিতে রণে
পারি বা কেমনে ?
অতএব দেখ মোর সাহসের কর্ম।

কিংবা—

সেই দশা করেছ আমার, চাই রাখো চাই মারো।
অসাধ্য কি আছে যাহা সুখ-সাধ্য করিতে না পারো
নয়ন-ভঙ্গিতে। বলো বলো তাই কি করিবে দীন
শুধিতে অমূল্য অই চাহনিরে মর্মভেদী ঋণ।

আর—

এ শান্তিনিকেতন। আমার কুটীরে বিনা-তৈলে একটি দীপ জ্বলিতেছে, ভগবদ্গীতা। আমাদের দেশের মস্তকের উপব দিয়া এত যে বাত্যা চলিতেছে, কিন্তু আশ্চর্য ঈশ্বরের মহিমা, উহার অটল জ্যোতি সেকাল হইতে একাল পর্যন্ত সমান রহিয়াছে, ক্ষণকালের জন্যও ক্ষুব্ধ বা ম্লান হয় নাই।

আরও—

কপিল মুনি জিহ্বা সংযত করিয়া বলিতে পারিতেন যে, 'যথাসম্ভব দুঃখনিবৃত্তিই জিজ্ঞাসার বিষয়' কিন্তু তাহা হইলে তিনি কপিল মুনি হইতেন না, তাহা হইলে তিনি একালের ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের দলভুক্ত হইতেন। একালের গ্রন্থ সমালোচকেরা ঐকান্তিক সত্যের প্রতি বড়ই নারাজ।

এই চারটি অংশ, দুটি গদ্যের দুটি পদ্যের, একই ধর্মবিশিষ্ট, কেবল ছন্দের গুণে একটি পদ্য ছন্দের অভাবে একটি গদ্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাদের সৃষ্টি যে-মনে, সে-মন গদ্যলেখকের ও তাত্ত্বিকের, যুক্তি শৃঙ্খলা ও প্রাঞ্জলতার ধাপ ফেলিয়া যে-মন অগ্রসর হইতে অভ্যস্ত।

এখানে একবার অনুজে অগ্রজে তুলনার লোভ সংবরণ করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ

কাব্য তত্ত্বপ্রবন্ধ গল্প যাহাই লিখুন না কেন সর্বত্র তাঁহার কবিধর্ম ফুটিয়া বাহির হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ কাব্যেও তাত্ত্বিক, রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বেও কবি। রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবির গদ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথের পদ্যের বুনন যেমন গদ্যাত্মক, রবীন্দ্রনাথে ঠিক তাহার বিপরীত, তাঁহার গদ্য পদ্যাত্মক। সংস্কৃত অলংকার ও ইংরেজী বাক্যের প্যাটার্নে রবীন্দ্রনাথের গদ্য গঠিত, দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্য অতিশয় অলংকারবিরল, আর তাহার প্যাটার্নটা একেবারেই দেশী রকম, কিছু চলিত বাংলা ইডিয়ম. কিছু সংস্কৃত ভাষ্যের গদ্যরীতি। আবার দুজনের প্রতিভার ধর্মও ভিন্ন, একজন শৃঙ্খলা, যুক্তি ও প্রাঞ্জলতার পথিক, অপরজনে এসব গুণ তেমন লক্ষণীয় নয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ একটি রূপককে কাব্যে পরিণত করিয়াছেন, আর রবীন্দ্রনাথ রূপকের আঙ্গিকের কাছে কখনো সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ একই বাড়ির এ-বারান্দা ও-বারান্দার অধিবাসী ; এমন ক্ষেত্রে আশা করা অন্যায় নয় যে, অগ্রজ প্রভূত পরিমাণে অনুজকে প্রভাবিত করিবেন। কিন্তু তেমনটি যে ঘটে নাই তাহার কারণ, দুয়ের প্রতিভার ঐকান্তিক পার্থক্য। অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ জ্যোতিষ্ক বিহারীলাল প্রতিভার সাধর্ম্য হেতু রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রকাব্যের সুবাদে বিহারলাল স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, আর অধিকতর শক্তিমান্ দ্বিজেন্দ্রনাথ চিরকালই বিস্মৃতির ধার ঘেঁষিয়া রহিয়া গেলেন। এমন যে হইয়াছে তাহার কারণ, দ্বিজেন্দ্রনাথের পূবাপর নাই ; জীবনের ক্ষেত্রের ন্যায় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অনেক সময়ে উত্তরপুরুষ পূর্বপুরুষকে স্মরণীয় করিয়া রাখে। উত্তর পুরুষহীন সাহিত্যিক সত্যই ভাগ্যহীন, দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই দলের একজন। অনেকে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যকে একখণ্ড দ্বীপ বলিয়াছেন। আমি তো বলি দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজেই একখণ্ড দ্বীপ। প্রাচীন ধারার সঙ্গেও তাঁহার যোগ ছিন্ন, আবার নূতন ধারার সঙ্গে যোগ গড়িয়া ওঠে নাই, আবার তৎকালে প্রচলিত রীতিনীতিরও তিনি বড় ধার ধারেন না। তাঁহার উত্তরপুরুষ নাই বলিয়াছি, কিন্তু তাঁহার পূর্বপুরুষই বা কে? মাইকেল, ঈশ্বর গুপ্ত, ভারতচন্দ্র কাহারও সঙ্গে তাঁহার শক্তির সাধর্ম্য আছে কি? পূর্বাপরহীন তিনি নিঃসঙ্গ একক, দ্বীপখণ্ড বলিলেও যথেষ্ট বিচ্ছেদ বোঝায় না, জলের তলে মাটির সঙ্গে তাহা যুক্ত। দ্বিজেন্দ্রনাথ যেন গ্রহান্তরের উল্কাখণ্ড পৃথিবীর জীবনের মধ্যে নিতান্তই প্রক্ষিপ্ত।

আমার সিদ্ধান্ত এখন দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষাতেই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

আমি চিরকাল স্বদেশী। বিদেশী পোষাক-পরিচ্ছদ ভাব-ভাষা আমার দু-চক্ষের বালাই। এই জন্য অনেক সময়ে আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার

মতের বিরোধ হইয়াছে।…আমি গোড়া থেকেই সেই স্বদেশী culture ধরিয়া বসিয়া আছি; ঘরের মধ্যেই বসিয়া আছি…কখনও আমি বাড়ীর বাহিরে কোন একটা বড় কাজ করিতে পারিলাম না। বক্তৃতা দিলাম, কিন্তু কাহারও মন ভিজিল না।…দেখ, একরকম স্বদেশী আমাদের দেশের ফ্যাশান হইয়াছিল। কিন্তু তাহার মধ্যে একটা বিলাতি গন্ধ ছিল। রঙ্গলালই বল আর রাজনারায়ণবাবুই বল, তাঁহাদের Patriotism বার আনা বিলাতি চার আনা দেশী। ইংরেজ যেমন patriot আমিও সেই রকম patriot হব, এই ভাবটা তাঁদের মনে খুব ছিল। বল দেখি আমি তোমার মত patriot হইব কেন? আমি আমার মত patriot হইতে না পারিলে কি হইল?

আত্মপ্রতিষ্ঠায় তাঁহার কিছুমাত্র আগ্রহ থাকিলে দ্বিজেন্দ্রনাথ 'আমার মত patriot' না হইবার চেষ্টা করিয়া 'তোমার মত patriot' হইতেন, কারণ সংসারে ভেজাল জিনিস যেমন চলে আসল তেমন চলে না। কালের সহিত আপস করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তিনি আপস করিলেন না, কাল-জাহ্নবী নূতন পথে চলিয়া গেল; তিনি শুকনা বালুর চড়ায়, শূন্য প্রান্তরে একাকী পড়িয়া রহিলেন; তবে পুরাতন সেই শ্বেতপাথরের ঘাটটি দেখিয়া অনুমান করিতে পারা যায় যে, একসময়ে এ কূলেই নদী বহিত, এখন সব পরিত্যক্ত।

হিন্দুমেলা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

> নবগোপাল একটা ন্যাশানাল ধুয়া তুলিল; আমি আগাগোড়া তার মধ্যে ছিলাম। সে খুব কাজ করিতে পারিত; কুস্তি জিমন্যাস্টিক প্রভৃতির প্রচলন করার চেষ্টা তার খুব ছিল; কিন্তু কি রকম কি হওয়া উচিত, সে-সব পরামর্শ আমার কাছ থেকে লইত। একটা মেলা বসাইবার কথা বলিল, তাঁতি কামার কুমোর ইত্যাদি লইয়া। আমি বলিলাম—ওসব তো দেশের সকলের জানা আছে; দেশী painting দেখাতে পার? মেলার ক্ষেত্রে গিয়া দেখি, প্রকাণ্ড ছবি। ব্রিটানীয়ার সম্মুখে ভারতবাসী হাতজোড় করিয়া বসিয়া আছে। আমি বলিলাম, 'উল্টে রাখ উল্টে রাখ; এই তুমি দেশী Painting করাইয়াছ? আর আমাদের ন্যাশনাল মেলায় এই ছবি রাখিয়াছ?' ছবিখানা সরাইয়া উল্টাইয়া রাখা হইল।

ব্রিটানিয়ার সম্মুখে ভারতবাসীকে করজোড়ে বসাইয়া ছবি আঁকিতে সেকালের পেট্রিয়টদের বাধিত না, পেট্রিয়ট না হইয়াও দ্বিজেন্দ্রনাথের বাধিত। এই গেল সেকালের সঙ্গে প্রভেদ। একালের সঙ্গেও যে খুব বেশী মিল এমন মনে করিবার

কারণ নাই। একালের আমরা ব্রিটানিয়াকে সিংহাসনে বসাইয়া ছবি আঁকিতাম না সত্য, কিন্তু সেই সিংহাসনে ভারতমাতা যে বসিতেন তাহাতে ভুল নাই। ইহাও তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না, কারণ তাঁহার মতে ইহাও 'আমার মত patriot' হওয়া নয়, 'তোমার মত patriot' হওয়ারই রকমফের। শকুন্তলা যদি ভেনাসের ভঙ্গীতে দাঁড়ায় তবে সে ভেনাসই হইল, ভারতমাতা যদি ব্রিটানিয়ার ভঙ্গীতে বসে তবে সে ব্রিটানিয়াই হইল—এই ছিল দ্বিজেন্দ্রনাথের অভিমত, ইহাকেই তিনি বলিতেন 'তোমার মত patriot' হওয়া। সেদিনের মত ছবিখানা উল্‌টাইয়া রাখা হইয়াছিল বটে কিন্তু এতাবৎকাল রূপান্তরে সেই ছবিই চলিল, অচল হইলেন তিনি নিজে। পরবর্তী কাল কালদ্রোহী দ্বিজেন্দ্রনাথের ছবিখানাই উল্‌টাইয়া রাখিয়াছে। এই জন্যই যুগজীবনে তাঁহাকে নিতান্ত প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। এ হেন বিচিত্র লোক বিচিত্র কাব্য স্বপ্নপ্রয়াণের স্রষ্টা—দুই ই নিজ নিজ পরিবেশে প্রক্ষিপ্ত।

৪

পূর্ববর্তী সমালোচকগণ স্বপ্নপ্রয়াণ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়া গিয়াছেন, আর অল্পই বাকি আছে, সেইটুকু আমি গুছাইয়া বলিতে চেষ্টা করিব।

প্রিয়নাথ সেন স্বপ্নপ্রয়াণের সঙ্গে স্পেন্সারের ফেয়ারী কুইন ও বানিয়ানের পিল্‌গ্রিম্‌স প্রোগ্রেসের তুলনা করিয়াছেন। আমার মনে হয়, আর একখানি মহাকাব্যের সঙ্গে ইহার তুলনা করা চলে—সেখানি দান্তের ডিভাইন কমেডি। অবশ্য কাব্যোৎকর্ষের বিচারে তিনখানির কোনটির সঙ্গেই স্বপ্ন প্রয়াণের একাসন নয়। আবার তিনখানির কোনটির দ্বারা দ্বিজেন্দ্রনাথ সচেতন ভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন এমন প্রমাণও নাই। তৎসত্বেও দুখানির সঙ্গে যদি তুলনা চলে, তৃতীয় খানির সঙ্গে না চলিবার কারণ নাই। পূর্বোক্ত কাব্য দুখানির সঙ্গে স্বপ্নপ্রয়াণের মিল যদি আকস্মিক হয়, তৃতীয়খানির সঙ্গেও তাই। কিন্তু তৃতীয়খানির সঙ্গে আকস্মিক মিল বহুলাংশে যেন অকস্মাতের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। ডিভাইন কমেডির নায়ক স্বয়ং দান্তে। তাঁহার পথপ্রদর্শক মহাকবি ভার্জিল। তাঁহার পরিচালনায় দান্তে নরক ও Purgatory-র যাবতীয় রহস্য দর্শন করিয়া অবশেষে বিয়াত্রিচের নেতৃত্বে বৈকুণ্ঠলোকে উপনীত হইলেন। এখানে তাহারই অনুরূপ। এখানে নায়ক কবি, পথপ্রদর্শক অন্য কোন কবি নয়, স্বয়ং কবিকল্পনা। তাঁহার

পরিচালনায় কবি মনোরাজ্যে প্রবেশ করিয়া নন্দনপুর, বিলাসপুর, বিষাদপুর, রসাতল, সমরপুর ভ্রমণ করিয়া অবশেষে শান্তিপুরে পৌছিয়া সপ্তস্বর্গে সপ্তস্বর্গ ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়াছেন। ডিভাইন কমেডি শান্তিময় প্যারাডাইসে এবং স্বপ্নপ্রয়াণ শান্তিময় শান্তিপুরে উপসংহৃত। এই দুই কাব্যে তুলনায় ইহাই একমাত্র হেতু নয়। ডিভাইন কমেডির নায়ক স্বয়ং দান্তে। স্বপ্নপ্রয়াণের নায়ক কবি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কবিটি কে? প্রিয়নাথ সেন বলিয়াছেন—"একজন কবি বা কবিপ্রকৃতি লোক।" আমার ধারণা, স্বপ্নপ্রয়াণের নায়ক স্বপ্নপ্রয়াণের কবি স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রমাণ গ্রন্থমধ্যেই রহিয়াছে। বিলাসপুরের ভূপতি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কবি আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

ভাতে যেথা সত্য হেম, মাতে যেথা বীর;
গুণ-জ্যোতি হরে যেথা মনের তিমির।
নব শোভা ধরে যেথা সোম আর রবি,
সেই দেবনিকেতন আলো করে কবি।

ইহা স্পষ্টতই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের বিবরণ।[৬] এহেন প্রমাণের পরে স্বপ্নপ্রয়াণের নায়কের যথার্থ পরিচয় সম্বন্ধে আর একটা সিদ্ধান্ত করিতে হয়—স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য কবি দ্বিজেন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনী, রূপক ছলে এই কাব্যে তিনি তাঁহার কবিজীবনের বিকাশ বিবর্তন পরীক্ষা ও চরিতার্থতা বিবৃত করিয়াছেন। স্বয়ং কবির নায়কত্ব পর্যন্ত ডিভাইন কমেডির সঙ্গে মেলে। এ মিল আকস্মিক কিংবা অকস্মাতের সীমা-অতিক্রমকারী, সে বিচারের ভার পাঠকের উপর ছাড়িয়া দিয়া দুই কাব্যের অমিলের কথা তুলিব। স্বপ্নপ্রয়াণ লেখকের মানসজীবনের ইতিহাস। ডিভাইন কমেডিতে তৎকালীন ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া মহাকবি দান্তে মোক্ষকামী মানবমাত্রেই ইতিহাস লিখিয়াছেন। ব্যাপকতায়, গভীরতায়, কাব্যোৎকর্ষে দুয়ে তুলনা করাই অসংগত। সে চেষ্টাও করি নাই, কেবল কাঠামোর অতি প্রকট মিলটা দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

৬ সত্য—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেম—হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বীর—বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণ—গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতি—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোম—সোমেন্দ্র নাথ ঠাকুর, রবি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবনিকেতন—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসভবন, কবি—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এবার আর-একটি কথা। নানা কারণে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য স্মরণীয়। মেঘনাদবধ-কাব্যখানিকে বাদ দিলে বাংলাসাহিত্যে ইহাই একমাত্র সার্থক দীর্ঘকাব্য। বাংলা সাহিত্যে ইহাই একমাত্র সার্থক রূপককাব্য। মধুসূদনী কাব্যরীতি ও রবীন্দ্র-কাব্যরীতিকে পাশ কাটাইয়া ইহাই একমাত্র সার্থক বাংলা কাব্য। আবার রসের বিচারেও ইহার স্থান কাব্যরীতি ও ফ্যাশন-পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে অবস্থিত। তাই বলিয়াছি যে, কি বাংলা সাহিত্যে কি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য নানাভাবে স্মরণীয়। এসব কথা অল্পবিস্তর সবাই জানেন, অনেকেই বলিয়াছেন। আরো একটি কারণে ইহার অনন্যসাধারণত্ব আছে বাংলা সাহিত্যে কবিজীবন ও কল্পনার গুরুত্ব এই কাব্যেই প্রথম স্বীকৃত হয়। প্রায় সমসাময়িক সারদামঙ্গল কাব্যেও কবিজীবনের ইতিহাস আছে, কিন্তু কবি সেখানে শিল্পী নয়, সাধক; তাছাড়া "মৈত্রীবিরহ প্রীতিবিরহ সরস্বতীবিরহের" সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়া এমন এক মিশ্ররসের সৃষ্টি করিয়াছে যাহার মধ্যে কবিজীবনকে সঠিকভাবে খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়। কাব্যোৎকর্ষেও দুয়ে ভেদ আছে। সারদামঙ্গলের বর্ণ ও রেখা দুই-ই অস্পষ্ট, স্বপ্নপ্রয়াণ স্পষ্টতায় ও শৈত্যে শ্বেতপাথরের মূর্তি; সারদামঙ্গল কাব্যের নীহারিকা, স্বপ্নপ্রয়াণ শুক্রগ্রহের ন্যায় উজ্জ্বল ও অচপল। রবীন্দ্রনাথের 'কবিকাহিনী'তে কবির অন্তর্জীবনের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু সে কাব্য স্বপ্নপ্রয়াণের পরবর্তী রচনা। কবিজীবনের দ্বন্দ্ব সংগ্রাম ও ইতিহাসকে কাব্যের মুখ্য বিষয়ে পরিণত করা দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি প্রধান কৃতিত্ব। আর নিজের অজ্ঞাতসারে এই কাব্য রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক কাব্য-রীতিতে তিনি নূতন প্রাণ ও বেগ সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন।

তার পরে যখন মনে পড়ে যে, দ্বিজেন্দ্রনাথ কল্পনাকে পথপ্রদর্শিকা করিয়াছেন তখন ওয়ার্ডস্বার্থ-কোলরিজের সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে তাঁহার সাহিত্যতত্ত্বের সমন্ধ প্রকট হইয়া ওঠে। ওয়ার্ডস্বার্থ ও কোলরিজ সর্বপ্রথমে কবি ও কবিকল্পনাকে নূতন পদবী দান করেন। তার আগে কবি শিল্পীমাত্র ছিল, কবিকল্পনা একটি মনোরম বৃত্তিমাত্র ছিল। রোমান্টিক কাব্যের পুরোধাবর্গ কবিকে প্রায় যোগী ও সাধকের পদবীতে উন্নীত করিলেন, আর কবিকল্পনাকে জীবনরহস্যের সারথ্য প্রদান করিলেন। স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে কবি ও কল্পনার সেই নূতন অর্থই আমরা পাই। অবশ্য এ কথা সত্য যে ইহার আগে মধুসূদন 'মধুকরী কল্পনা'কে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু এ 'মধুকরী কল্পনা' রোমান্টিক পুষ্পবনের ভ্রমরী নয়, অষ্টাদশ শতকের কাঁচি-ছাঁটাই সযত্নলালিত উদ্যানের সঙ্গেই তাহার পরিচয়। পরবর্তী

কালের রবীন্দ্রনাথের 'কবিতাকল্পনালতা'র সঙ্গেই স্বপ্নপ্রয়াণের কল্পনার আত্মীয়তা। আমাদের দেশে মুখ্যতঃ রবীন্দ্রনাথের কল্যাণেই শিল্পীকবি সাধক ও প্রফেট-এ পরিণত হইয়াছে, আর কবিকল্পনা জগৎ ও জীবনের যাবতীয় রহস্যে প্রবেশের অধিকার পাইয়াছে। কবি ও কল্পনার নূতন পদবীর প্রথম আভাস স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে। আমার ধারণা সত্য হইলে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের আর একটি গুরুত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। 'রবি' উদয়ের আগে যে অরুণাভা নূতন প্রভাতের ইঙ্গিত বহন করে, স্বপ্নপ্রয়াণে সেই ইঙ্গিত পাই। এই কাব্য 'প্রভাতসংগীতে'র পূর্ববর্তী 'ব্রাহ্মমুহূর্তের সংগীত'; স্বপ্নভঙ্গ হইবার পূর্বতন অবস্থায় এখানে আমরা নবকাব্যের নির্ঝরকে যেন দেখিতে পাই।

৫

রূপক কাব্য যতই প্রাঞ্জল হোক, কাহিনীকাব্যের প্রাঞ্জলতা কখনো পাইতে পারে না। যুগপৎ কাহিনী ও রূপক চালনা করিতে গেলে জটিলতা ও অর্থভেদ অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। কখনো সে জটিলতা ফেয়ারী কুইন-এর দুর্গমতায় পরিণত হয়, কখনো অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল। স্বপ্নপ্রয়াণের গতি সরল, বিন্যাস প্রাঞ্জল আর তাহাতে অর্থান্তরেরও বিশেষ স্থান নাই। তবু রূপক কাব্যে যেটুকু দুরূহত্ব অনিবার্য তাহা অবশ্যই আছে। ইহারই সমাধানমানসে কবি প্রত্যেক সর্গের প্রারম্ভে দুই-চার ছত্র গদ্য সূচনা যোগ করিয়া দিয়াছেন আমরা সেগুলিকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া দিতেছি, তাহাতে সমগ্রের অর্থবোধে সাহায্য হইতে পারে।

প্রথম সর্গ। মনোরাজ্যপ্রয়াণ। সূচনা। স্বপ্নের কুহক। মনোরথ যাত্রা। অনেকদিন পরে কল্পনার দর্শন-প্রাপ্তি।

দ্বিতীয় সর্গ। নন্দনপুরপ্রয়াণ। সূচনা। কবির বাল্যকালের আনন্দ-নিকেতন। কবি বাল্যকালে চিত্রকর্ম, সংগীত এবং প্রকৃতির শোভা লইয়া যেরূপ আনন্দে থাকিত, পুনর্বার সেই সকল পুরাতন কাহিনীর সহিত আলাপ-পরিচয়। সাত্ত্বিকা (সত্ত্বগুণ) কবিকে পথ দেখাইয়া মায়া-মমতার সন্নিধানে লইয়া গেল। রাজসী (রজোগুণ) কবির মনকে কল্পনার পথে প্রধাবিত করিল। তামসী (তমোগুণ) কবির মনকে বিষাদের হ্রদে ডুবাইয়া দিল। কল্পনার তিন সখী—সুরুচি মাধবী, শরৎশ্রী। সুরুচি কিনা কাব্যরসাস্বাদনশক্তি—রসজ্ঞতা। মাধবী কিনা বাসন্তী ভাব—মাধুর্যগুণ। শরৎশ্রী কিনা শারদীয় ভাব—প্রসাদগুণ।

তৃতীয় সর্গ। বিলাসপুরপ্রয়াণ সূচনা। নৌকায় করিয়া বিলাসপুর যাত্রা। সখ্যরস প্রমোদ রাজার সভার মাঝখানে কবিকে অতিরিক্ত বাড়াইয়া তুলিয়া তাঁহাকে লজ্জায় ফেলিল। প্রমোদ যখন বাল্যকালে নন্দনপুরে কবির সঙ্গে খেলাধুলা করিত তখন সে নন্দনপুরের প্রমোদ ছিল (অর্থাৎ নির্দোষ আমোদ ছিল) এখন সে বিলাসপুরের প্রমোদ। তাই তার সংসর্গদোষে কবি লালসানাম্নী আদিরসের প্রাণবল্লভার কুহকে পড়িয়া এবং হাস্যরসের নষ্টামির দায়ে পড়িয়া কল্পনাকে হারাইল এবং সেই খেদে পাগলের মত হইয়া ভ্রমিতে ভ্রমিতে বিলাসপুর হইতে বিষাদপুরে গিয়া পড়িল। সভার মাঝখানে প্রমদা হরণ হইল—এ ঘটনাটিও কবির দুঃখানলে আহুতি দিল।

চতুর্থ সর্গ। বিষাদপুরপ্রয়াণ। সূচনা। কবি বিলাসপুর ছাড়াইয়া বিষাদ পুরের অন্তঃপাতী বিষাদারণ্যে গিয়া পড়িল। নানাপ্রকার খেয়াল দেখিতে লাগিল। আধিব্যাধি কর্তৃক ধৃত হইল। কবি বিষাদপুরের রাজা হাহা হুহু গন্ধর্বের নিকট নীত হইল এবং জাড্যের (অর্থাৎ তামসিক জড়তার) বিচারে সমর্পিত হইল। অবশেষে রসাতলে প্রেরিত হইল।

পঞ্চম সর্গ। রসাতলপ্রয়াণ। সূচনা। জাড্যের (অর্থাৎ আলস্যের) ভক্ত অনুচর আধিব্যাধি কবিকে রসাতলপতি ভয়ানক-রসের নিকটে সঁপিয়া দিল। ভয়ানক রস পুরোহিতকে ডাকিয়া চামুণ্ডা দেবীর সম্মুখে কবিকে বলিদান দিতে আদেশ করিল। ইতিমধ্যে ভৈরব নামক একজন করালমূর্তি কাপালিক (যিনি ভয়ানক রস অপেক্ষাও ভয়ানক) তিনি হঠাৎ সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া আপনি কবিকে বলি দিবার মানসে শ্মশানে লইয়া গিয়া একটা অশ্বত্থ গাছের গায়ে বাঁধিয়া রাখিলেন। করুণা দেবী আসিয়া কাপালিকের হস্ত হইতে কবিকে এবং অত্যাচারের হস্ত হইতে প্রমদাকে উদ্ধার করিলেন।

ষষ্ঠ সর্গ। সমরপ্রয়াণ। সূচনা। বীর আর ভয়ানক এই দুই রসের অধীনস্থ দুই দল সৈন্যের তুমুল সংগ্রাম। ভয়ানক রসের পরাজয়। দুর্ভিক্ষের সহিত দাক্ষ্যের, মারীর সহিত স্বাস্থ্যের, হিংসার সহিত মৈত্রের, অত্যাচারের সহিত কৌশলের, ভয়ানকের সহিত বীরের দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

সপ্তম সর্গ। শান্তি-প্রয়াণ। সূচনা। রণাবসানে হত এবং আহতে সমাকীর্ণ রণক্ষেত্র দেখিয়া কবির বৈরাগ্য উদয়। করুণার প্রসাদে সুসঙ্গ লাভ। শমদমের আশ্রমে গমন। পাশব বৃত্তিসকলের উচ্ছেদ। সাধুসম্মিলন এবং দেবসম্মিলন। শুভপরিণয়। নিদ্রাভঙ্গ এবং স্বপ্নাবসান।

৬

কবি-প্রদত্ত এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতি হইতে স্বপ্নপ্রয়াণ-তত্ত্ব উদ্ধার করা যায় কি না দেখা যাক।

স্বপ্নাবিষ্ট কবি কল্পনার সারথ্যে মনোরাজ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই নন্দনপুরে উপস্থিত হইলেন। নন্দনপুরকে aesthetic-লোক মনে করিলে ভুল হইবে না। কল্পনার বিবর্তনে বা বিকাশে মানুষ প্রথমে aesthetic জগতে আসিয়া পৌঁছায়। এখানে পথ বাছিয়া লইতে হয়। নন্দনপুরকে যে মানুষ চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করে সে কলাকৈবল্য বা art for art's sake তত্ত্বকে শিল্পের উদ্দেশ্য মনে করে। মনে করিলেই ভ্রান্তি ও দুঃখ। কবি সেইরূপ মনে করিবার ফলে নানারূপ দুঃখ, পথভ্রান্তি ও পরীক্ষায় পড়িয়াছেন। এবং এইরূপ মনে করিবার ফলে ভুল পথ ধরিয়া নন্দনপুরের গা ঘেঁষিয়া যে বিলাসপুর অবস্থিত কবি সেখানে গিয়া পৌঁছিয়াছেন। আর তাহার অনিবার্য পরিণাম তাঁহাকে ভুগিতে হইয়াছে। বিলাসপুরের অধীশ্বর প্রমোদ। প্রমোদরাজের প্রভাবে "লালসা নাম্নী আদিরসের কুহকে পড়িয়া এবং হাস্যরসের নষ্টামির দায়ে পড়িয়া কল্পনাকে" কবি হারাইয়াছেন। এবারে তাহার দুঃখের পালা শুরু। কল্পনাকে হারাইয়া কবি পথ হারাইয়াছেন, তার উপরে লালসা ও হাস্যরসের নষ্টামির ফলে কবি সোজা বিষাদপুরে যাইতে বাধ্য হইলেন। "কবি বিষাদপুরের রাজা হাহা হূহূ গন্ধর্বের নিকটে নীত হইল এবং জাড্যের (অর্থাৎ তামসিক জড়তার) বিচারে সমর্পিত হইল।" অবশেষে কবি রসাতলে গেলেন। এখানে বলিদানের পূর্বমুহূর্তে তিনি করুণা দেবীর কৃপায় উদ্ধার পাইলেন। পরে সমর-প্রয়াণ। এখানে বীর ও ভয়ানক রসের সৈন্যদলের মধ্যে সংগ্রাম হইয়া ভয়ানক রসের পরাজয় ঘটিল। এবং বীর কর্তৃক কবি শান্তিপুরে নীত হইলেন। শান্তিপুরের নৃপতি আনন্দ। আনন্দ ও সাধুসঙ্গের কল্যাণে কবির সহিত কল্পনার মিলন ঘটিল, আর সে মিলন বিবাহবন্ধনে পরিণত হইল। সেই সঙ্গে আরো দুটি বিবাহ হইল।

আনন্দভূপ বলিলেন—

হও এস সংসারধরমে ব্রতী
কবি, বীর, কল্যাণ, ডাহিন দিকে দাঁড়াও সম্প্রতি।
প্রমদা ললনা
শোভা, কলপনা,
এস মোর পারবতী লক্ষ্মী সরস্বতী।

প্রমদার সহিত বীরের, শোভার সহিত কল্যাণের ও কবির সহিত কল্পনার বিবাহ হইয়া গেল—আনন্দনৃপতি তিনে এক কন্যাকর্তা।

বীরত্ব ও কল্যাণকে কবির বিভূতিদ্বয়রূপে এবং প্রমদা (আনন্দদানশক্তি) ও শোভাকে (সৌন্দর্য) কল্পনার বিভূতিদ্বয়রূপে দেখা চলিতে পারে। কাহিনী-বিন্যাসের খাতিরে তাহাদের স্বতন্ত্র করিয়া দেখানো হইলেও তাহারা আসলে অভিন্ন। ভ্রান্তি ও ভ্রান্তিজনিত দুঃখের ফলে কবি কল্পনাকে হারাইয়াছিলেন বটে; কিন্তু অবশেষে দুঃখের তপস্যার অবসানে তিনি কল্পনাকে উজ্জ্বলতর রূপে লাভ করিলেন। নন্দনপুরে যাহাকে হারাইয়াছিলেন আনন্দপুরে তাহার সহিত পুনর্মিলন ঘটিল। Aesthetic-লোকে অপহৃত ধনকে আনন্দলোকে ফিরিয়া পাইলেন, বীর্যে ও কল্যাণে চরিতার্থ কবি সৌন্দর্যরূপিণী ও আনন্দদায়িনী কল্পনাকে পাইয়া চরিতার্থ হইলেন। ইহাই স্বপ্নপ্রয়াণের তত্ত্ব।

নন্দনপুর পর্যন্ত যে কল্পনাকে দেখিয়াছি তাহা কবিকল্পনামাত্র, কিন্তু শান্তি-পুরে যে কল্পনাকে দেখিলাম তাহার সংজ্ঞা ও সার্থকতা ব্যাপকতর, সে আর কবির আরাধ্য ধন মাত্র নয়, যোগী জ্ঞানী সাধুসঙ্গ মনুষ্য মাত্রেরই ধ্যানের ধন, তাহার অভাবে মনুষ্যজীবন অন্ধ ও অকর্মণ্য। নন্দনপুরের কলাকৈবল্য হইতে আমরা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, এখন আর art for art's sake নয়, এখন art for life's sake-এ দাঁড়াইয়াছে। প্রিয়নাথ সেন যথার্থই বলিয়াছেন—

> পরমার্থের সঙ্গে সৌন্দর্যকে গ্রথিত করিয়া হিন্দু কবি কাব্যকে অশেষ এবং অসীমের দিকে প্রসারিত করিয়াছেন।…এক কথায় কবি সুনিপুণ চারণ বৈজ্ঞানিকের মত মানবহৃদয়কে বিশ্লেষণ করিয়া মানবজীবনের ক্ষেত্রেও জটিলতা এবং উচ্চতর গভীরতা দেখাইয়াছেন। তাহাতে কাব্যচর্চার নিজ ক্ষেত্র অনেক দূর অতিক্রম করা বা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।[৭]

স্বপ্নপ্রয়াণের কাব্যসৌন্দর্যের চেয়ে তাহার তত্ত্বের গভীরতা কম নয়, কিন্তু এ পর্যন্ত তত্ত্ববিচারের দিকে তেমন মন দেওয়া হয় নাই, কেবল প্রিয়নাথ সেনের রচনাটিতে কিছু পরিচয় আছে। দুঃখের কথা এই যে, রচনাটি অসমাপ্ত, সমাপ্ত হইলে সম্ভবতঃ স্বপ্নপ্রয়াণের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইত।

[৭] প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি, পৃ ২৬৩-৬৪

৭

নব্য বাংলা কাব্যসাহিত্যে মেঘনাদবধ-কাব্যই একমাত্র মহৎ ও দীর্ঘাঙ্গ কাব্য, আপন গঠনসৌকর্যের বলে যাহা দণ্ডায়মান। সর্গের সহিত সর্গ গ্রথিত হইয়া, ঘটনার সহিত ঘটনা যুক্ত হইয়া অভ্রান্ত লক্ষ্যে ও অমন্থর গতিতে তাহা চরম পরিণামের দিকে চলিয়াছে, সুচালিত ও সুশিক্ষিত সৈন্যব্যূহের সঙ্গে ইহার সার্থক তুলনা চলিতে পারে। এই প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের বৃহৎ কাব্যগুলির আলোচনা করিতে চাই না, যেহেতু দেশে এখনো তাঁহাদের কিছু কিছু গুণগ্রাহী ব্যক্তি আছেন। কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে অন্তর্নিহিত অনিবার্য কোন নিয়মের দ্বারা তাঁহাদের কাব্যগুলি নিয়ন্ত্রিত নয়—ওসব যেন নিলামে-কেনা বস্তাবন্দী মাল, বাঁধনটা নিতান্তই বাহিরের, ভিতরের বস্তুও পাঁচ দোকান ঘুরিয়া সংগৃহীত। স্বপ্নপ্রয়াণের architectonic বা গঠনসৌকর্য অসাধারণ। মেঘনাদ-বধ-কাব্যের চেয়ে স্বপ্নপ্রয়াণের কৃতিত্ব কম নয়, যেহেতু মেঘনাদবধ-কাব্য একটি সুপরিচিত কাহিনীর নেতৃত্ব পাইয়াছে, পথভ্রষ্ট হইবার বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা তাহার ছিল না। কিন্তু স্বপ্নপ্রয়াণে নেতৃত্ব করিয়াছে একটি তত্ত্ব—সে নিজেই ছায়াময়, অলক্ষ্যপ্রায় তাহার গতিবিধি, তৎসত্ত্বেও কবি যে পথ হারান নাই, শেষ পর্যন্ত যথাকালে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার অসীম মনীষা ও শিল্পশক্তি প্রকাশ পায়। এই কার্যে সহায় তাঁহার অসামান্য সংযম। যেখানে একটি বিশেষণে চলে সেখানে দুটি তিনি ব্যবহার করেন না, একেবারে না হইলে চলে কিনা সেই দিকে তাঁহার নজর। অযথা শব্দপ্রয়োগ ও ঘটনাবিস্তার তাঁহার দু চক্ষের বিষ। কাব্যের প্রতিটি সর্গ ছন্দ নৌকার মত হালকা ও তীব্রগতি, সম্পূর্ণ অবান্তরতা-বর্জিত। অথচ যখন মনে পড়ে যে, লৌকিক ও কিম্ভূত সৌন্দর্যসৃষ্টিতে তাঁহার বিপুল দক্ষতা, তখনই আরো সম্যকরূপে বুঝিতে পারি পদে পদে কি আত্মসংযম না তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। এদিকের বিচারে স্বপ্নপ্রয়াণ যথার্থ ক্লাসিক রীতির শিল্প। অন্যদিকে কল্পনার deification-এ বা দৈবীকরণে ইহা আবার বাংলা রোমান্টিক কাব্যের পূর্বসূত্র বটে। শিল্পাংশে ক্লাসিক রীতি এবং কাব্যাংশে রোমান্টিক রীতিকে অনুসরণ করিয়া স্বপ্নপ্রয়াণ যে নূতন কাব্যধারা সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছিল, যোগ্য উত্তরপুরুষের অভাবে তাহা অসম্পূর্ণ ও অচরিতার্থ অবস্থায় পড়িয়া আছে। স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিলে এই ধারাকে হয়তো সার্থকতায় পৌঁছাইয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু সেই যে তিনি শান্তিপ্রয়াণ-অন্তে তত্ত্বপ্রয়াণ করিলেন, নূতন কাব্যপ্রয়াণ আর তাঁহার দ্বারা হইয়া উঠিল না।

কল্পনা যতদিন তাঁহার কাছে পরকীয়া ছিল তাহাকে অনুসরণ করিয়াছেন, স্বকীয় হইবার পরে তিনি আর তাহার প্রতি ফিরিয়া তাকান নাই। কি বিড়ম্বনা!

৮

স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের শিল্পকুশলতা ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে পূর্বোক্ত সমালোচকগণ প্রায় সব কথাই বলিয়াছেন ও উদাহরণযোগে নিজেদের বক্তব্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ দৃষ্টান্ত উদ্ধারের প্রয়োজন ছিল না, 'এলডোরাডো'র পথে সোনা-মানিকের ছড়াছড়ির ন্যায় বিচিত্র সৌন্দর্যে স্বপ্নপ্রয়াণের পথঘাট আকীর্ণ। সে সব এতই প্রচুর যে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইবার আবশ্যক হয় না। দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন সৌন্দর্যসৃষ্টিতে ইচ্ছা করেন তখন তাঁহার প্রতিভায় যেন বান ডাকে, আর সেই বানের মুখে কত দূরদূরান্তের স্বপ্নকুসুম ভাসিয়া আসে, যেমন ঐশ্বর্য তেমনি প্রাচুর্য। স্বপ্নপ্রয়াণ গ্রন্থের যে কোন পত্র ইহার সাক্ষ্য দিবে। সত্য বলিতে কি, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস, নব্য বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এ বিষয়ে আর কেহ তাঁহার সমকক্ষ নয়। এত সৌন্দর্য একখানি কাব্যে বাংলা সাহিত্যে বিরল।

সৌন্দর্যসৃষ্টির পরেই লক্ষণীয় তাঁহার সাজসজ্জা ও ভাষা-ব্যবহার-কৌশল। স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে বাংলা ভাষা ও ইডিয়ম ব্যবহারের নৈপুণ্য এ যুগের পাঠককে বিস্মিত করিয়া দেয়। এক-একবার আচমকা মনে হয়, এই বুঝি যথার্থ বাংলা ভাষা, কিন্তু হায় 'সে ভাষা ভুলিয়া গেছি।' শ্রীকানাই সামন্ত দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "সে বাংলাদেশ নাই, সে বাঙালী জাতিকেও চেনা যায় না" চেনা যে যায় না তাহার প্রধান কারণ স্বপ্নপ্রয়াণ-রচনাকালে ভদ্রেতর বাঙালী যে ভাষা বলিত এখন তাহা বলে না। ইংরেজী শিক্ষা আমাদের মুখ হইতে মাতৃভাষা কাড়িয়া লইয়াছে। তাহার বদলে যাহা পাইয়াছি তাহা হয়তো অধিকতর ঐশ্বর্যময়, কিন্তু অকৃত্রিম বাংলা যে নয় সে কথা সুনিশ্চিত। দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

> আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে মনে যদি এমন কোনও ভাব উদিত হয়, যাহা প্রকাশের উপযুক্ত খাঁটি দেশী ভাষায় প্রকাশ করা যায়, তাহাকে প্রকাশের জন্য বিদেশী idiom-এ অনুবাদ করিতে যাইব কেন? আমি কখনো ওপথ মাড়াই নি। আমার লেখার এই বিশিষ্টতা আর কেহ বুঝিতে পারিবে কিনা জানি না, কিন্তু কৃষ্ণকমল পারিবে।

কিন্তু কৃষ্ণকমলের মত বিশেষজ্ঞও যে বিরল, কাজেই সে ভাষা এখন প্রায় দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের এই ভাষান্তর, ভাষা-ভাগীরথীর ভিন্ন পথ গ্রহণ, দু-চার কথায় সারিবার মত নয়। বাংলা সাহিত্য আলোচনাপ্রসঙ্গে ইহার বিস্তারিত বিচার আবশ্যক। স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের জনপ্রিয়তার অভাবের অন্যতম কারণ, ইহার ভাষার এই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ইহা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হওয়া উচিত নয়। একটু আয়াস স্বীকার করিলে পাঠক অগণিত মণিমাণিক্যের খনির সন্ধান পাইবেন। এ যুগে বাংলাদেশে যে-কয়জন ক্ষুরধার মেধাবিশিষ্ট মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, logical mind-এর চূড়ান্ত বিকাশ যাহাদের মধ্যে হইয়াছে, দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই মুষ্টিমেয়দের অন্যতম। এ হেন ব্যক্তির হাতে স্বপ্ন ও তত্ত্বের টানাপোড়েনে রচিত এই বিচিত্র কাব্য বাংলা সাহিত্যে সত্যই এক বিস্ময়ের বস্তু। মেঘনাদবধ-কাব্যের মতই ইহা প্রকৃত উত্তরপুরুষের সৌভাগ্য বঞ্চিত। কিন্তু ইহাদের অমরত্বের জন্য উত্তরপুরুষের সাহায্যের প্রয়োজন আছে এমনই বা মনে করিব কেন? অবশ্য মেঘনাদবধ-কাব্যের অকৃতার্থ উত্তরপুরুষের অভাব নাই, সেই সব অপদার্থ সৃষ্টি না হইলে মেঘনাদবধ-কাব্যের নিঃসঙ্গ মহিমা অধিকতর প্রকট হইত। স্বপ্নপ্রয়াণের অকৃতার্থ উত্তরপুরুষেরও অভাব—সমস্ত কৃতার্থতা নিজের মধ্যে সংহত করিয়া এই বিচিত্র বিস্ময় আপনাতে আপনি অটল হইয়া বিরাজ করিতেছে।

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস

১৮৫৫-১৯১৮

মানুষের মানসজীবনকে বহুগ্রন্থিযুক্ত একটি সুতার সহিত উপমিত করিলে অন্যায় হইবে না। ঐ গ্রন্থিগুলি সংস্কার ; কতকগুলি স্বোপার্জিত, কতকগুলি সহজাত। ঐসব গ্রন্থির ফলেই সুতাটি দৃঢ় হয়, আবার গ্রন্থির আতিশয্যে সুতায় জট পাকাইয়া যাইতে পারে, সুতাটি অকেজো হইয়া পড়ে। গ্রন্থি না থাকিলেও যেমন চলে না, তেমনি আবার সংখ্যায় বেশি থাকিলেও অচল। ঐ গ্রন্থিগুলি অনেকটা জীবদেহে গ্ল্যাণ্ডের অনুরূপ ; জীবদেহ চালাইবার এঞ্জিন স্বরূপ। মানবজীবন গ্ল্যাণ্ডের কর্মতৎপরতার উপরে নির্ভরশীল। মানুষের মানসিক জীবনের উৎকর্ষ ঐসব সংস্কার বা গ্রন্থির উপরে নির্ভর করে।

সাহিত্য শিল্প দর্শন প্রভৃতি মানসজীবনের ফুল ও ফসল বিশেষ-ভাবে ঐ গ্রন্থির ইতিহাসের সহিত যুক্ত। কিংবা আরও একটু জোর দিয়া বলা যাইতে পারে, মানবদেহের উৎকর্ষ যেমন গ্ল্যাণ্ডগুলির কর্মপটুতার উপরে নির্ভর করে, তাহার মানসজীবনের উৎকর্ষ তেমনি নির্ভর করে ঐ সংস্কারগুলির সার্থকতার উপরে!

মানবসমাজে এমন জাতি দেখা যাইবে না যাহার কোন সাহিত্য বা শিল্প নাই। নিতান্ত অসভ্য বলিয়া পরিগণিত জাতিরও সংগীত ও শিল্পকলা আছে। আবার সভ্যতার উচ্চধাপে উন্নীত জাতিরও সাহিত্য ও শিল্পকলা আছে। উভয় ক্ষেত্রেই মানসিক গ্রন্থি বা সংস্কার বর্তমান এবং সেগুলি অল্পাধিক সক্রিয়। কিন্তু এমন যদি কোন ব্যক্তি থাকে (জাতি সম্ভব নয়), যাহার মানসজীবন গ্রন্থিহীন বা সাধনার ফলে গ্রন্থিবিমুক্ত, তবে সে ব্যক্তি সাহিত্য বা শিল্প সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভব করে না। সাধনমার্গের অন্তে উপনীত মহাপুরুষগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যীশু বুদ্ধ চৈতন্য রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সরাসরি সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি করেন নাই। অথচ তাঁহাদের উপদেশাবলীর সরসতা ও বাগ্‌বিভূতি স্মরণ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় সাহিত্য সৃষ্টি-ক্ষমতার প্রাচুর্য তাঁহাদের ছিল। ইহাদের প্রত্যেককে অবলম্বন করিয়া সাহিত্যশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ইঁহারা নিজেরা তাহার অতীত। এমন যে হইয়াছে তাহার কারণ, সাধনার দ্বারা মানসিক গ্রন্থিগুলি তাঁহারা খুলিয়া ফেলিতে সক্ষম হইয়াছেন। যে যন্ত্র সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি করে, তাঁহারা সেই যন্ত্রের অতীত হইয়া গিয়াছেন।

নিতান্ত অসভ্য জাতি বা মানবসভ্যতার চূড়ায় অধিষ্ঠিত মহাপুরুষ আমাদের প্রসঙ্গ নয়। সভ্যসমাজের অন্তর্গত যে মানুষ সাহিত্য সৃষ্টি করে আমাদের আলোচ্য সেই লোক। এখানে একটা তর্ক উঠিতে পারে, সভ্যসমাজের সকল মানুষেরই মানসজীবনে যদি গ্রন্থি থাকে তবে সকলেই সাহিত্যিক বা শিল্পী হয় না কেন? হয় না কে বলিল? সক্রিয়ভাবে হয় না এই পর্যন্ত। একজন লোক কবিতা লেখে না বটে, কিন্তু কবিতার রস গ্রহণ করিতে পারে। ঐ রসগ্রহণ-ক্ষমতাই প্রমাণ করে যে তাহার মানসজীবন গ্রন্থিমুক্ত নয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রন্থি সক্রিয়, কোন কোন ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ। তাছাড়া, সক্ষম সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি আরও কয়েকটি অবস্থার উপরে নির্ভর করে। শিক্ষা ও পরিবেশ তন্মধ্যে। মূল প্রেরণা যোগায় ঐ সংস্কার। শিক্ষা ও পরিবেশ আনুষঙ্গিক, স্রোতের টানের আনুষঙ্গিক যেমন গুণটানা ও পালের হাওয়া, অনেকটা তেমনি আর কি।

সাহিত্য বা শিল্পসম্যক বুঝিবার পক্ষে এই গ্রন্থিগুলির ইতিহাস ও কার্যক্রম বোঝা অপরিহার্য। কোন বিশেষ লেখকের রচনার তাৎপর্য বুঝিবার পক্ষে তাহার মানসজীবনের গ্রন্থিগুলির ইতিহাস বোঝা অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে মনস্তত্ত্ববিদ্যা কতক সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু শেষপর্যন্ত ফ্রয়েডীয় বিচারপদ্ধতির শরণ গ্রহণ ছাড়া উপায় থাকে না, কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রন্থিগুলির মূল অবচেতন মানসে নিহিত। সেখানে নামিতে না পারিলে পুরা হদিস পাওয়া যাইবে কিরূপে? সাহিত্য ও শিল্পের সমালোচনা-পদ্ধতি ক্রমে সেই দিকেই আগাইয়া চলিতেছে মনে হয়।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে এইরূপ একটা গ্রন্থির দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। বঙ্কিম চন্দ্রের প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই একাধিক সন্ন্যাসীর উল্লেখ আছে, অনেক ক্ষেত্রেই তাহারা আবার অতিলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সন্ন্যাসীর উপস্থিতি আকস্মিক নয়, ঘটনার তাগিদে আরোপিত নয়, লেখকের মনের কোন গ্রন্থি বা সংস্কারের অনিবার্য ফল। আমরা ফলটি মাত্র দেখিতেছি, কিন্তু মূল কোথায়? লেখকের কোন্ অবচেতনার মধ্যে? এসব তত্ত্ব পুরা না জানা পর্যন্ত বঙ্কিমী উপন্যাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইতে বাধ্য। শিল্পক্ষেত্রে কেবল শিল্পগত বিচার নিতান্ত একদেশদর্শী। যে রচনা যত রসোত্তীর্ণ, তাহার মূল তত নিম্নগামী। শ্রেষ্ঠ রচনার মূল চেতন মনকে অতিক্রম করিয়া অবচেতন মনে প্রবিষ্ট। অবচেতন মনের ভূগোল না জানিলে শ্রেষ্ঠ রচনার রহস্য জানা যাইবে কি প্রকারে? বঙ্কিমচন্দ্রের সন্ন্যাস-কমপ্লেক্স (এই গ্রন্থিগুলিই কি

কম্প্রেক্স ?) স্বরূপ না জানা পর্যন্ত বঙ্কিমী উপন্যাসের রূপটুকু মাত্র জানা যাইবে, তাহার বেশি নয় ; কিন্তু তাহার বেশিতেই আসল রহস্য।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতেই আরও একটা গ্রন্থির দৃষ্টান্ত লওয়া যাক।

ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাসের[১] জীবন এইরূপ আর-একটি উদাহরণ। তাঁহার জীবনের একটি কূট গ্রন্থি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ত্রিশ বৎসর বয়সে কবির প্রথমা স্ত্রী মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর পরে কবির সমস্ত রচনায় একটি তিক্তা, এক প্রকার জ্বালা, সমস্ত কথায়, বিশেষ নারী-সম্বন্ধীয় কথায়, অত্যন্ত জোর দিয়া উচ্চারণ করিবার অভ্যাস দেখা যায়। এমন আগে ছিল না, এই দুর্বিষহ ঘটনার পরে এটি নূতন আমদানি। বুঝিতে পারা যায় যে, স্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁহার জীবনে যে গ্রন্থি পড়ে তাহার সঙ্গে এই অভ্যাসটি জড়িত। প্রিয়জনের মৃত্যু মাত্রেই দুঃসহ হইতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে কিছু বিশেষ ছিল। সেটি কি ? জানা দরকার। তাঁহার চরিতকার বলেছেন : "গোবিন্দচন্দ্র পত্নীকে শেষ দেখা দেখিলেন বটে, কিন্তু পরস্পর বাক্যবিনিময় আর হইল না। রাত্রি ৮টার সময়ে সারদ সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন (২৬শে নভেম্বর ১৮৮৫)। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গে নানারূপ জনশ্রুতি আছে। কাহারও মতে "তাঁহার মৃত্যু একটা শোকাবহ বাস্তব ঘটনার উপরে প্রতিষ্ঠিত," আবার কেহ কেহ বলেন, "ইহা হইতেই নাকি কবির 'আত্মহত্যা।' কবিতাটির সৃষ্টি।"[২] এই দুর্ঘটনার সঙ্গে যে রহস্যই জড়িত থাকুক না কেন, সেই ঘটনাটি কবির পরবর্তী সমস্ত কাব্যকে ছায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। একদিকে কবির স্বর্গতা প্রেয়সী যেমন দিব্যরূপ লাভ করিয়াছে, আর-একদিকে নারীর উপরে অবিচারকারীদের প্রতি সাধারণভাবে কবির ধিক্কার শতগুণ জ্বালাময় হইয়া উঠিয়াছে।

১ ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস নামে পরিচিত। যথার্থ কবিমাত্রেই স্বভাবকবি, বাকি সকলে অভাব-কবি : কেহ বা কাণ্ডজ্ঞানের অভাবে কবি, কেহ বা অন্য কাগের অভাবে কবি ; কাজেই গোবিন্দ দাসকে বিশেষভাবে স্বভাবকবি বলিবার হেতু নাই, খুব সম্ভব বৈষ্ণব পদাবলীর কবি গোবিন্দদাস হইতে বিশেষ করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে স্বভাবকবি বলা হইয়া থাকে।

২ গোবিন্দচন্দ্র দাস, পৃঃ ১৮। সাহিত্যসাধকচরিতমালা ৭৪। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বারাঙ্গনা-কুলের মনোভাব সম্বন্ধে তাঁহার একটি কবিতা আছে, নাম 'প্রতিহিংসা'। বারাঙ্গনার মুখ দিয়া কবি বলাইয়াছেন—

সেই প্রতিহিংসা বিষ
প্রাণে জ্বলে অহর্নিশ ;
এ তো নহে ভালবাসা প্রেমী প্রেমিকায়।
এ অধরে রক্তহাসি
নহে এ অমৃতরাশি,
তব রক্ত অভিলাষী জানিও ইহায়।
এ মৃদু মৃণালভুজে
শুধু প্রতিহিংসা বুঝে,
এ বন্ধন নাগপাশে বাঁধিতে তোমায়।[৩]

এই কবিতায় তিক্ততার ও জ্বালার যে আতিশয্য তাহা জীবনের কেবল সাধারণ অভিজ্ঞতা বলিয়া মনে হয় না, মনে হয় কোন বিশেষ গ্রন্থির সহিত যুক্ত। সে গ্রন্থি কবির জীবনে কোথায় পড়িয়াছে? সেই গ্রন্থিপাতের বাস্তব রহস্য কি? কিছু যে আছে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এবং সেটি স্ত্রীর মৃত্যুরূপ 'শোকাবহ ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত' হইলে বিস্মিত হইব না। সেটি জানা দরকার।

কবির জীবনের আর-একটি গ্রন্থি, ভাওয়ালের রাজার আদেশে স্বগ্রাম জয়দেবপুর হইতে কবির নির্বাসন। স্ত্রীর মৃত্যু এবং জয়দেবপুর হইতে নির্বাসন, এই দুটি তিক্ত স্মৃতি কবির পরবর্তী সমস্ত রচনাকে দুঃখে তিক্ততায় জ্বালায় এবং সৌন্দর্যে রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। জন্মভূমি ও পত্নী, জন্মভূমির সৌন্দর্য এবং পত্নীর প্রেম—এই দুইটি হইতে অকালে আকস্মিকভাবে শোকাবহভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় কবির মনে যে ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছিল সেই ক্ষতমুখে তাঁহার কবিতা উৎসারিত হইয়াছে, সেইজন্যই তাঁহার কবিতাবলীতে, তা সে যে-বিষয়েই হোক-না কেন, গলন্ত লাভার ন্যায় একপ্রকার অস্বাভাবিক উত্তাপ অনুভূত হয়।

৩ গোবিন্দ-চয়নিকা। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত

২

ভাওয়াল-জয়দেবপুরে ১৮৫৫ সালের ১৬ই জানুয়ারি গোবিন্দচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। কবির জীবন দুঃখের। দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্য আশৈশব তাঁহার সহচর। শৈশব হইতেই ভাওয়াল-রাজপরিবারের অনুগ্রহ লাভ তিনি করিয়াছিলেন। কিন্তু সে অনুগ্রহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। রাজপরিবারের কৃপায় ঢাকা নর্মাল স্কুলে এবং পরে ঢাকায় সদ্যপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা বিদ্যালয়ে তিনি কিছুকাল শিক্ষা করেন। কিন্তু কোন বিদ্যালয়ের পাঠই তিনি চূড়ান্ত গ্রহণ করেন নাই। অবশেষে রাজপরিবারে চাকুরি গ্রহণ করেন। কিন্তু এখানেও শেষ পর্যন্ত তিনি টিকিতে পারিলেন না। কোন ঘটনায় রাজার অবিচার দেখিয়া তিনি কর্ম পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাকে তাড়াইবার জন্য রাজকর্মচারীদের মধ্যে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। এতদিনে ষড়যন্ত্র-কারীদের উদ্দেশ্য সফল হইল। অতঃপর তাঁহাকে ময়মনসিংহ জেলার নানা স্থানে চাকুরি করিতে হয়। কোন চাকুরি দীর্ঘকাল করা তাঁহার হইয়া উঠিত না।

"পনর বৎসর বয়সে গোবিন্দচন্দ্রের বিবাহ হয়। জয়দেবপুরেই তাঁহার পত্নী সারদাসুন্দরীর পিত্রালয়।" কবির ত্রিশ বৎসর বয়সে কবিপত্নীর মৃত্যু হইয়াছিল সে কথা আগেই বলিয়াছি। "পত্নী-বিয়োগের অল্পদিন পরেই কবি একমাত্র সহোদর জগচ্চন্দ্রকে হারাইলেন (১৪ই আগস্ট, ১৮৮৬), একে একে আত্মীয় পরিজন সকলেই তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া গেল। জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রমদার মৃত্যু পূর্বেই ঘটিয়াছিল, বাকি রহিল কনিষ্ঠা কন্যা—সপ্তমবর্ষীয়া মণিকুন্তলা।"

নানা কাজে কবিকে মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিতে হইত, এইভাবে কলিকাতার সাহিত্যিক-সমাজে তিনি পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। 'নবযুগ' নামে কোন পত্রিকায় জয়দেবপুরের রাজপরিবারের সমালোচনাত্মক একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। রাজার ধারণা হয়, সেটি গোবিন্দচন্দ্রের রচনা। এই ধারণার বশে, কবির অস্বীকৃতি সত্ত্বেও, রাজার আদেশে কবি স্বগ্রাম হইতে নির্বাসিত হন। এইবারে তাঁহার দুঃখের পাত্র পূর্ণপ্রায় হইল। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনা এই যে, দুঃখের পাত্র প্রায়শঃ আকারে বড় হইয়া থাকে। কবিজীবনের পরবর্তী ঘটনাসমূহ সেই পাত্রকে পূর্ণতর করিতে থাকিয়াছে।

প্রথমা পত্নী সারদার মৃত্যুর সাত বৎসর পরে কবি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। এবং পরে যাহার চক্রান্তে তিনি স্বগ্রাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহার অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি জয়দেবপুরে প্রত্যাবর্তন করিবার অনুমতি পান। এ ঘটনাকে সৌভাগ্য বলা চলে। কিন্তু এই সৌভাগ্যোদয়েও কবির মন হইতে পূর্বস্মৃতির কালো ছায়া দূর হইল না। অর্থকষ্টও সমান চলিল।

কবির খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্ববঙ্গের কোন কোন ভূম্যধিকারী তাঁহাকে কিছু মাসিক বৃত্তি দিতে লাগিলেন। কিন্তু মোটের উপরে তাঁহার অবস্থার বড় তারতম্য ঘটিল না। প্রথমা পত্নীর বিয়োগে এবং জন্মভূমি হইতে নির্বাসিত হওয়ায় যে যুগল গ্রন্থি তাঁহার জীবনে পড়িয়াছিল তাহারাই কবিকে পীড়ন করিতে লাগিল। যে-পীড়নের কেন্দ্র মনে, বাহির হইতে তাহার সান্ত্বনা আসিবে কোন্ সূত্রে?

ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল, স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধি দেখা দিতে লাগিল। এই সময়ে কলিকাতায় কবিকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকজন মহাশয় ব্যক্তির চেষ্টায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে একটি সভার আয়োজন হয়। বাঙালার সভার সাধারণ পরিণাম যাহা হয়, এখানেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না, বক্তৃতা হইল, চাঁদা উঠিল না, প্রস্তাব গৃহীত হইল, টাকা আসিল না। "বাঙালি মানুষ যদি, প্রেত কাবে কয়?" তবু প্রেতের রাজ্যে এই শুভচেষ্টা আশার সংবাদ। অবশেষে দুর্ভাগ্যে, অভাবে ও রোগে ভুগিতে ভুগিতে কবি ঢাকা শহরে ১৩২৫ সালের ১৩ই আশ্বিন ইহলোক ত্যাগ করেন।[৪]

৩

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের প্রতিভার প্রধান লক্ষণ একটা দুর্দমনীয় আবেগ। এই আবেগের প্রচণ্ডতা এমনি যে, কোন বাধা মানে নাই। সাহিত্যিকের সম্মুখে বাধা আসিতে পারে দুইটি: ভাষা ও ছন্দের স্বাভাবিক বাধা, আর সামাজিক পরিবেশের বাধা, অর্থাৎ ভাষা-পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ দুটাই বাধা সৃষ্টি করিতে পারে, সব ক্ষেত্রেই করিয়া থাকে; কবির প্রতিভায় এবং এই দুই শ্রেণীর বাধায় একটা দ্বন্দ্বের মত চলে, এবং শেষ পর্যন্ত দুইয়ে একটা ভারসাম্য সৃষ্টি করিয়া কবির কাব্যজগৎকে বিধৃত করিয়া রাখে। এই ভারসাম্য কেবল মহাকবিগণের কাব্যেই সম্ভব হয়; নব্যবাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে ইহার উদাহরণ মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ। অল্পশক্তিমান কবিদের বেলাতে এই বাধার ফলে দুই প্রকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইতে পারে। কোন কোন কবি পরিবেশের দ্বন্দ্বে

৪ কবির জীবনবৃত্তান্ত সাহিত্যসাধকচরিতমালার পূর্বোক্ত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

পরাজিত হইয়া নতিস্বীকার করেন, আবার কোন কোন কবির ক্ষেত্রে পরিবেশ ও প্রতিভার দ্বন্দ্বে পরিবেশ দুটাই পরাজিত হয়, কবির দুর্দমনীয় প্রতিভা শেষ পর্যন্ত বাগ মানে না। প্রথম প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টান্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ভাষা ছন্দ ও প্রতিভার দ্বন্দ্বে এখানে ভাষা ও ছন্দই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, কবি তাঁহার উত্তরজীবনের কাব্যগ্রন্থসমূহে ভাষা ও ছন্দের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দৃষ্ট হয় কাজী নজরুল ও গোবিন্দ দাসের কাব্যে। ইহাদের দুজনেরই প্রতিভার আবেগ এমন দুর্বার যে, ভাষা ও ছন্দের অর্থাৎ কাব্যের পরিবেশ কিছুতেই তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে নাই, পাথরের বাঁধকে যেমন পার্বতী নদী কিছুতেই স্বীকার করে না, অনেকটা তেমনি। এ দুটিই ত্রুটি, দুই শ্রেণীর ত্রুটি, প্রভেদের মধ্যে এই। এদিক হইতে, যেমন অন্যদিক হইতেও বটে, বিচার করিলে গোবিন্দ দাসের তুলনা কাজী নজরুল ইসলাম।

নব্যবাংলাসাহিত্যের জন্ম কলিকাতার পরিবেশে। প্রধানতঃ কলিকাতার ভাষা ও সামাজিক পরিবেশকে অবলম্বন করিয়াই নব্যবাংলাসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলাদেশের যে অঞ্চলের লোকই সাহিত্যসৃষ্টি করুন না কেন, কলিকাতার সামাজিক ও ভাষিক পরিবেশরূপ convention বা প্রথাকে স্বীকার করিয়াই সাহিত্যসৃষ্টি করিয়াছেন। কালের গতি ইহার অনুকূলে ছিল। কলিকাতা শহর আর্থিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নব্যবাংলার জীবনকেন্দ্র, কাজেই কলিকাতার সঙ্গে যোগস্থাপন অধিকাংশ লেখকের পক্ষে কঠিন হয় নাই—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক হইয়াছে। অনেক সময়েই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার আগেই লেখকগণ কলিকাতার পরিবেশে প্রবেশ করিয়াছেন, কাজেই কলিকাতার পরিবেশ গ্রহণের পক্ষে কোন বাধাই তাঁহারা অনুভব করেন নাই। কিন্তু গোবিন্দ দাসের বেলাতে এমনটি ঘটে নাই। তাঁহার জীবনের গড়তি অংশটা কলিকাতা হইতে দূরে কাটিয়াছে, তখনই তাঁহার কাব্যের ভিত্ত-পত্তন হইয়াছে। তারপরে পরিণত বয়সে যখন কলিকাতার সমাজে উপস্থিত হইয়াছেন, নিতান্ত অতিথির মত, অনেক ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত অতিথির মত উপস্থিত হইয়াছেন, ফলে কলিকাতার সমাজ, যাহা অধিকাংশ বাঙালীর পক্ষে জল-হাওয়ার মত সহজ, তাহাকে তিনি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই; সন্দেহের সঙ্গে, সমালোচনার সঙ্গে, বিরূপ ভাবোদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন।[৫]

[৫] দ্র° বাঙ্গালি, সৌরভ, আমারি যে দোষ, আমারি কি দোষ, সে কেমন? প্রভৃতি কবিতা। গোবিন্দ-চয়নিকা।

নব্যবাংলাসাহিত্যের স্বাভাবিক ক্ষেত্রের সঙ্গে তাঁহার প্রতিভার ভারসাম্য না ঘটায় ভাল মন্দ দুইরূপ ফলই ফলিয়াছে। মন্দর দিক এই যে, কবি যেখানে সমালোচকের কলম হাতে লইয়াছেন সেখানে সবই কেমন একদেশদর্শী হইয়াছে; তাঁহার মতামত যে সব সময় ভুল এমন নয়, কিন্তু ঠিক যেখানে যতটুকু জোর দেওয়া উচিত তার চেয়ে বেশি জোর দিয়াছেন, নৌকা কাৎ হইয়া পড়িয়াছে, কারণ, আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে লেখকের সমবেদনার অভাব, আর তার মূলে রহিয়াছে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাব। এই জাতীয় বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা বাস্তব-নিষ্ঠার অভাবজাত বলিয়া নিতান্ত লঘু। আর ভালর দিকে সত্যই ভাল; এমন এক প্রকার সরলতা ও আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে সুবর্ণের ওজনেই যাহার মূল্য। শহরের শিক্ষিতসমাজে পল্লীগ্রামের নবাগন্তুক আসিয়া পড়িলে তাহার কথায় ও আচরণে যেমন কৌতূহল সৃষ্টি করে, তাহার গ্রাম্য সরলতা মনকে যেমন আপনি আকর্ষণ করে—গোবিন্দ দাসের অনেক কবিতা শিক্ষিত পাঠকের মনে তেমনি প্রতিক্রিয়া ঘটাইয়া থাকে।

'উলঙ্গ রমণী' কবিতাটি ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এমন অকুণ্ঠিতভাবে সত্য কথা বলা বোধ করি শিক্ষিতসমাজে আবাল্যবর্ধিত কবির সম্ভব হইত না। বিষয়টি স্বভাবতই কুণ্ঠাজড়িত, একটু হাত কাঁপিলেই সমস্ত কবিতাটি অতলস্পর্শ খাদের মধ্যে গিয়া পড়িত, কিন্তু সে বিভ্রাট কোথাও ঘটে নাই, তার কারণ বিষয়টির মধ্যে কোথাও কিছু যে কুণ্ঠার কারণ আছে সে বিষয়ে কবি একেবারেই সচেতন নন। তিনি নিঃশঙ্ক অচেতনার সঙ্গে সংকীর্ণ গিরিসংকট অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, কোথাও পা টলে নাই। 'আমার ভালোবাসা' এবং 'নৃসিংহ'—এই জাতীয় আর দুটি কবিতা। এবং এই তিনটি গোবিন্দ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতানিচয়ের অন্তর্গত; এ বিষয়ে সার্থক কবিতা লিখিতে এক মহাকবিগণ পারেন, আর পারেন সাহিত্যিক সংস্কারে অনভিজ্ঞ কবিগণ; মধ্যপন্থা এক্ষেত্রে অচল। কিন্তু মহাকবি-গণের শিল্পের ইন্দ্রজাল যেখানে আবরণের মত কাজ করিতে পারিত, ইহাদের হাতে তাহা সম্পূর্ণ অনাবৃত; কিন্তু যে আবরণ-হীনতায় লজ্জাবোধ নাই, সেখানে লজ্জার কারণও ঘটিতে পারে নাই; ইহা শিশুর নগ্নতা, বন্যের নগ্নতা, সংক্ষেপে এ নগ্নতা দেবতার।

গোবিন্দ দাসের কবিপ্রতিভার এই লক্ষণগুলির সঙ্গে তাঁহার হাস্যরস ও পূর্বোক্ত কূটগ্রন্থিদ্বয় যদি যুক্ত করি তবে তাঁহার প্রতিভার প্রায় সাকুল্যটা পাই, ইহাই তাঁহার প্রতিভার স্বরূপ।

৪

ময়মনসিংহ জেলার প্রান্তে জাত (কর্মজীবনে দীর্ঘকাল তিনি ময়মনসিংহ জেলাতে কাটাইয়াছেন) এই কবির কাব্য পড়িতে পড়িতে কেন জানি না বারংবার ময়মনসিংহের গাথাকাব্যগুলি মনে পড়িয়া গিয়াছে। সে কি ভাব ও ভাষার সাম্যে? সে কি প্রকাশভঙ্গির অনাড়ম্বর সরলতায়? সে কি প্রকাশ্য বিষয়ের নির্বিচার আগ্রহে? কিংবা কেবলই একটা ভৌগোলিক সান্নিধ্যহেতু? ময়মনসিংহ-গাথা কাব্যের কবিদের সম্বন্ধে আমরা নিশ্চয়রূপে কিছুই জানি না, যেটুকু জানি তার মধ্যে সংশয় ও জ্ঞানের অভাব মিশ্রিত। কিন্তু আমার কেন জানি না এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, সেইসব অজ্ঞাতপরিচয় কবিদের জীবন কাঠামোর মধ্যে এবং গোবিন্দ দাসের জীবনে বিশেষ প্রভেদ ছিল না। সামাজিক আর্থিক এবং আঞ্চলিক একই স্তরের লোক ইহারা, কেবল কিছু সময়ের প্রভেদ। কিন্তু সে ভেদও দুস্তর নয় এই জন্য যে গ্রামাঞ্চলের সময় নগরাঞ্চলের সময়ের চেয়ে মন্দগতি। বিশেষ, ঊনবিংশ শতকের শেষভাগের জয়দেবপুর ময়মনসিংহ-গাথার কবিদের যুগের গা-ঘেঁষিয়াই বিরাজমান ছিল। এক পরিবেশের ফল একরূপ হইবে ইহাই স্বাভাবিক। তাই বুঝি এই দুই সময়ের কবিদের মধ্যে এমন ঐক্য, বাহিরের পার্থক্য সত্ত্বেও এমন আন্তরিক ঐক্য। বাস্তবিক স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস ময়মনসিংহ-গাথার স্বভাবকবিদেরই উত্তরপুরুষ। তাঁহার কাব্যের শ্রেষ্ঠ অংশ, বিশিষ্ট অংশ মহুয়া-মলুয়ার লতাবিতানের শেষ পুষ্পগুচ্ছ। নব্যবাংলাসাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ অনেকটা আকস্মিক, তাঁহার আন্তরিক যোগ পদ্মাযমুনার পরপারবর্তী ঐসব গাথাকারগণের সঙ্গে।

এটি আরও স্পষ্ট হইয়া ওঠে যখন স্মরণ করি তাঁহার আঞ্চলিক (এখানে গ্রাম ও তাহার প্রাকৃতিক পরিবেশ) সম্পর্কে প্রীতি; স্বগ্রামের প্রতি তাঁহার অন্ধ দুর্নিবার আকর্ষণ, শিশুসন্তান যেমন দুর্নিবার অন্ধ আকর্ষণ অনুভব করে তাহার মাতার প্রতি। তাত্ত্বিকগণ পিতামাতার প্রতি আচরণ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়া থাকেন সে আর এক বস্তু, তাহা তত্ত্ব, তাহা নীতি, তাহা যেমন সামাজিক সত্য, তেমন আন্তরিক সত্য নয়। শিশুর অন্ধ আকর্ষণের সঙ্গে তুলনায় সেই জন্তই তাহার মূল্য কম। গোবিন্দ দাসের স্বগ্রামের প্রতি অন্ধ আকর্ষণ শিশুর মাতৃব্যাকুলতার মতই আন্তরিক বস্তু তাহা patriotism নয়, এমন কি local patriotism-ও নয়। patriotism সম্বন্ধে তিনি অনেক কবিতা লিখিয়াছেন, সে-সব সামাজিক সত্য হইতে উদ্ভূত, এমনতর জীবনের বস্তু নয়। মুকুন্দরাম

চক্রবর্তীর কাছে তাঁহার দামুন্যা ও রত্নাহু যেমন সত্য ছিল এবং যে-স্থরের সত্য ছিল, গোবিন্দ দাসের কাছে তাঁহার জয়দেবপুর ও চিলাই নদী তেমনি সত্য এবং তেমনি স্থরের সত্য; যেমন সত্য এবং যেমন স্থরের সত্য কাঁশাই, ধন্নু, জালিয়াহাওর প্রভৃতি অঞ্চল এসব গাথা-কবিগণের নিকটে। যাহার বিশিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল নাই, সে-ই নির্বিশেষকে লইয়া প্যাট্রিয়টিজম্ করে। বিশেষকে মানুষ যখন পায় তখন তাহাকে ভালবাসে, তাহাকে লইয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসার প্রশ্ন তোলে না। মায়ের মুখের অ্যানাটমি পরীক্ষা করিয়াছে এমন বৈজ্ঞানিকের কথা জানিতে এখনো বাকি আছে।

নব্য বাঙালী কবিগণ এই বিশেষ অর্থে মাতৃভূমির স্পর্শ হইতে বঞ্চিত। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে ঘটনাচক্রের রহস্যময় হস্ত রবীন্দ্রনাথকে বাংলাদেশের একটি বিশেষ অঞ্চলে কিছুদিনের জন্য নিক্ষেপ করিয়াছিল। পাবনা রাজসাহী নদীয়া শিলাইদহ পতিসর সাজাদপুর পদ্মা আত্রাই যমুনা—ইহাই সেই বিশিষ্ট অঞ্চল। মূলতঃ ইহাই রবীন্দ্রনাথের কাছের বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ রূপ। এই অঞ্চলে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সঙ্গে তাঁহার প্রতিভার দিব্যস্ফূর্তি। সে কেবলই কি কাকতালীয়? রবীন্দ্রনাথ জীবনের কমবেশি পনেরটি বছর প্রায় স্থায়ীভাবে এই অঞ্চলে কাটাইয়া ছিলেন। ইহার আগের ও পরের রবীন্দ্রকাব্যে একপ্রকার নির্বিশেষ ভাব দৃষ্ট হয়, কিন্তু এই সময়কার কাব্যগুলি বিশেষের রস হইতে সঞ্জাত বলিয়া তাহার মূল্য এমন সমধিক। উঠ্‌তি বয়সে এই আঞ্চলিক পরিবেশটি না পাইলে রবীন্দ্রকাব্য কি রূপ ধারণ করিত কে জানে।

যাই হোক, আমার বক্তব্য এই যে প্রাচীন সমস্ত কাব্যই ভৌগোলিক অঞ্চলবিশেষের ধন, এ সত্য কবিরাও জানিতেন, তাই তাঁহারা 'Leaving great verse to a little clen' কোন দুঃখ অনুভব করিতেন না। গোবিন্দ দাসের কাব্যে সেই প্রাচীন ধারাটির একটি আধুনিক মূর্তি পাই।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত উল্লেখ নানা কারণে উচিত হইবে না। প্রথম কারণ প্রতিভার অসামান্যতা, দ্বিতীয় কারণ তাঁহার এই সময়ের কাব্যে আঞ্চলিক রস ছাড়াও অন্য অনেক রসের মিশাল আছে। তাঁহার ঐ সময়ের কাব্যের ভিত্তিটা আঞ্চলিক হইলেও বস্তুটা বিচিত্র উপাদানে গঠিত। কাজেই নব্যবাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে গোবিন্দ দাসই প্রধান এবং খুব সম্ভব উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক রসের কবি। এখানেই তাঁহার কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এইবার বুঝিতে পারা যাইবে যে, কেন স্বগ্রাম হইতে নির্বাসনকে আমরা কবিজীবনের

একটি কূটগ্রন্থি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। স্বক্ষেত্র হইতে নির্বাসিত হইলে লোকের অসুবিধা হয়, স্বার্থহানি হয়, বড়জোর অভিমানে আঘাত লাগে। কিন্তু গোবিন্দ দাস যে আঘাত পাইয়াছিলেন তাহা এসবের চেয়ে অনেক গুরুতর—একেবারে জৈব অস্তিত্বের মর্মে আঘাত। সে আঘাতের স্মৃতি তিনি কখনো ভুলিতে পারেন নাই, পরবর্তীকালে গ্রামে ফিরিবার অনুমতি পাইলেও ভুলিতে পারেন নাই, ঐ বিষময় স্মৃতি তাঁহার জীবনের সাকুল্যটাকে রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে —'তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারি নে সেই দুই বিঘা জমি'। এমন আঘাত একমাত্র সে-ই পাইতে পারে যাহার কবিচিত্ত আছে এবং সে কবিচিত্ত মাটিতে বদ্ধমূল। এই মূলে আঘাতের অভিজ্ঞতা গোবিন্দ দাসের কবিপ্রেরণার একটি মৌলিক বেদনা।

অপর মৌলিক বেদনা তাঁহার পত্নীর শোকাবহ মৃত্যু। এই শোকাবহ ঘটনার স্বরূপ নিশ্চয় জানি না, তবে ইহাতে কবির জীবনে যে কূটগ্রন্থি পড়িয়াছিল সারা জীবনেও আর তিনি তাহা খুলিতে পারেন নাই। বিশ্বের নারীসমাজের সৌন্দর্য ও মাধুর্য, প্রণয় ও প্রেম, সংসারের যাবতীয় সুখ-দুঃখ—এক কথায় মানুষের সমগ্র জীবন—ঐ শোকাবহ মৃত্যুর ছায়ায় সমাচ্ছন্ন, ঐ স্মৃতির দ্বারা সকরুণ। আর শুধু তাই কেন বা বলি, পত্নী জীবিত থাকিলে তাঁহার মনের যে দুর্দম আবেগ স্বাভাবিক ভাবেই শান্তি ও শমে ফিরিত, নিষ্ফলতাজাত অতৃপ্তি তাহাতে একপ্রকার প্রচণ্ড তীব্রতা ও উত্তাপ দিয়াছে। সে উত্তাপ এমনি উগ্র যে কবির হৃদয় দগ্ধ করিয়া দিয়াছে, দগ্ধহৃদয়-নির্গত সেই লাভাস্রোত পাঠকের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াও সম্পূর্ণ শীতল হয় নাই, তাহার চোখে-মুখে ভাপ লাগে—

আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস-সহ
আমি ও-নারীর রূপে
আমি ও-মাংসের স্তূপে
কামনার কমনীয় কেলি-কালীদহ,
ও-কর্দমে অই পঙ্কে
ওই ক্লেদে ও কলঙ্কে
কালীয়নাগের মত সুখী অহরহ—
আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস-সহ।[৬]

৬ গোবিন্দ-চন্দ্রনিকা

কিংবা—

যাও নারী, যাও ফিরা,' নতুবা ও বক্ষ চিরা'
চুষে নিব হৃৎপিণ্ড শুষে নিব হাড়,
প্রেমের ভীষণ দৃশ্য নিরখিয়া কাঁপে বিশ্ব
ভীষণ নৃসিংহ রূপ প্রেমে অবতার।
দিলে যদি সব দেও, যা আছে তোমার।[৭]

নিছক উত্তাপের বিচারে, তীব্রতার বিচারে, বাংলা সাহিত্যে ইহাদের তুলনা মেলা ভার। ইংরেজ কবি বার্নস-এর রচনায় ইহাদের দোসর আছে।

কিন্তু এরূপ উত্তাপ মানবহৃদয় দীর্ঘকাল পোষণ করিতে পারে না, দুঃখ যতই তীক্ষ্ণ হোক কালক্রমে তাহার ধার পড়িয়া আসে। কবির দুঃখস্মৃতির ধারও পড়িয়া আসিয়াছে, উত্তাপের পরিবর্তে মাধুর্য, দাহের পরিবর্তে সৌন্দর্য দেখা দিতে শুরু করিয়াছে; মাধ্যাহ্নিক প্রচণ্ড ভাস্বরতার স্থানে সন্ধ্যার করুণ লাবণ্য কবি-হৃদয়কে মনোহর করিয়া তুলিয়াছে—

কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার ঘরে যেতে জ্বর আসিছে গায়।
ঐখানে সে দাঁড়াইয়া,
মুখ দেখিত আয়না দিয়া,
অমল জলে কমল যেন শরৎ-সুষমায়।
আজো আমি দিন দুপরে
আয়নাতে তার চাই না ডরে,
কি জানি কি পাছে তাহার মুখ বা দেখা যায়।
কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়।[৮]

কিন্তু এই শুধু নয়, আরো আছে। কাল যেমন সান্ত্বনা দিতে পারে, তেমনি সান্ত্বনার আর-একটা কেন্দ্র হইতে পারে আপন হৃদয়ের হাস্যরস-বোধ। কবি সে সুখে বঞ্চিত নন। তাঁহার হাস্যরসজাত কাণ্ডজ্ঞানই বলিয়া দিয়াছে, বাড়াবাড়ি কিছু নয়, শোক সহ্য করিয়াও টিকিয়া থাকা যায়, জীবন একেবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় না—

আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে
প্রভাতে সোনার সূর্য হবে না উদয়,

গোবিন্দ-চয়নিকা

আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে
বুঝিবা আঁধারে রাত চিরকাল রয়।

কিন্তু

এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে
চোখে দেখি, কানে শুনি, নাকে বাস পাই,
এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে
আমিও বাঁচিয়া আছি, আজো মরি নাই।[৯]

এই কবিতাটিতেই কবিজীবনের আর-একটি স্থায়ী সূত্রের আভাস পাওয়া যায়—

এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে,
দীনের আশ্রয় শেষ আছে ভগবান্,
এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে
অনন্ত করুণা প্রেম সেই করে দান।[১০]

ভগবদ্‌বিশ্বাস কবিজীবনের একটি ঐশ্বর্য, অনেক দুঃখের অনেক সান্ত্বনা তিনি ঐ বিশ্বাস হইতে লাভ করিয়াছেন।

৫

গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিকৃতি সম্বন্ধে একটি নিশ্চিত ধারণায় পৌঁছানো সম্ভব নয়, কেননা তাঁহার কাব্য অনেক পরিমাণে নব্য-বাংলাসাহিত্যের মূল প্রবাহের বাহিরে অবস্থিত; দ্বিতীয়ত, যেসব কবির সম্বন্ধে লোকের মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল তাহাতে আঘাত পড়িবার আশঙ্কা। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ অনেক ঊর্ধ্বে, তাঁহাদের প্রথমেই ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। প্রতিভায় ও প্রতিভার ফলশ্রুতিতে গোবিন্দ দাসের আসন হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের চেয়ে উঁচুতে ধার্য হইবে বলিয়াই আমার ধারণা। তবে এ বিষয়ে মতভেদ অনিবার্য, বস্তুতঃ সাহিত্য-সমালোচনা মানেই মতভেদের নূতন দৃষ্টান্ত। ' তবে আমার বিশ্বাস এই যে, কাব্য-রসিক ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে যে গোবিন্দ দাস নব্যবাংলাসাহিত্যের একজন major কবি, যেমন major কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং কাজী নজরুল ইস্‌লাম। অনেক প্রখ্যাতনামা কবি বঙ্গবাণীর বীণাযন্ত্রের পুরাতন তন্ত্রীটি বাজাইয়াই যখন সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তখন পুরাতনে সন্তুষ্ট না থাকিয়া গোবিন্দ দাস পুরাতন বীণাযন্ত্রে নূতন তন্ত্রী আরোপ করিয়া নূতনতর সুর ধ্বনিত করিয়াছেন—তার কমে তাঁহার কবি-প্রকৃতি সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই।

৯ ১০ গোবিন্দ চয়নিকা

কবি অক্ষয়কুমার বড়াল

১৮৬০-১৯১৯

দুর্ভাগ্য নানা আকারে আসিতে পারে। কিন্তু যে দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যের আকারে আসে, তাহার মত বিড়ম্বনা বুঝি আর নাই, কেননা, মানুষ তাহাকে প্রেয়ঃ মনে করিয়া আঁকড়াইয়া ধরে, চরিতার্থতার পথ মনে করিয়া তাহাকে আর ছাড়িতে চায় না। ভাগ্যের এই হের-ফের সংসারের সর্বত্র চলিতেছে, সাহিত্য-ক্ষেত্রেই বা তাহার অন্যথা হইবে কেন? কোন সাহিত্যিকের হাতে যদি গদ্যের কলম থাকে, আর সে যদি কবি বলিয়া প্রশংসিত হয়, তবে সম্ভাবনা এই যে, শক্তির যথার্থ ক্ষেত্র হইতে সে সরিয়া আসিবে। দুর্ভাগ্য এখানে সৌভাগ্যের আকারে আসিল।

কাল্পনিক দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া বাস্তব দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। মহাকাব্য ও লিরিক কাব্যস্রষ্টা বলিয়া হেমচন্দ্র প্রশংসিত হইয়াছেন, অথচ তাঁহার শক্তির যথার্থ ক্ষেত্র সামাজিক ব্যঙ্গ-কবিতা রচনায়। ভ্রান্ত প্রশংসায় আলেয়ার দ্বারা চালিত হইয়া কবি শক্তির স্বক্ষেত্রকে ছাড়িয়াছেন, শুধু তা-ই নয়, তিনি শেষ পর্যন্ত চোরাবালিতে পড়িয়াছেন। সৌভাগ্যের ছদ্মবেশে দুর্ভাগ্যের ক্রিয়া।

নবীন সেনও মহাকাব্যের স্রষ্টা বলিয়া সেকালে কীর্তিত হইয়াছিলেন, একালেও তাহার ঢেউ চলিতেছে। কেহ কদাচিৎ তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তির উল্লেখ করিয়া থাকে, সেটি আমার ধারণায় 'আমার জীবন'। নবীন সেনের হাতে সরস স্বচ্ছ গদ্যের কলম ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, সেদিকে কেহ তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই, করিয়াছিল ভ্রান্ত পথে। আবার দেখিলাম দুর্ভাগ্য আসিল সৌভাগ্যের ছদ্মবেশে।

বর্তমান প্রবন্ধের যিনি বিষয় সেই অক্ষয় বড়ালের কাব্য সমালোচনার ইতিহাস হইতেও এমন দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যায়। তাঁহার ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যের গুপ্তলীলা বড় বেশি কুফল প্রসব করিয়াছে। একে তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টি কবিতা স্বভাবতই স্বল্প-পঠিত, তাহাও আবার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ চার-পাঁচখানি গ্রন্থের পরিধির মধ্যে আবদ্ধ। আবার দুর্ভাগ্যও যেন কোটালের বন্যার তরঙ্গের পরে তরঙ্গে আসিয়াছে, মাথায় সৌভাগ্যের রজত-কিরীট। এই বিরাট অভিঘাতের ফলে পাঠকের রুচি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টি কবির স্বক্ষেত্র হইতে অন্যত্র নীত হইয়াছে; ফলে

অক্ষয় বড়ালের কবিতার যে প্রসার ও আদর হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। ভাগ্যের হের-ফেরের এটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বড়াল-কবির প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্য বুঝাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার গ্রন্থ-সমূহে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক লিখিত ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছে।

প্রদীপের ভূমিকা লিখিয়াছেন সুরেশ সমাজপতি, কনকাঞ্জলির ভূমিকা লিখিয়াছেন অক্ষয় মৈত্রেয়, শঙ্খের ভূমিকা লিখিয়াছেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, আর এষা কাব্যের ভূমিকা লিখিয়াছেন বিপিন পাল।

বলা বাহুল্য, ভূমিকা-লেখকগণ সকলেই বিশিষ্ট লেখক ও মনীষী। কিন্তু সেখানেই তো বিপদ, কারণ স্বপক্ষে নিযুক্ত উকিল যদি বিপক্ষে চলিতে থাকে, তবে মামলা নষ্ট হইতে কতক্ষণ! আর সে উকিল যদি সুদক্ষ হয়, তবে বিপদ বেশি; যত বেশি সুদক্ষ হইবে বিপদ তত বেশি হইবে। এক্ষেত্রে ঘটিয়াছে ঠিক তাই। ভূমিকা-লেখকগণ বিপক্ষের যুক্তি গ্রহণ করিয়াছেন এমন বলি না, তবে তাঁহারা মামলা সুপরিচালনা করেন নাই নিশ্চয়, কারণ কবির স্বক্ষেত্রের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই। বিপিন পালের ভূমিকাটি পড়িলে উহা অভিসন্ধিপ্রসূত বলিয়া মনে হয়। তিনি তাগ্ করিয়াছেন প্যাঁচা, মারিতে চেষ্টা করিয়াছেন বাদুড়; বড়াল কবির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন তাঁহার তেমন উদ্দেশ্য নয়, যেমন উদ্দেশ্য, গোপন কিন্তু আসল, রবীন্দ্র-কাব্যের নিন্দা, বড়াল কবি অন্ততঃ কোন কোন ক্ষেত্রে যে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে শ্রেষ্ঠ—তাঁহার ভূমিকার ইহাই যেন প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য। ইহা প্রমাণের জন্য যুক্তি-কুযুক্তির জাল বুনিতে বুনিতে তিনি এমনই অন্ধ হইয়া পড়িয়াছেন যে, এষা কাব্যকে টেনিসনের ইন মেমোরিয়াম কাব্যের চেয়ে এবং কুমারসম্ভবের অন্তর্গত রতি-বিলাপের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিতে তাঁহার বাধে নাই। এতদিন পরে এ সব উক্তিতে বিচলিত হইবার কিছু থাকিত না, যদি ভূমিকাগুলির প্রভাবে বড়াল-কবির ক্ষতি না হইত।

প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি বিপিন পালের ভূমিকার একটি দোষ, অপর দোষ কবির শক্তির ভুল ক্ষেত্রের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ। এই ভুলটি অপর তিনটি ভূমিকারও প্রধান দোষ।

চারজন ভূমিকাকারই বড়াল-কাব্যের তত্ত্ববিচারে নামিয়াছেন। অক্ষয় বড়াল পরলোক মানেন কি না, হিন্দুর নৈরাশ্যবাদ ও খ্রীষ্টানের নৈরাশ্যবাদে কতটুকু প্রভেদ, মৃত্যুর পরে আত্মা কিভাবে বিরাজ করে প্রভৃতি বিষয়ের নিজস্ব মূল্য যাহাই থাক, কাব্যের সৌন্দর্য বিচারে তাহাদের মূল্য এমন কিছু নয়। তত্ত্বের

মূল্যে কাব্যের মূল্য নয়। দর্শনশাস্ত্রের মূল্য তত্ত্বের যৌক্তিকতা ও যাথার্থ্যে উপরে নির্ভর করে; কাব্য তত্ত্বনিরপেক্ষ; তাহা means মাত্র নয়, তাহা enc in itself; কাব্যেই কাব্যের শেষ। এই জন্যই দেখিতে পাই যে, কবিতার বিষ অকিঞ্চিৎকর হওয়া সত্ত্বেও তাহার মহৎ কাব্য হইয়া উঠিতে বাধা নাই, যেম মেঘনাদ-বধ কাব্য, আবার কবিতার বিষয়টি অতীব গুরুতর হওয়া সত্ত্বে শোচনীয় পরিণামে পৌঁছিতে কাব্যের বাধা নাই, যেমন বৃত্র-সংহার কাব্য। কি অনেক সময়েই দেখা যায় যে, তত্ত্বের মূল্য কাব্য পাইল, ইহা অনেকটা একজনে নম্বর পাইয়া অপরের পাস করিবার মত।

পূর্বোক্ত চারজন সমালোচক কেবল কবির ক্ষতি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই ভবিষ্যতের সমালোচকগণের কাজকেও কঠিন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদে রচিত অবরোধ ভেদ করিয়া বড়াল-কাব্যের অন্তঃপুরে প্রবেশের পথ সঙ্কীর্ণ, আবা সে শক্ত প্রাচীর ভাঙাও আয়াসসাধ্য, তা ছাড়া ভাঙিতে পারিলেও সেই ভগ্নস্তূপে পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবার আশঙ্কা।

এই প্রসঙ্গে বাংলা সমালোচনারীতি সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। রাধিব বলিয়াছিলেন যে, "তোমার গরবে গরবিনী হাম, রূপসী তোমার রূপে।" ইহ রাধার মুখে মানায় বটে, কারণ রাধা শিল্পী নন, সাধিকা। কিন্তু কাব্য-শি সম্বন্ধে ও কথা একেবারেই প্রযোজ্য নয়। 'তোমার গরবে গরবিনী' বলিলে কবিতার চলে না, কারণ কবিতার সার্থকতা বাহিরে কোথাও নাই, কবিতা মধ্যেই আছে, কবিতা আত্মতন্ত্র, অনন্যনির্ভর এবং অনন্যশরণ। বিজ্ঞান ও দর্শ আর কিছুকে প্রমাণ করে বলিয়া তাহাদের সার্থকতা অন্যত্র, কিন্তু কাব্য কি প্রমাণ করে না, নিজেকে প্রকাশ করে মাত্র। সেইজন্য কাব্য-বিষয়ে তত্ত্ব গৌ এবং অবান্তর। কাব্যে যদি তত্ত্ব থাকে, তবে কাব্যরূপেই থাকিবে, স্বতন্ত্ররূ নয়, অর্থাৎ শিল্পের সার্থকতার মূল্যেই তাঁহার মূল্য নিরূপিত হওয়া আবশ্যক, উ রীতি গ্রহণ করিলে চলিবে না।

প্রাক্-রবীন্দ্র পর্বে আমাদের শিল্পী ও সমালোচকগণ একথাটা যেন তে করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা অনেকেই তত্ত্বের মূল্যে কাব্যের মূল্য নিরূ করিতেন, তাই হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র মহাকবির পদবী পাইয়াছিলেন।

প্রাক্-রবীন্দ্র পর্বে বাংলা সমালোচনা রীতির ঝোঁকটা ছিল তত্ত্বের নিগু আকাশের দিকে। আর উত্তর-রবীন্দ্র পর্বে বাংলা সমালোচনা রীতির ঝোঁক পড়িয়াছে ঠিক বিপরীত দিকে। হালের সমালোচকগণের ঝোঁকটা নির্গুণ তে

দিকে নয়, বাস্তবের কাঁচামালের দিকে। এই বাস্তবের কাঁচামালের অপর নাম সমাজ চেতনা। বাস্তব লইয়াই শিল্পের কারবার সত্য, কিন্তু সার্থক শিল্পে পরিণত হইবামাত্র বাস্তব একটা রূপান্তর লাভ করে, তখন তাহা আর কাঁচামাল বা Raw material মাত্র থাকে না। এই রূপান্তরিত বাস্তবকে Finished product বা দ্বিজত্বপ্রাপ্ত বাস্তব বলা চলে। আমাদের দ্বন্দ্ব বাস্তবের বিরুদ্ধে নয়, বাস্তবকে যেভাবে কাব্যে ব্যবহার করা হইতেছে, মাত্র তাহারই বিরুদ্ধে। কিন্তু হালের সমালোচনারীতির ধারণা অন্যরূপ। এই ধারণার বশেই এখনকার সমালোচকগণ বলেন যে, কাব্যেই কাব্যের শেষ নয়, কাব্যের মধ্যে কাঁচা-মালের গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতে চান না।

'কাব্যেই কাব্যের শেষ' বলিতে আমি 'Art for arts sake' বুঝিতেছি না; বুঝিতেছি যে, জীবন-বিচারের, তত্ত্ব-বিচারের এবং কাব্য-বিচারের মাপকাঠি এক নয়; বুঝিতেছি যে, একের মাপকাঠি অপরের উপর প্রয়োগ অত্যাচার; বুঝিতেছি যে, জীবন, তত্ত্ব ও কাব্য পরস্পর প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের প্রকৃতি ভিন্ন; বুঝিতেছি যে, জীবনের অভিজ্ঞতা কাব্য-সৃষ্টির কাঁচা-মাল; Raw material-এ এবং Finished product-এ যে তফাত, জীবনের অভিজ্ঞতায় এবং কাব্যে রূপান্তরিত জীবনের অভিজ্ঞতায় সেইরূপ তফাত; এককে অপরের পদবী দেওয়া চলে না। জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে সমাজ-চৈতন্য থাকিতে পারে, কিন্তু যখনই সেই অভিজ্ঞতা সার্থক কাব্যে পরিণত হইল, তখন তাহার মধ্যে সমাজ-চৈতন্যের পরিবর্তে মহত্তর গুণের আবির্ভাব ঘটে, যাহার নাম দিতে পারি জীবন-চৈতন্য। কোন কাব্য সার্থক হইয়া উঠিয়াছে কি না, তাহার প্রমাণ উক্ত কাব্যে জীবন-চৈতন্য দেখা দিয়াছে কি না। যে কাব্যে জীবন-চৈতন্য যত গভীর, যত ব্যাপক, সেই কাব্য তত সার্থক, তত মহৎ।

প্রাক্-রবীন্দ্র এবং উত্তর-রবীন্দ্র সমালোচনা-রীতি জীবন-চৈতন্যের সন্ধান রাখে না; তাহার বদলে প্রাক্-রবীন্দ্র সমালোচকগণ তত্ত্বের মাপকাঠি এবং উত্তর-রবীন্দ্র সমালোচকগণ কাঁচামালের বা সমাজ-চৈতন্যের মাপকাঠি ব্যবহার করিয়াছেন। প্রাক্-রবীন্দ্র সমালোচনা-রীতি বাংলা সাহিত্যে টিকে নাই, উত্তর-রবীন্দ্র সমালোচনা-রীতিরও টিকিবার সম্ভাবনা দেখি না।

২

এষা কাব্যের ভূমিকায় বিপিন পাল দাবি করিয়াছেন যে—'কেবল বাংলার নহে, সম্ভবতঃ সমগ্র সভ্যজগতের আধুনিক সাহিত্যে অক্ষয়কুমারের এই এষাখানি শোক-সঙ্গীতের মধ্যে একটি অনন্যলব্ধ সত্য ও সৌন্দর্য লাভ করিয়াছে।' তারপরে আবার তিনি বলিতেছেন—'দর্পণে লোক যেমন আপন আপন মুখ দেখিয়া থাকে, সেইরূপ এই প্রস্ফুট ও উজ্জ্বল রস-চিত্রের মধ্যে বিশ্বজন আপন আপন অন্তরের অদৃষ্টপূর্ব রসের, রূপের ও স্বরূপের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া বিস্মি•, পুলকিত, মুগ্ধ ও তৃপ্ত হয়। এইরূপ কাব্য-সৃষ্টিই রস-বিচারে সর্বোচ্চস্থান প্রাপ্ত হয়। শোকচিত্রের মধ্যে, এই গুণেই এষা কাব্যখানি অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।' আবার—'অক্ষয়কুমারও তাঁহার কাব্যে আমাদের সমসময়ের বিশিষ্ট, সাধনার নিগূঢ় ও সার্বজনীন সমস্যা ও ভাবগুলিকে অতি বিশদ করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহাই তাঁহার কাব্য-সৃষ্টির বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব।'

কেবল সমালোচনার দ্বারা কোন কাব্যকে মহত্ত্ব দান করা সম্ভব হইলে সত্য সত্যই এষা কাব্যখানি কেবল বাংলা সাহিত্যের নয়, পৃথিবীর সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্যে পরিণত হইত, কেননা এমন নির্জলা প্রশংসা রবীন্দ্রনাথ দূরে থাক, কোন কালের কোন কবি পাইয়াছেন কি না সন্দেহ ইহাই সৌভাগ্যের ছদ্মবেশে দুর্ভাগ্য!

এই দাবির সমর্থনে সমালোচক কবির পরলোক সম্বন্ধে ধারণা, বর্তমান জগতের সন্দেহ ও বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁহার যোগ প্রভৃতি কাব্যের সার্থকতার পক্ষে অবান্তর বহু বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু কাব্যের দ্বারা প্রমাণ ও বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন নাই। প্রাক্-রবীন্দ্র বাস্তবনিরপেক্ষ তত্ত্বমার্গী সমালোচনা-রীতির ইহা বোধ করি প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। এষা কাব্যকে যাঁহারা Lycidas বা Adonais বা In Memoriam-এর সমকক্ষ বলিতে চান, তাঁহাদের সঙ্গে তর্ক করিয়া লাভ নাই, কেবল এইটুকু বলিতে চাই যে, সাহিত্য-সমালোচনা উপলক্ষে কোন অভিসন্ধি সাধনের অভিপ্রায় না থাকিলে এরূপ কুযুক্তি মনে আসা সহজ নয়।

অপর তিনখানি গ্রন্থের ভূমিকাও একই ধারায় রচিত, একই সুরে বাঁধা এবং একই কারণে শেষ পর্যন্ত কবির খ্যাতির পক্ষে হানিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৩

অক্ষয় বড়াল তাত্ত্বিক কবি নন। জীবনের কোন মহৎ তত্ত্ব তাঁহার কল্পনায় উদ্ভূত হয় নাই, বা কল্পনার দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া রস-মূর্তি লাভ করে নাই। প্রমাণ তাঁহার মানব-বন্দনা কবিতাটি। এই কবিতাটিতে মানুষের বিবর্তনের যে তত্ত্ব বর্তমান, তাহা নিতান্ত কেতাবী বস্তু। তা ছাড়া তত্ত্বটির সমগ্র রূপ এত বিরাট ও ব্যাপক যে, তাঁহার প্রতিভার পক্ষে তাহা গুরুভার, সমস্তাটির মূলে তিনি পৌঁছিতে পারেন নাই, প্রান্তটিকে মাত্র গোচরীভূত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বিষয়টি দান্তের মত তাত্ত্বিক মহাকবির প্রতিভার যোগ্য। এইখানে বড়াল কবি স্পষ্টতঃ বিষয়-নির্বাচনে ভূলে করিয়াছেন।

আর তত্ত্ব যেখানে কাব্যের বিষয়, সেখানেও তত্ত্বকে জীবন-চিত্ররূপে প্রকাশ করিতে হয়, যেমন দান্তে করিয়াছেন তাঁহার 'ডিভাইন কমেডি' নামক মহাকাব্যে। এখানে জীবনতত্ত্ব জীবন-চিত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়াই ডিভাইন কমেডির কাব্য মহিমা কমে নাই। যাঁহারা ডিভাইন কমেডির জীবনতত্ত্ব মানেন না, তাঁহাদেরও কাব্যটিকে না মানিয়া উপায় নাই। আবার ঘরের কাছের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্যের অন্তর্গত 'চঞ্চলা' কবিতাটি। এখানেও একটি জীবন তত্ত্ব চিত্রায়িত হইয়া প্রকাশিত। তত্ত্বটিকে না মানিলেও চিত্রটিকে মানিতেই হইবে। আসল কথা, কাব্যের মূল্য তত্ত্বের মূল্যে নয়, জীবন চিত্রের মূল্যে। এবং সেই মূল্যেই বিচার করিয়া অক্ষয় বড়ালের স্থান-নির্দেশ করিতে হইবে।

তাহা হইলেও একটা প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকিয়া যায়, বড়াল কবি জীবনের কোন্ চিত্র আঁকিয়াছেন? সমগ্র জীবনের না জীবনের অংশবিশেষের? সমগ্র জীবনের ধারণা করিবার মনীষা বা প্রকাশ করিবার প্রতিভা তাঁহার নাই। তিনি জীবনের অংশবিশেষের কবি এবং সে অংশ পারিবারিক জীবন বা গৃহধর্ম। অংশটি ক্ষুদ্র সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার মাধুর্য, বৈচিত্র্য বা গভীরতা কম নয়। এবাকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তি নাই, এবং এই শ্রেষ্ঠতার মূলে আছে গৃহধর্মের বিশেষ রস। আমাদের দেশে এবং অনেক পরিমাণে সব দেশেই নারী গৃহ-জীবনের কেন্দ্র, সে কেবল পত্নী নয়, জননী এবং তারও চেয়ে বেশী—সে গৃহ জীবনের বৃন্ত, যে বৃন্তে সমগ্র পরিবারটি বিধৃত বলিয়াই তাহা সরস, সজীব ও প্রফুল্ল হইয়া বিরাজমান। আমাদের দেশের সমাজের পক্ষে নারীর মূল্য সমধিক, কারণ পারিবারিক জীবনের মাধুর্য, রস, অর্থ এবং গুরুত্ব বোধ করি অন্যান্য দেশের চেয়ে বেশী। সে সব দেশে গৃহ-জীবন অনেক হাল্কা, তাহার দায়িত্ব অনেক কম, কারণ রাষ্ট্র সেখানে পরিবারের অনেক দায়িত্ব বহন করিয়া থাকে।

এষা কাব্যের নায়িকা কেবল পত্নী নহেন, জননী নহেন, দাস-দাসীর প্রভু নহেন, সমস্ত গৃহ-জীবনের নেত্রী ও ধারয়িত্রী। তাঁহার অভাবে, খিলানের অভাবে যেমন গৃহটি ভাঙিয়া পড়ে, সমগ্র গৃহ-জীবনটি ভাঙিয়া পড়িয়াছে। স্বভাবতই গৃহ-জীবনের যিনি কবি, তাঁহার হৃদয় ও প্রতিভা এখানে একযোগে একমুখী হইয়া কাজে লাগিয়াছে—এবং তিনি অনায়াসে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এষা কাব্যখানির নজীরেই যে বড়াল-কবিকে গৃহজীবনের কবি বলিতেছি এমন নয়, তৎপূর্ববর্তী কাব্যসমূহের আলোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে, তাঁহার সার্থকতম কবিতাগুলির অধিকাংশই গৃহ-জীবনকে কেন্দ্র করিয়া বিকশিত। বিপিন পাল বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণে'র চেয়ে এষা শ্রেষ্ঠ। সে তর্কে প্রবেশ না করিয়াও বলিতে পারি যে, 'স্মরণে' রবীন্দ্র-প্রতিভার যথাযথ বিকাশ হয় নাই ; ইহার একটি কারণ রবীন্দ্রনাথ গৃহ-জীবনের কবি নন, তাঁহার প্রতিভা এমন বিরাট যে, গৃহ-জীবনে পূর্ণ বিকাশের স্থান তাহার নহে। আবার রবীন্দ্রনাথের শিশু-বিষয়ক কবিতাগুলির সঙ্গে বড়ালের শিশু-বিষয়ক কবিতাগুলির তুলনা করিলেও একই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের শিশুরা বিশেষ গৃহে জন্মিয়াও 'জগৎ পারাবারের তীরে' খেলা করিতেছে, আর বড়ালের শিশুদের পক্ষে আপন গৃহের অঙ্গনটাই যথেষ্ট প্রশস্ত। কোন বিশেষ তত্ত্বের দ্বারা আগে হইতে মুগ্ধ না হইয়া কবিতাগুলির প্রত্যক্ষ আলোচনা করিলেই আমার উক্তির যাথার্থ্য প্রকট হইবে।

৪

অক্ষয়কুমার বড়াল ১৮৬০ সালে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্ব বৎসরে এক সুবর্ণ-বণিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

"অক্ষয়কুমার হেয়ার স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই সত্য, কিন্তু পাঠানুরাগ চিরদিনই অক্ষুণ্ণ ছিল। পঠদ্দশায় তিনি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রতি অনুরক্ত হন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয়নাথ সেন, অক্ষয় চৌধুরী প্রভৃতির সহিত তিনিও কাব্য-রসাস্বাদ মানসে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর নিকট যাতায়াত করিতেন।

"অল্প বয়স হইতেই অক্ষয়কুমার কবিতা-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। ১২৮৯ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে (সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত) প্রকাশিত 'রজনীর মৃত্যু' নামে সুদীর্ঘ কবিতাটিই বোধ হয় তাঁহার প্রথম মুদ্রিত রচনা। পর বৎসরে

প্রকাশিত তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রদীপে এই কবিতাটি স্থান লাভ করিয়াছে। অক্ষয়কুমারের রচিত বহু কবিতা 'বীণা' (রাজকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত), 'কল্পনা,' 'বিভা', 'কর্ণধার'...প্রভৃতি মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সর্বশেষ রচনা 'স্বজাতি সম্ভাষণ' চুচুঁড়ায় অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় সুবর্ণ বণিক সম্মিলনীতে' পঠিত ও 'সুবর্ণ-বণিক সমাচারে' (মাঘ, ১৩২৫) প্রকাশিত হয়।

"অক্ষয়কুমার বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া চাকুরিতে প্রবেশ করেন। কিছুদিন দিল্লী এণ্ড লণ্ডন ব্যাঙ্কের হিসাব বিভাগে যোগ্যতার সহিত কাজ করিবার পরে তিনি নর্থ বৃটিশ লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানির অফিসে প্রধান কর্মচারীর পদ লাভ করেন। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ৪ঠা আষাঢ়, ১৩২৬ (১৯শে জুন, ১৯১৯) তারিখে কলিকাতায় তাঁহার দেহান্তর ঘটিয়াছে।" (অক্ষয় বড়াল—সাহিত্যসাধক-চরিতমালা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা এখানে প্রদত্ত হইল :—

প্রদীপ	প্রকাশকাল	১৮৮৪
কনকাঞ্জলি	"	১৮৮৫
ভুল	"	১৮৮৭
শঙ্খ	"	১৯১০
এষা	"	১৯১২

১৩১৩ সালের ১৯শে এপ্রিল অক্ষয়কুমারের পত্নীবিয়োগ হয়। পত্নীর উদ্দেশে লিখিত কবিতাগুলি এষা কাব্যে স্থান পাইয়াছে।

ইহা ছাড়া রাজকৃষ্ণ রায় ও গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কাব্য তিনি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার জীবনকালে অপ্রকাশিত অন্যান্য রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে।

অক্ষয় বড়ালের যে সব কবিতা আমার বিবেচনায় সবচেয়ে সার্থক ও রসোত্তীর্ণ, সেগুলির একটি তালিকা করিলেই দেখা যাইবে যে, সেগুলিতে গৃহ-জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ, বাৎসল্য ও প্রীতি, প্রত্যহের তুচ্ছতার বৃন্তে যে দিব্য কুসুম নিত্যনিয়ত ফুটিতেছে আবার অলক্ষিতে ঝরিয়া যাইতেছে, তাহার শিল্পসম্মত অপূর্ব বিকাশ ঘটিয়াছে। এ সব সুখ-দুঃখ অত্যন্ত সাধারণ বলিয়াই কাহারো চোখে পড়ে না। চোখে পড়িলেও অনাদরে এড়াইয়া যায়। এই পরিস্থিতির মধ্যে বড়াল-কবি নিজ শক্তির ক্ষেত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এবং সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর অধিকাংশ কবিতাই শঙ্খ কাব্যে বর্তমান। প্রদীপ ও কনকাঞ্জলির কোন কোন কবিতায় আভাসে এই রসটি থাকিলেও উহাদের স্থায়ী

রস ভিন্ন। শঙ্খে যে রসের স্ফূর্তি এষা কাব্যে তাহারই চরম বিকাশ। আমার বিশ্বাস, শঙ্খ কাব্যে কবি আপনার প্রতিভার ক্ষেত্রকে নিশ্চিতভাবে আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক যে, পূর্ববর্তী তিনখানা কাব্যের প্রকাশ-কাল এবং শঙ্খের প্রকাশকালের মধ্যে দীর্ঘকালের ব্যবধান, তেমনি আবার শঙ্খ ও এষার প্রকাশকাল মধ্যে ব্যবধান মাত্র দুটি বৎসরের। তাঁহার প্রথম তিনখানা কাব্য এক পর্বের এবং শেষের কাব্য দু'খানা আর এক পর্বের অন্তর্গত। শেষ পর্বই তাঁহার জীবনে সোনার ফসল ফলাইয়াছে।

শঙ্খ কাব্যের অন্তর্গত সদ্যোজাতা কন্যা, আদর, পূজার পরে, মাণিক, পঞ্চদশ বর্ষ গত, মাতৃহীনা, বিপত্নীক, কন্যার বিবাহে প্রভৃতি নাম দেখিলেই বিষয়টি বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু সার্থক কবিতার ক্ষেত্রে বিষয়টিই যথেষ্ট নহে, বিষয়কে উপলক্ষ করিয়া যে রসোদ্বোধন ঘটে, তাহাকেই বিচারের বিষয় করিয়া তুলিতে হয়। বিন্দুতে সিন্ধু-দর্শনের ন্যায় গৃহের ক্ষুদ্র পরিসরে কবি অপরিসীম রসের দর্শন পাইয়াছেন। আদর, পূজার পরে এবং মাণিক কবিতাটিতে আবার বাৎসল্য রসের সঙ্গে একটি স্মিত কৌতুক যুক্ত হইয়াছে। পঞ্চদশ বর্ষ গত কবিতার বিষয় বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার পরে কবির জীবনের বিগত পনেরো বৎসরের সুখ-দুঃখের আলোচনা, উহাতে করুণা ও ম্লান হাসি একত্র ফুটিয়া কবিতাটিকে বড়ই করুণ মধুর করিয়াছে। বড়াল-কবির বাৎসল্যরসের কবিতাগুলি বাংলা-সাহিত্যের শিরোধার্য রত্ন, আর তাঁহার গৃহ-জীবনাশ্রয়ী কবিতাগুলিও সেই সঙ্গে স্থান পাইবার যোগ্য। কিন্তু পাঠকের পক্ষে দুঃখের বিষয়, আর কবির পক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সেদিকে কবির অনুরাগী মনীষীগণ সঙ্কেত করেন নাই, করিয়াছেন এমন একদিকে যেখানে কবির বৈশিষ্ট্য নয়।

এষার আলোচনায় আসিবার আগে প্রদীপ ও কনকাঞ্জলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা সারিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কনকাঞ্জলিতে অনেকগুলি প্রেমের কবিতা আছে, তন্মধ্যে এখানে 'প্রত্যহ' ও 'নিদাঘে' উল্লেখযোগ্য। বড়াল কবির প্রেমের কবিতার সংখ্যা অল্প নয়। কিন্তু সেগুলি খুব স্ফূর্তি পায় নাই। প্রেমের পরকীয় রূপ বা রোমান্টিক রূপ বা আত্মিক রূপ তাঁহার অভিজ্ঞতার মধ্যে নয়, গার্হস্থ্য পরিবেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁহার প্রেম গভীর, মনোজ্ঞ ও সার্থক হইয়া যেন ওঠে না। কনকাঞ্জলি কাব্যের 'পথে' ও 'আয় ঘুম' কবিতা দুইটিতে একটি সহজ, সরল, স্বতঃস্ফূর্ত লিরিক উচ্ছ্বাস বিদ্যমান। শঙ্খ কাব্যের 'মধ্যাহ্নে' ও প্রদীপ কাব্যের 'শ্রাবণে' কবিতা দুইটির বিষয় প্রকৃতি

এবং এই বিষয়কে অবলম্বন করিয়া বিষয়কে অতিক্রম করিয়া কবির ব্যক্তিত্ব প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়া অপরূপ এক করুণামধুর সঙ্গীতময় চিত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। 'শ্রাবণে' কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি-বিষয়া কবিতা। রবীন্দ্র প্রতিভার বিশেষ ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-প্রভাব এড়াইয়া বড়াল কবি তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিকৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা কম গৌরব বা কম শক্তির কথা নয়। অথচ ভূমিকাগুলি এ বিষয়ে একেবারেই নীরব। দুর্ভাগ্য আর কাহাকে বলে।

এবারে এষার আলোচনা সারিয়া লওয়া যাইতে পারে।

নিবেদন কবিতায় কবি বলিতেছেন,—'মানবীর তরে কাঁদি, যাচি না দেবতা।' এই 'মানবী'কে অনেক সমালোচক নির্বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু একটু বিবেচনা করিলেই, কবিতাটির পটভূমি আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, এ 'মানবী'-নির্বিশেষ নারী নয়, বিশেষ নারী। কবি নিজেই বলিয়া দিয়াছেন—

সে নহে সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, সতী,
চিরোজ্জ্বল দেবমূর্তি কবিত্ব মন্দিরে।
ল'য়ে ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ মমতা ভকতি,
ক্ষুদ্র এক বঙ্গনারী দরিদ্র কুটীরে।

এই স্বীকারোক্তির পরে আর ইহার নির্বিশেষত্ব সম্বন্ধে তর্ক চলা উচিত নয়। এই নারী যেমন সাবিত্রী, সীতা প্রভৃতিও নয়, তেমনি 'মানস-সুন্দরী'র মানসী বা 'উর্বশী' কবিতার চিরন্তনী-নির্বিশেষা নারীও নয়। 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ' যে নারী তাহার সঙ্গে এই 'মানবী'র মূলগত প্রভেদ, এই মানবী মাতা, বধূ ও কন্যা, এই মানবী বিশেষ গৃহের গৃহলক্ষ্মী এবং একটি বিশেষ পরিবারের কর্ত্রী। এহেন বিশেষ নারীর গৌরবগাথা এষা কাব্য। এটুকু না বুঝিলে নানারূপ গোলমাল হইবার আশঙ্কা—এবং হইয়াছেও তাই।*

* এখানে প্রসঙ্গতঃ একটা কথা বলিয়া রাখি। চণ্ডীদাস-লিখিত 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' উক্তিটি সম্বন্ধেও অনুরূপ প্রমাদ হইয়াছে। অনেক ব্যাখ্যাতা কর্তৃক 'এই মানুষ'কে এমন নির্বিশেষ পদবী দেওয়া হইয়াছে——যেন সে ফরাসী বিপ্লবের দার্শনিকগণের কল্পিত Rights of Man-এর মানুষ। ব্যাখ্যাতাগণ এই সূত্রে ফরাসী বিপ্লবে যে বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহার পূর্বাভাস বাংলাদেশে আবিষ্কার করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। ভ্রান্ত দেশাত্মবোধ যে কিরূপ উন্মার্গগামী হইতে পারে, এটি তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কবি আর এক স্থানে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—‘মরণে কি মরে প্রেম?’ এ প্রেমও নির্বিশেষ নয়, একটি গৃহের প্রসঙ্গগত বিশেষ নরনারীর মধ্যে উপজাত প্রেম। আগেও বলিয়াছি, আবার বলিলেও ক্ষতি নাই যে, অক্ষয় বড়াল গৃহ জীবনের কবি, গৃহ জীবনের রসেই তিনি জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছেন, দাম্পত্য জীবনের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের মধ্যেই তাঁহার অমৃতরসাস্বাদ ঘটিয়াছে। তজ্জন্য তাঁহার নির্বিশেষে যাইবার প্রয়োজন হয় নাই; হয়তো সে ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না। ‘যেতে নাহি দিব’ কবিতায় একটি বালিকার স্নেহ-ব্যাকুলতা যেভাবে বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে, বিশেষ নির্বিশেষে পরিণত হইয়াছে সেরূপ দৃষ্টিতে জীবনকে দেখিবার ক্ষমতা অক্ষয়কুমারের নয়। গৃহের পরিবেশে এ প্রেম যেমন ফুটিয়াছে, গৃহের পরিবেশ মনে না রাখিলে এ প্রেমের মাহাত্ম্য ও মাধুর্য তেমনি পাঠকের মনেও ফুটিবে না। এখানেই এষা কাব্যের এবং এষা কাব্যের কবির বিশেষ ক্ষমতা ও সেই ক্ষমতার সীমা। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কাব্য হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্য পর্যন্ত বিশ্বগত প্রেমের বন্দনা অনেকবার ধ্বনিত হইয়াছে, কিন্তু গৃহলক্ষ্মীর বন্দনা বঙ্গ-সাহিত্যে বিরল। অক্ষয়কুমার সেই বন্দনার কবি, আরও দৃষ্টান্ত মিলিতে পারে, আপাততঃ কবি দেবেন সেনের নাম মনে পড়িতেছে।

এষা যে বড়াল কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য তাহা স্বীকার করিতে আপত্তি নাই, ইহা আগেই বলিয়াছি। কিন্তু এই কাব্যখানির মধ্যেও ভাল-মন্দর একটি মান নির্ণয় করা যায়। যে কবিতাগুলির বিষয় একটি বিশেষ রস বা বিশেষ ঘটনা সেগুলি রসবিচারে উৎকৃষ্ট, যে-সব কবিতায় একটি তত্ত্ব প্রকাশের চেষ্টা হইয়াছে, সেগুলি তেমন সার্থক হইয়া ওঠে নাই। কেন এমন হইয়াছে এতক্ষণ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, অক্ষয়কুমার তাত্ত্বিক কবি নহেন, গৃহ-জীবনের বিশেষ রসের কবি।

অক্ষয়কুমারের ভাষা ও ছন্দের উপরে বিহারীলালের প্রভাব অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথের কৈশোরের রচনাতে বিহারীলালের প্রভাব ছিল। সন্ধ্যাসঙ্গীতের সময় হইতে সে প্রভাব কাটিয়া গিয়াছে। বিহারীলালের প্রভাব কাটিবার পরে তিনি নিজের কবিসত্তাকে আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু বড়াল কবি গুরুর প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, বিহারীলালের ভাষা ও ছন্দকে কতক পরিমার্জিত করিয়া, কতক সংযত করিয়া নিজের ব্যবহারে লাগাইয়াছেন। তাঁহার স্বচ্ছ, সংযত অলঙ্কার-বিরল ভাষা এবং পদচারী মন্থর ছন্দ—এ দুই-ই তাঁহার সরল ও গৃহগতপ্রাণ ভাবের যোগ্য বাহন; এ দুয়ের যোগাযোগ তাঁহার কাব্যকে সার্থকতর করিয়া তুলিয়াছে।

এই প্রবন্ধের ফলে অক্ষয় বড়াল সম্বন্ধে পূর্ব সংস্কার যদি কতক দূরীভূত হয়—এবং তাঁহার ক্ষমতার স্বক্ষেত্রের দিকে যদি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তবে লেখকের প্রচেষ্টা সার্থক হইবে। আর যাই হোক, সৌভাগ্যের ছদ্মবেশে কবির জন্য যদি দুর্ভাগ্য বহন করিয়া না আনিয়া থাকি তাহা হইলেই যথেষ্ট মনে করিব।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৮৬৩-১৯১৩

সাহিত্যে খ্যাতির ইতিহাস বড় বিচিত্র। আজিকার তুঙ্গস্পৃষ্ট খ্যাতি পরদিবস বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন, আজিকার অখ্যাত গ্রন্থ পরদিবস মহোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত, এমন দৃষ্টান্ত অবিরল। আবার আজ যে ব্যক্তি বহুজনবন্দিত, দুদিন বাদে তাহার নামটিও কেহ উচ্চারণ করে না, এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। খ্যাতি-অখ্যাতির আর এক শ্রেণীর হেরফের দৃষ্ট হয় সাহিত্যের ইতিহাসে। একই লেখকের ভাগ্যে খ্যাতির বিচিত্র উদয়াস্ত ঘটিতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ ভলতেয়ারের নাম করা যাইতে পারে। জীবনকালে তিনি এপিক বা মহাকাব্য এবং ট্রাজেডির লেখকরূপে হোমার ভার্জিল ও রাসিন কর্নেইর সমান বা কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এখন আমরা সেই বিচিত্র হিসাব স্মরণ করিয়া বিস্মিত বোধ করি। অন্যপক্ষে Candide ও Zadig প্রভৃতি যে সব ব্যঙ্গরচনা ভলতেয়ারকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে, সেগুলিকে তখন তাঁহার প্রতিভার খুচরো পণ্য জ্ঞান করা হইত। কিন্তু রসবোধের নাগরদোলার আবর্তনে সেদিনের স্বীকৃতিতে হেরফের ঘটিয়া গিয়াছে। সমসাময়িক বিচারে অপেক্ষাকৃত অনাদৃত রচনাগুলির গৌরবেই আজ ভলতেয়ারের আদর।

নব্য বাংলা সাহিত্যের পরিধি ও ইতিহাস বিস্তারিত না হইলেও এমন হেরফেরের দৃষ্টান্ত বিস্তর পাওয়া যাইবে। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এমন একটি দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার জীবনকালে ও পরবর্তীকালে (অদ্যাবধি বলিলে ভুল হইবে না) তিনি নাট্যকার ও হাসির গানের লেখক বলিয়া সুপরিচিত। এমন কি তাঁহার সাহিত্যিক খ্যাতি হাসির গান ও নাটকের উপরে নির্ভর করে, এমন একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে। তিনি যে আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ, আষাঢে, মন্দ্র, আলেখ্য প্রভৃতি শক্তি ও সৌন্দর্যের আধার কাব্য লিখিয়াছেন, তাহা প্রায় স্মৃতি ও শ্রুতির পর্যায়ে গিয়া ঠেকিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস অনুমোদন বৃহৎ পাঠকসমাজের বিচারের তলে চাপা পড়িয়াছে, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিখ্যাতি আজ কিংবদন্তী প্রায়।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা সম্বন্ধে রুচি পরিবর্তনের হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছে, যদিচ এখন পর্যন্ত তাহা তাঁহার আনুকূল্য করিয়াছে বলিতে পারি না। নাট্যকার হিসাবে তাঁহার যে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা ছিল, আজ আর তাহা নাই। মঞ্চীয় সাফল্যের উপরেই তাঁহার নাটকগুলির ভিত্তি। কিন্তু রঙ্গমঞ্চ আজ তাঁহার

নাটক সম্বন্ধে তেমন উৎসাহী নহে, কখনও কখনও তাঁহার দু একখানি নাটক দু-চার দিনের জন্য মাত্র অভিনীত হইয়া থাকে। এমন হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাঁহার জনপ্রিয় নাটকগুলির মূলধন "স্বদেশী আন্দোলনের" সময়কার জাতীয়ত্ববোধের গৌরব। সে উত্তেজনা আজ অপসৃত, জাতীয়তাবোধ এখন নূতন আধার সন্ধান করিয়াছে, এমন ক্ষেত্রে নাটকগুলির পূর্বতন খ্যাতি ম্লান না হইয়া পারে না। কিন্তু এখনও তাঁহার কাব্যগুলির প্রতি পাঠকসমাজের, রসিকসমাজের ও প্রকাশকগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে বলা যায় না। অথচ যখন তাঁহার একদিকের খ্যাতির অস্ত ঘটিয়াছে, তখনই সুযোগ অন্যদিকের খ্যাতির উদয় ঘটিবার। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার না ঘটিলে দ্বিজেন্দ্রলাল তথা বাঙ্গলা সাহিত্যের দুয়েরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির সমসাময়িক জন-প্রিয়তার কারণ অনুমান করিতে এখন আমাদের বেগ পাইতে হয়। ঘটনাবিন্যাস অস্বাভাবিক। চরিত্র-বিন্যাস সর্বদা সাধারণ মনস্তত্ত্বের অধীন নয়। বৃদ্ধ বন্দী শাজাহান আগ্রা দুর্গ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সিংহাসন পুনরধিকার করিবেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের কর্ণধার চাণক্য একটি আস্ত বর্বর। আর সর্বোপরি অতিনাটকীয় ভাষা। কিন্তু বোধ করি সে কালটাই অতিনাটকীয় ছিল। নতুবা রবীন্দ্রনাথের "অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া" গানটিকে "স্বদেশী গান" কল্পনা করিয়া লোক নিজেদের উত্তেজিতবোধ করিত না। খুব সম্ভব প্রত্যেক যুগই অল্পবিস্তর অতি-নাটকীয়তাগ্রস্ত, তবে উক্ত লক্ষণ নানা রকম থাকে। পরবর্তীকালে "ভীম ভাসমান মাইন" ছত্রকে উচ্চাঙ্গের কাব্য মনে করে কিরূপে? বর্তমান যুগের জনপ্রিয় রচনার বিশ্লেষণ করিলেও উক্ত ব্যাধির পরিচয় পাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু রক্ষা এই যে, এক যুগ পূর্ববর্তী যুগের লক্ষণকে বর্জন করে। পরবর্তী যুগও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলিকে বর্জন করিবার লক্ষণ দেখাইতেছে। কিন্তু নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের আসন পূর্বতন গৌরবচ্যুত হইলেও তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হইবে না। বরঞ্চ নূতন কাল তাঁহার অন্য শ্রেণীর রচনাকে নূতন গৌরবেপ্রতিষ্ঠাপিত করিবে। সে রচনা তাঁহার কাব্যের, আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ, আষাঢ়ে মন্দ্র, আলেখ্য ও ত্রিবেণী। প্রধানত এই কয়খানি গ্রন্থের উপরেই তাঁহার স্থায়ী খ্যাতির অক্ষয় আসন। আর সেই সঙ্গে তাঁহার হাসির গানগুলি। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় পূর্বোক্ত কাব্যগ্রন্থগুলি। কিন্তু সে আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে কবির জীবনীর একটা কাঠামো পাঠকের সম্মুখে ধরিতে ইচ্ছা করি। দুয়ে মিলাইয়া পড়িলে দেখা যাইবে তাঁহার কাব্যে ও জীবনে কী অচ্ছেদ্য যোগ।

২

১৮৬৩ সনে দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কার্তিকেয় চন্দ্র রায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৮৪ সনে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম-এ পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। এম-এ পরীক্ষা দিবার পরে স্বাস্থ্যান্বেষণে তিনি দেওঘরে যান। তৎকালে লিখিত শ্মশান-সঙ্গীত নামে কবিতাটি পরবর্তীকালে প্রকাশিত "ত্রিবেণী" গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। এখানে রাজনারায়ণ বসুর সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী স্কলারশিপ পাইয়া তিনি কৃষিবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া তিনি ডেপুটিগিরিতে নিযুক্ত হন। এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৮৭ সনে তিনি বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কন্যা সুরবালা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তখনকার দিনে বিলাত প্রত্যাগত হিন্দুকে অল্পবিস্তর সামাজিক নির্যাতন ভোগ করিতে হইত। দ্বিজেন্দ্রলালকেও হইয়াছিল। এই অভিজ্ঞতা এবং পত্নীর প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ তাঁহার জীবনে ও কাব্যে দুইটি স্থায়ী প্রভাব। আর এই দুইটি প্রভাবের ফলেই তাঁহার কাব্যগুলি এক বিচিত্র রূপ লাভ করিয়াছে। সেকথা পরে বিস্তারিত ব্যাখ্যার চেষ্টা করিব।

তৎকালীন হাকিম-সাহিত্যিকগণের জীবন যেমন হইত, দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের ছকও প্রায় তেমনি। সামাজিক সম্মান, উপর ওয়ালার খোঁচা ও শরীরের অকাল-অপটুতা সমস্তই পুরামাত্রায় তিনি পাইয়াছেন। শেষে ব্যাধিজনিত অপটুতার জন্য তিনি ১৯১৩ সনের ২২শে মার্চ চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহার দশ বৎসর আগে ১৯০৩ সনের ২৯শে নভেম্বর একটি পুত্র একটি কন্যা রাখিয়া সুরবালা দেবী লোকান্তর প্রয়াণ করেন। শেষ জীবনে দ্বিজেন্দ্রলাল "ভারতবর্ষ" পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ করেন। কিন্তু প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবার আগেই ১৯১৩ সনের ১৭ই মে সন্ন্যাস রোগে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এই সময়ে তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইতে দুই মাস বাকী ছিল।

৩

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক জীবনকে স্ত্রী-বিয়োগের আগে ও পরে দুই ভাগে সহজেই ভাগ করা যায়। "তারাবাই" ব্যতীত তাঁহার যাবতীয় জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটকের সৃষ্টি স্ত্রী-বিয়োগের পরে। নাটক পাঠে, নাটকের অভিনয় দেখায়, নাটক রচনায় তাঁহার ঝোঁক গোড়া হইতে ছিল। কিন্তু এই সময়কার নাটকগুলির

বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলি রঙ্গমঞ্চের চাহিদা অনুসারে লিখিত এমন হইবার অনেক কারণ থাকা সম্ভব। প্রথম অভিনয়যোগ্য নাটকের চাহিদা। দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গ-জনিত জাতীয়তাবোধের প্রসার। আরও একটি কারণ থাকা অসম্ভব নয়। স্ত্রী-বিয়োগের পরে সংসারের ও মনের হঠাৎ শূন্যতা পূরণ করিবার জন্য বাহিরের উত্তেজনার কিছু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল তাঁহার পক্ষে। রঙ্গালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সেই শূন্যতা পূরণ করিতে পারে এই আশায় তিনি মঞ্চোপযোগী নাটক রচনায় উদ্যোগী হইয়া উঠিয়াছিলেন এমন খুবই সম্ভব। যে পত্নী-প্রভাবের আগে উল্লেখ করিয়াছি, এখানেও সেটি পুনরায় আসিয়া পড়িতেছে। বস্তুত বিষয়টি গুরুতর।

৪

সাহিত্যিক জীবনের সূচনাতেই দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বাঙালী সাহিত্যিকগণের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম দৃষ্টিতেই কবির শক্তি ও মৌলিকতা সম্বন্ধে সচেতন হন এবং "আর্যগাথা", "আষাঢ়ে" ও "মন্দ্র" কাব্যের গুণপনা বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহাতে তাঁহার কবি-স্বীকৃতি লাভ ত্বরান্বিত হইয়াছিল। শেষের দিকে এই ঘনিষ্ঠতায় ছেদ পড়িয়াছিল। এটি তাঁহার পক্ষে দুর্ভাগ্য।

৫

"আর্যগাথা" (কবিতা ও গান) দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ সনে, তখন কবির বয়স ত্রিশ বৎসর।

"আর্যগাথা"র আলোচনা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, বইখানাতে কবিতা ও গান দুই শ্রেণীর রচনাই আছে। এই প্রসঙ্গে কবিতা ও গানের স্বভাবগত পার্থক্য দেখাইয়া সমস্ত বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। কাজেই অধিক বলিবার নাই—রবীন্দ্রনাথের পরে অধিক বলিবার থাকে না। আমরা অন্য তুলিব।

কবিতা হউক বা গান হউক "আর্যগাথা"র প্রধান আকর্ষণ রচনাগুলির অকৃত্রিম গীতি-মাধুর্য। "আলেখ্য" ও "ত্রিবেণী"র কোন কোন কবিতা বাদে

এমন স্বতঃস্ফূর্ত গীতি-মাধুর্য আর তাঁহার কাব্যে দেখা যায় না। এমন কি তাঁহার জনপ্রিয় সঙ্গীতগুলিও, অধিকাংশস্থলে জনতার ও রঙ্গমঞ্চের তাগিদে রচিত বলিয়া এই সম্পদ হইতে বঞ্চিত। আগে বলিয়াছি যে, "আর্যগাথা" দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার একটি মৌলিক সূত্র। তাহা এই কারণে। প্রেমের মাধুর্য, মহিমা ও সৌন্দর্য স্বতঃস্ফূর্ত গীতি-উচ্ছ্বাসে নির্বিচারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথও মুখ্যত এই কথাটাই বিষদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

এখন, এই গীতি-উচ্ছ্বাস কবি-চিত্তের অকৃত্রিম প্রকাশ হইলেও ইহাতে কবি-প্রতিভার যথার্থ বিশিষ্টতা তেমন প্রকাশ পাই নাই। অধিকাংশ গান-জাতীয় রচনা পড়িতে পড়িতে রবীন্দ্রনাথের "ছবি ও গান" "কড়ি ও কোমল" এবং "মায়ার খেলা"র অনেক রচনা মনে পড়িয়া যায়।

দ্বিজেন্দ্র-কাব্য-প্রতিভার বিশিষ্ট সৃষ্টি হিসাবে "আর্যগাথা" স্মরণীয় নয়, কাব্যখানা স্মরণীয় হইয়া থাকিবার অন্য কারণ আছে। যে দুটি মৌলিক সূত্রে তাঁহার বিশিষ্টতম কাব্য রচিত তাহার একটিকে পাইতেছি "আর্যগাথা"য়। সেটি লিরিসিজ্‌ম্ বা গীতি-উচ্ছ্বাস। অন্য সূত্রটির আলোচনা করিব "আষাঢ়ে" প্রসঙ্গে। আর এই স্বতঃস্ফূর্ত গীতি-উচ্ছ্বাসের মূল প্রেরণাদাত্রী যে কবি-পত্নী, তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কবি-পত্নীর প্রভাবের উল্লেখ আগে করিয়াছি। এখন আরও দু'-একটি কথা বলিবার সুযোগ আসিয়াছে। কবি-পত্নীর অভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা নূতন বল ও স্ফূর্তি পাইয়াছে। আবার কবিপত্নীর অভাবে তাঁহার প্রতিভা কেমন যেন তির্যক পথ অবলম্বন করিয়াছে। কবিপত্নী জীবিত থাকিলে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা পরবর্তী পথ ধরিত কিনা সন্দেহ! আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাহিত্যিক বিবাদে তিনি নামিতেন কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে।

"আষাঢ়ে" কাব্যের আলোচনা উপলক্ষ্যে কাব্যখানির কোন কোন স্থলে ভাষার ত্রুটি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "পদ্যকে সমিল গদ্যরূপে চালাইবার কোন হেতু নাই। ইহাতে পদ্যের স্বাধীনতা বাড়ে না। বরঞ্চ কমিয়া যায়।"

মাঝে মাঝে পদ্যের গদ্যরূপ-ধারণ দ্বিজেন্দ্র-কাব্যের একটি প্রধান দোষ—আর ইহা যে কেবল তাঁহার "আষাঢ়ে" বা "মন্দ্র"-এর মত ভাষা ও ছন্দের নূতন পরীক্ষা ক্ষেত্রেই দৃষ্ট হয় এমন নয়। "আর্যগাথা"র বিশুদ্ধ লিরিক উচ্ছ্বাসের মধ্যেও গদ্যের উপলখণ্ড অবিরল।

কিন্তু আসিয়াছে সত্য ও সুন্দরতম।
তখন সৌন্দর্যে এলেছিল,
প্রেমে আস নাই।
সন্ধ্যাকাশ অকস্মাৎ একটি দিগন্তব্যাপী
ঝঙ্কার হইত,
হয়ত আশ্চর্য তাহা।
কিন্তু হইত না অর্ধমধুর সঙ্গীত ও।

ছত্রগুলি ভাষাপ্রকৃতিতে ও ভাবপ্রকৃতিতে বিশুদ্ধ গদ্য।

কাব্যখানিতে দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার একটি প্রধান সূত্র ও একটি প্রধান দোষের সাক্ষাৎ পাইলাম— এ কথা মানিয়া লইলেও রবীন্দ্র-প্রভাব সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য-বিচারে "আর্যগাথা"র বিশেষ স্থান ও গুরুত্ব স্বীকার করিতে হয়।

৬

"আষাঢ়ে" ব্যঙ্গ কাব্য। প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সনে, তখন কবির বয়স তেত্রিশ বৎসর। এখানা "আর্যগাথা" হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পর্যায়ের কাব্য। দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে তথা বঙ্গসাহিত্যে অভিনব এই কাব্যে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার স্বকীয়তা প্রথম প্রকাশ পায়। "আর্যগাথা" রবীন্দ্র-প্রভাবিত, "আষাঢ়ে" অনন্য প্রভাবিত।

ভূমিকায় কবি লিখিতেছেন, "এ কবিতাগুলির ভাষা অতীব অসংযত ও ছন্দোবন্ধ অতীব শিথিল। ইহাকে মিশ্র গদ্য নামেই অভিহিত করা সঙ্গত। কিন্তু যেরূপ বিষয় সেইরূপ ভাষা হওয়া বিধেয় মনে করি। হরিনাথের শ্বশুরবাড়ির যাত্রা করিতে মেঘনাদবধের দুন্দুভিনিনাদের ভাষা ব্যবহার করিলে চলিবে কেন?"

কাব্যখানাকে একমাত্র অনন্যপ্রভাবিত বলিয়াছি, কিন্তু খুব সম্ভব কিছু প্রভাব বা প্রেরণা ইহার মূলে আছে। সেটি বায়রনের ডন জুয়ানের প্রভাব। কথাটা রবীন্দ্রনাথেরও মনে পড়িয়াছে। "আষাঢ়ে"র রচনারীতি আলোচনা উপলক্ষ্যে তিনি বলিতেছেন, "বায়রনের ডন জুয়ানে কবি অবলীলাক্রমে যথেচ্ছ কৌতুকের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু নির্দোষ ছন্দের সুকঠিন নিয়মের মধ্যেই সেই অনায়াস লীলাভঙ্গী পাঠককে এরূপ পদে পদে বিস্মিত করিয়া তোলে।"

দ্বিজেন্দ্রলাল বায়রনের কাব্যের বিশেষ ভক্ত ছিলেন—ইহাও আমাদের অনুমানের স্বপক্ষে একটি প্রমাণ। কিন্তু "আষাঢ়ে"র পরবর্তী "মন্দ্র" কাব্য ডন

জুয়ানের প্রভাবের প্রশস্ততর ক্ষেত্র। ডন জুয়ান কাব্যে নব রসকে একসঙ্গে গুলিয়া বিতরণ করা হইয়াছে, মহৎ ও তুচ্ছ পাশাপাশি দাঁড়াইয়া অভিনবত্ব প্রকাশ করিয়াছে—ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্য। সে বৈশিষ্ট্য "আষাঢ়ে" কাব্যে নাই—আছে "মন্দ্র" কাব্যের কোন কোন কবিতায়।

আমরা আগে বলিয়াছি যে, দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার দ্বিতীয় সূত্রটির প্রথম নিঃসংশয় প্রকাশ "আষাঢ়ে" কাব্যে। সেটি কী? "আর্যগাথা"য় যেমন বিশুদ্ধ গীতিমাধুর্যের নিষ্কলঙ্ক প্রকাশ, এখানে তেমনি প্রকাশ নিদারুণ ব্যঙ্গরসের। একটি ব্যক্তিমনের প্রকাশ, অপরটি সামাজিক মনের। অনেক সময়ে এ দুই গুণ একই মানসে থাকে, অনেক সময়ে থাকে না। দ্বিজেন্দ্রলালে এই দুই গুণ যে কেবল প্রচুর পরিমাণে ছিল তাহা নহে, স্বাভাবিক অধিকারে ছিল। বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, গীতি-মাধুর্য ও ব্যঙ্গ-রস দুটিই তাঁহার প্রতিভার মৌলিক গুণ। মনে দুইটিই ছিল এবং দুটি দুই উৎস-মুখে নির্গত হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, দুটি স্বতোবিরুদ্ধ গুণ একই কবিমানসে থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাদের স্ফুরণের ও বিকাশের কি কোন নিয়ম আছে? থাকাই সম্ভব। দুটি স্বতোবিরুদ্ধ গুণের কখন কোনটি কী উপলক্ষ্যে স্ফুরিত হইবে, তাহার কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। জীবনের কোন বিশেষ অভিজ্ঞতা বা আঘাতের ফলে বিকাশ ত্বরান্বিত হয়, এই পর্যন্ত বলিতে পারা যায়। একটা উদাহরণ দিই। ভলতেয়ার যৌবনে একবার রাজরোষে বাস্তিল কারাদুর্গে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। সেই হইতে তাঁহার চরিত্রে একটা বাস্তিল কমপ্লেক্স দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। ধর্মান্ধতা ও রাজতন্ত্রকে আক্রমণ করিয়া তিনি সারা জীবন যে সমস্ত রচনা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাদের মৌলিক প্রেরণা ঐ বাস্তিলবাসের আঘাত বা বাস্তিল কমপ্লেক্স! উহা হিসাবে গণ্য না করিলে ভলতেয়ারের রচনার স্বরূপ বিচারে ভুল হইবে। এখন অনেক লেখকের জীবনেই এমন অভিজ্ঞতা ঘটিয়া থাকে—আর তাহার ফল ফলে তাহার সাহিত্য-শাখায়। বিলাতফেরত দ্বিজেন্দ্র-লাল বিবাহের পরে সমাজ-কর্তৃক একঘরে হইয়াছিলেন। সমাজের এই অন্যায় অনুশাসনটি তিনি ক্ষমা করিতে পারেন নাই—প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন "একঘরে" নক্শা রচনা করিয়া। ব্যঙ্গরসের আভাস "একঘরে" গ্রন্থে, পূর্ণ বিকাশ "আষাঢ়ে" কাব্যে। দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার গীতি-উচ্ছ্বাসের মূলে পত্নীর প্রেম, আবার ব্যঙ্গরসের মূলে বিবাহ সম্পর্কে একঘরে হইবার অভিজ্ঞতা। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, পত্নী সুরবালা দেবীই প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে কবির প্রতিভার দুটি স্বতোবিরুদ্ধ সূত্রের

মূলে বিরাজমানা। সেইজন্যই প্রবন্ধারম্ভে তাঁহার বিবাহ ও পত্নীকে কবিজীবনে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময় উল্লেখ করিয়াছি। কবির বিচিত্র প্রতিভার ও তাহার বিকাশের বিচিত্র ইতিহাস আমি যেমন বুঝি বর্ণনা করিলাম।

৭

"আষাঢ়ে" সম্বন্ধে এতদধিক যাহা বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ সে সমস্ত নিঃশেষে বলিয়াছেন। "আষাঢে" কাব্যে দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার স্বকীয়তা প্রথমবার নিঃসংশয়রূপে দেখা দিয়াছে। ইহার চালচলন, ভাব ভাষা সমস্তই নূতন ও দ্বিজেন্দ্রীয়। ইহার গতি-বিধিতে পাল্কির তাল। নিরেট জোয়ান বেহারাগুলি নিছক গদ্য, কিন্তু তাহারা যখন তালে তালে পা মিলাইয়া সুর তুলিয়া চলিতে শুরু করে, তখন একপ্রকার অনির্বচনীয়তা ধ্বনিত হয়—সেইটুকুই পদ্য, সেইটুকুতেই কবিত্ব, সেইটুকুতেই কবির শিল্পের জাদু। ফলত, ইতিপূর্বে আর কোন কবি গদ্যকে দিয়া এমন স্বচ্ছন্দভাবে পদ্যের পাল্কি বহন করাইতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ "আষাঢে" ও "মন্দ্র" কাব্যের আলোচনায় এই বাহাদুরি স্মরণ করিয়া বারংবার সপ্রশংস বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।

৮

সব দিক বিচার করিলে "মন্দ্র" কাব্যখানাকে দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ম্যাথু আর্নল্ড যাহাকে "হাই সিরিয়াসনেস" বলিয়াছেন, সেই দৃষ্টি এখানে দেখিতে পাই। "আর্যগাথা"র জীবনতরঙ্গের সুখকরোজ্জ্বল লাবণ্য ও সঙ্গীত, "আষাঢে" কাব্যে অচল অটল তীরভূমিকে লক্ষ্য করিয়া প্রতিভার ব্যঙ্গজালা-অঙ্কিত শুক্তিদাম নিক্ষেপ, কোথাও জীবন সমুদ্রের গহনে প্রবেশের চেষ্টা নাই। সে চেষ্টা প্রথম দেখিলাম এই কাব্যখানিতে। জীবনসমুদ্রের অতলে কবি প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন কিনা কিংবা রত্নাকরের গর্ভ হইতে কী মণিমুক্তা আহরণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সে বিচার প্রাসঙ্গিক হইলেও অপরিহার্য নয়। আসল কথা এই যে, "মন্দ্র" কাব্য পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, কবি কেবল আর জীবনাম্বুধির উপরিতলে থাকিয়া সন্তুষ্ট নন, তলাইয়া দেখিবার একটা ঝোঁক তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। ইহাই ম্যাথু আর্নল্ড বর্ণিত "হাই সিরিয়াসনেস"।

কিন্তু এই 'গহন গম্ভীর ভাবটি' সম্বন্ধে পাঠক যে সব সময়ে সচেতন হয় না,

তাহার কারণ "মন্দ্র"র বিচিত্র শিল্পকলা দুইটি স্বতোবিরুদ্ধ শিল্পরীতির সমন্বয়ে গঠিত। "আর্যগাথা"র অকৃত্রিম গীতিমাধুর্য এবং "আষাঢ়ে"র অকৃত্রিম ব্যঙ্গ বিক্ষোভ, এই দুই বস্তু স্বভাবত ভিন্ন জাতীয়। দ্বিজেন্দ্রলালের হাতের গুণে ইহারা আপন আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও একটি অখণ্ড শিল্পকলায় পরিণত হইয়াছে। যে পাঠক এই বৈশিষ্ট্য মনে না রাখিয়া "মন্দ্র" অধ্যয়ন করিবে, তাহার ভুল বুঝিবার আশঙ্কা। ঠিক কোন্ শ্রেণীর শিল্প আশা করিতে হইবে ধারণা না থাকিলে অভিনব শিল্পের রসগ্রহণে ভুল না হইয়া যায় না। সাহিত্যে লিরিসিজম্ ও স্যাটায়ার এর সার্থক সংমিশ্রণের মত কঠিন কাজ অল্পই আছে। বায়রনের ডন জুয়ান ও হাইনের অনেক রচনা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দ্বিজেন্দ্রলাল এই দুরূহ শিল্পে চূড়ান্ত সার্থকতা লাভ না করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে যে, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি শ্রেষ্ঠ এবং খুব সম্ভব একক।

"মন্দ্র"র কতকগুলি বিশিষ্ট কবিতা লইয়া আলোচনা করিলে বিষয়টি আর একটু পরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা। "হিমালয় দর্শনে", "নবদ্বীপ," "সমুদ্রের প্রতি "বায়রনের উদ্দেশে," "তাজমহল" প্রভৃতি কবিতা স্বতোবিরুদ্ধের সংমিশ্রণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এগুলিতে লিরিকে স্যাটায়র-এ অপূর্ব মেশামেশি। এ যেন লিরিকের পক্ষিরাজের অশ্বপৃষ্ঠে স্যাটায়ার-এর বর্মধারী চেঙ্গিস খাঁ বা তৈমুর লং।

প্রত্যেকটি কবিতাতেই দেখা যাইবে যে, বস্তুর গহনে প্রবেশ করিবার জন্য কবি উৎসুক, কিছুদূর প্রবেশ করিতেও তিনি সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন, কতদূর? সে প্রশ্নের উত্তর কবি নিজেই অন্য একটি কবিতায় দিয়াছেন—

'ভূধর দুরধিগম্য, দূর হ'তে অতিরম্য,
শুভ্র নীল তুষারকিরীটি—
নিকটে বিকট শীর্ণ, বন্ধুর কঙ্কর কীর্ণ,
শুষ্ক—যেন উকিলের চিঠি।'

রবীন্দ্রনাথ সমুদ্রের প্রতি কবিতায় যদি মানবজীবনের সহিত প্রকৃতির আদিম সম্বন্ধকে আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন, তাজমহল (শাজাহান) কবিতায় যদি মানবাত্মার মহৎ অপূর্ণতার দিব্য আশাবাদ ঘোষণা করিতে সক্ষম হন, আর দ্বিজেন্দ্রলাল যদি এতদধিক না পারেন, তবে তাহার কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথ গহন গম্ভীরের যে অতলে তলাইয়াছেন, সেখানে অকলঙ্ক মণিমুক্তার ভাণ্ডার, আর দ্বিজেন্দ্রলাল তত নীচে নামিতে পারেন নাই, যেখান হইতে মুক্তা সংগ্রহ করিয়াছেন, সেখানে মুক্তায় ও বালুতে মেশামেশি। দুজনের প্রবণতা একই, "হাই

সিরিয়াসনেস”-এ প্রবেশের প্রবণতা, তবে একজনের ডুব দিবার ক্ষমতা বেশী, একজনের কম—তাহারই দরুণ ফলের এই পার্থক্য।

আসল কথা, ডুবিবার ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়, ডুবিবার ক্ষমতা বা একাগ্রতাও আবশ্যক। দ্বিজেন্দ্রলালের কল্পনায় এই একাগ্রতার ন্যূনতা আছে। রবীন্দ্রনাথ সিন্ধু ও পৃথিবীকে মাতা ও কন্যা কল্পনা করিয়া সমস্ত কবিতাটি একটি সম্বন্ধের উপরে গড়িয়া তুলিয়াছেন। কল্পনা এখানে একাগ্র, সম্বন্ধের ঐক্য ছাড়া দ্বিত কবির চোখে পড়ে নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের হিমালয় কখনও কখনও যোগী, কুম্ভকর্ণ, কখনও কুঁড়ের বাদশাহ, কখনও জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ। কোন ধারণার সঙ্গে কোন ধারণার মিল আছে কি? যোগী বৃদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু কুঁড়ের বাদশাহ কেন হইতে যাইবে? আবার কুম্ভকর্ণের পক্ষে যোগী হওয়া বা জরদ্গব বৃদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। সমুদ্র সম্বন্ধেও কল্পনার এই অস্থিরচিত্ততা। সমুদ্র একবার পৃথিবীর স্বামী। তারপরে দুরন্ত দস্যু। তারপরে নিতান্তই নৈসর্গিক একটা জলনিধি। অবশেষে “কিংবা তুমি বুঝি কোন যোগিবর।” উপমার অস্থিরতার মূলে কল্পনার একাগ্রতার অভাব—অর্থাৎ ডুবিবার ক্ষমতার ন্যূনতা। যে গভীরে নামিলে অকলঙ্ক মুক্তা আহৃত হইত, সে গভীরে নামিবার শক্তি না থাকায় হাতে উঠিতেছে বালুমিশ্র মুক্তা। আবার এই একাগ্রতার অভাব হইতেও শিল্প ব্যাপারে ত্রুটি আসিয়া পড়িয়াছে। ধনুকে টঙ্কার বীররসের উদ্দীপনা দেয়, কিন্তু মনুষ্যদেহে ধনুষ্টঙ্কার ব্যাধি ছাড়া কিছু নয়। কবিতাগুলির ভাষায় কোন কোনখানে বিকারের আক্ষেপ লক্ষ্য হয়। ডন জুয়ানের ভাষা কেমন স্বচ্ছ, বিদ্যুদ্বৎ, স্বর্গ-মর্ত স্পর্শ করিয়াও কোথাও চেষ্টার ক্ষণ দেখায় না। “মন্দ্র”র কবিতায় চেষ্টার লক্ষণ চোখে পড়ে, কবি যেন বারে বারে নিজেকে খোঁচা মারিয়া সচেতন করিয়া তুলিয়াছেন হয়তো এই ত্রুটির আনুষঙ্গিকরূপে পদ্য, মাঝে মাঝে “আষাঢ়ে”র চেয়ে অধিকতর ক্ষেত্রে, নিছক গদ্যে পরিণত হইয়াছে। কবির কলম যখন গদ্য লিখিয়া ফেলে, তখন বুঝিতে হইবে কলমে আর কেহ লিখিতে শুরু করিয়াছে।

তুমি চালাইয়াছিলে তব রশ্মিরথ,
তাহার উপর দিয়া,
করিয়া চকিত বিস্মিত জগৎ॥

*　　*　　*　　*

ইহাতেই মনুষ্যত্ব, মহত্ত্ব॥

বিলাসের চরম করিয়া গেছে ভবে মোগল ॥

*　　*　　*　　*

আজি তুমি সম্রাজ্ঞীর

স্মৃতি সঞ্জীবিত করো এ বিশ্ব ভিতর ॥

*　　*　　*　　*

কেন পান করিয়াছিলাম

সেই আপাতমধুর বিষ

হইতে আমরণ সেই বিষে জরজর ॥

*　　*　　*　　*

নহে কিছু রাজত্ব ইহার ;

ইহার রাজত্ব নয় গণনায় ; নিত্য ব্যবসার

প্রেম হৃদয়ের সমতান, সঙ্গীত আত্মার।

"মন্দ্র" কাব্যে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কবির একটি মিশ্র মনোভাব। এই মিশ্র ভাবের চূড়ান্ত ও সূক্ষ্ম প্রকাশ সুখমৃত্যু কবিতায়। মৃত্যুকালীন আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

"আমি যবে মরিব, আমার নিজ খাটে গো
'আয়েসে' মরিতে যেন পারি,
চাকরির জন্য যেন আমার নিকটে গো
কেহ নাহি করে উমেদারি,"

আর অন্যান্য আকাঙ্ক্ষার মধ্যে—

"রূপসী শ্যালিকা পড়ে একটি কবিতা গো
যার শীঘ্র অর্থ হয় বোধ ,
গাহিতে হাসির গান যেন সে সময় গো
কেহ নাহি করে অনুরোধ।"

এমন অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা শুনিয়া কাবপত্নী বলিলেন,

"সহজ ভাষায় বলো আসল কথাটি যাহা
মরিতে তোমার ইচ্ছা নাই।"

১০

বাংলা কাব্যে দাম্পত্যরসের কবিতার অভাব নাই। দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়-কুমার বড়াল প্রভৃতির কাব্য প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। এই সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যও ধরা যাইতে পারে। তবে প্রভেদ এই যে, দেবেন্দ্র সেন অক্ষয় বড়াল দাম্পত্যরসের মধ্যেই প্রেমের পূর্ণ বিকাশ দেখিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে এ কথা সর্বাংশে সত্য নহে। দাম্পত্যজীবনের বাহিরে ও উর্ধ্বে প্রেমের যে বিচিত্র ও ব্যাপক মূর্তি আছে, তার সঙ্গে তিনি পরিচিত। আর এই দুটি রূপের সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া তাহার দাম্পত্যরসের কবিতা এমন জটিল ও বিচিত্র। আর এই দুটি কোটিতে পরিভ্রমণশীল বলিয়া তাঁহার এই শ্রেণীর কাব্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে শিথিলকেন্দ্র, কিঞ্চিৎ অস্থির অনেক সময়ে একটি রসকেন্দ্রে স্থায়িত্ব না পাওয়ায় দণ্ড দুই টলমল করিয়া, হয় এদিকে, নয় ওদিকে গড়াইয়া পড়ে। প্রেমের দাম্পত্য বা প্রাত্যহিক মূর্তি আর প্রেমের রোমান্টিক বা শাশ্বত-মূর্তির মধ্যে কোন একটিকে বিশেষভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে তিনি পারেন নাই।

নিষ্ঠুর সংসার স্বার্থপর,
স্বার্থে নিমগ্ন থাকুক;
তুমি দাও প্রেম, তুমি দাও
শান্তি স্নেহ এতটুক।
("দাঁড়াও"—"মন্দ্র")

ইহা দাম্পত্যরসের চিত্র—কিন্তু অধিকক্ষণ এ-ভাবটি স্থায়ী হয় নাই। ঐ কাব্যের কুসুমে কণ্টক কবিতায় তিনি বলিয়াছেন—

এই প্রেম এই ঈপ্সা
শুধু কাম শুধু লিপ্সা,
এ শুদ্ধ বিধির বিধি, ভবে
রাখিতে তাঁহার সৃষ্টি;
আর এই রূপ বৃষ্টি—
প্রলোভনে বাঁধিতে মানবে।

তিনি একবার বলেন—

এসেছিলে তুমি
বসন্তের মতো মনোহর
প্রাবৃটের নবস্নিগ্ধঘন সম প্রিয়।

এসেছিলে তুমি
শুধু উজলিতে, স্বর্গীয়
সুন্দর! ("উদ্বোধন"—"মন্ত্র")

কিন্তু মুহূর্ত পরেই—

বুঝিয়াছি এ আমার নির্বাসন;
বুঝিয়াছি এই শুদ্ধ সেই মধ্যে আকর্ষণ,
যাহা তুচ্ছ ক'র উচ্চে উঠিয়াছিলাম, মূঢ়
আমি; সেই আকর্ষণে আবার নিক্ষিপ্ত রূঢ়,
নিষ্করুণ মর্ত্যভূমে।

ইহাই কেন্দ্রচ্যুতির পরিণাম। এমন কেন হয়, সংক্ষেপে আগে বলিয়াছি প্রেমের দুই মূর্তিকে সমন্বিত করিতে না পারিয়া দুই কোটির মধ্যে অসহ মাকুর মত তিনি নিরন্তর নিক্ষিপ্ত প্রতিনিক্ষিপ্ত হইয়াছেন।

গৃহের বনিতা ছিলে টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়।

বা-তে ভাবমার্গের যে সমন্বয় বোঝায় (খুব সার্থক সমন্বয় নয়), সেখানেও তিনি পৌঁছিতে পারেন নাই।

পত্নীবিয়োগের পরে লিখিত দাম্পত্যরসের অনেক কবিতা "আলেখ্য" ও "ত্রিবেণী" কাব্যে মুদ্রিত হইয়াছে। এগুলির প্রকৃতি ভিন্ন। এতদিন কবির মনে একটি অসমন্বয় ছিল—প্রত্যহ ও শাশ্বতের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। এবারে তাহা যেন দূর হইয়াছে। এমন হইবার কারণ সহজেই অনুমেয়। মৃত্যু প্রত্যহের যবনিকাখানি অপসারণ করিয়াছে—এখন আর দুটি মূর্তি নাই, আছে একটি, অপগত প্রত্যহের বিরাট আকাশে শাশ্বত। বলা যাইতে পারে যে, মৃত্যু বাম হাতে পত্নীকে অপহরণ করিয়া দক্ষিণ হাতে তাঁহার নিঃসপত্ন মূর্তি কবির কল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছে। বিরহভাস্বর হইয়া উঠিয়া শূন্য মন্দিরে স্বর্ণসীতা স্থাপিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথেও অনুরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করি। পত্নীবিরহিত রবীন্দ্রনাথের "স্মরণ" কাব্য কলমের কর্তব্যপালনমাত্র। পরবর্তী "শিশু" কাব্যেই অন্তরাশ্রিতা সহধর্মিণীর যথার্থ প্রতিষ্ঠা। পুত্রকন্যার মাতৃবিয়োগের অশ্রুতে পত্নীস্মৃতি নির্মলতর হইয়া কবিচিত্তকে উদ্বোধিত করিয়াছে। বাৎসল্যরসের উজানস্রোতে পত্নীপ্রেমের কালিন্দী নূতন সৌন্দর্যে তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে। এমন হওয়াই স্বাভাবিক, কেননা, দাম্পত্যরস ও বাৎসল্যরসের মধ্যে একটি পদের মাত্র ব্যবধান।

১১

দ্বিজেন্দ্রলালের দাম্পত্যরসের কবিতাগুলি দ্বিজেন্দ্র-কাব্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদের অন্তর্গত। "আর্যগাথা" হইতে শুরু করিয়া "মন্দ্র" হইয়া "আলেখ্য" ও "ত্রিবেণী"তে আসিয়া পৌঁছিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহার এই শ্রেণীর কবিতাগুলিও অন্যান্য শ্রেণীর কবিতার মতই একই নিয়মে বিবর্তিত হইয়াছে। "আর্যগাথা"য় নিষ্কলুষ নিষ্কলঙ্ক বাৎসল্যরস, "মন্দ্র" কাব্যের বাৎসল্যরস আর নিষ্কলুষ নিষ্কলঙ্ক নয়—সেখানে জগতের শুভাশুভ অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, "আলেখ্য" ও "ত্রিবেণী"তে জগতের শুভাশুভ তেমন নাই, যেমন ব্যক্তিগত দুঃখের, পত্নীবিয়োগের, পুত্র-কন্যার মাতৃ-বিয়োগের দুঃখের জ্বালা। "মন্দ্র" কাব্য রচনাকালে তিনি জগতের শুভাশুভের সঙ্গে, নিত্যের সঙ্গে অনিত্যের যোগসাধনে এমন ব্যস্ত ছিলেন যে, বস্তুর বা ঘটনার নিজস্ব রূপটি প্রায়শ দেখিতে অসমর্থ হইয়াছেন, আর তাহা কাব্যোৎকর্ষের পক্ষে সব সময়ে যে সুফলপ্রসূ হইয়াছে এমন নয়। তবুও উহা কবির একটি সাময়িক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী। এই দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা তাঁহার বাৎসল্যরসও রঞ্জিত। কাব্য হিসাবে "আর্যগাথা" ও "মন্দ্র"র পরবর্তী কবিতাগুলিই শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু কবির মননবিচারে "মন্দ্র" কবিতা কটিরও নিজস্ব মূল্য আছে—

"আর্যগাথা"র— একি রে তোর ছেলেখেলা
বকি তায় কি সাধে—
যা দেখবে বলবে
'ওমা এনে দে ওমা দে।'
'নেবো নেবো' সদাই কি এ ?
পেলে পরে ফেলে দিয়ে
কাঁদতে গিয়ে হেসে ফেলে
হাসতে গিয়ে কাঁদে।

"মন্দ্রে" পরিণত— কি গো! কে তুমি আবার।
বলি কোথা হতে ?
কি চাও ? কি মনে ক'রে
এ বিশ্ব জগতে ?
এই দ্বন্দ্ব, এই অন্ধ অর্থলোলুপতা,
এই স্বার্থ, এই শাঠ্য, এই মিথ্যা কথা,
এই ঈর্ষা দ্বেষ ভরা নীচ মর্ত্যভূমি
মাঝখানে, বলি, ওগো, কে আবার তুমি

এগুলির সঙ্গে আলেখ্যর ঘুমন্ত শিশু, পুত্রকন্যার বিবাদ, নূতন মাতা, মাতৃহারা, বিপত্নীক প্রভৃতি কবিতা তুলনা করিয়া পড়িলে প্রভেদটা কোথায় ও কী বুঝিতে পারা যাইবে। ইতিমধ্যে কবির জীবনে একটা বৃহৎ পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে—পত্নী সুরবালা লোকান্তরিতা। এই ঘটনাটির গুরুত্ব বারংবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছি—আবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

১২

বাংলা কাব্যে দ্বিজেন্দ্রলালের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি যে কেবল অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা নয়, একটি নূতন কাব্যরীতির প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। "মন্দ্র" কাব্যে সেই কাব্যরীতির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। ভাষায়, ছন্দে ও স্বতোবিরুদ্ধ ভাবের সংমিশ্রণ-চাতুর্যে ইহার অভিনবত্ব। তিনি পদ্যকে গদ্যের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে টানিয়া নামাইয়াছেন, পদ্যের এই ব্যবহার আমাদের সাহিত্যে নূতন; সে নূতন অভাবিতবেশে দেখা দিয়া চমক লাগাইয়া দিয়াছে; এ যেন রাজরাণী দ্রৌপদীর রাজদাসী সৈরিন্ধ্রীবেশ ধারণ। আর কোন কারণে না হইলেও (অন্য কারণও আছে) শুধু এই অভিনব কাব্যরীতির জন্যই তিনি বাংলা কাব্যে স্থায়িত্ব লাভ করিবেন। কিন্তু তবু যে লোকে কবি দ্বিজেন্দ্রলালকে ভুলিতে বসিয়াছে, তাহার অন্যতম কারণ এ রীতিটি পরবর্তী কাল এখনও গ্রহণ করে নাই। যে পথের তিনি ছিলেন পথিকৃৎ ও একমাত্র পথিক, চলাচলের অভাবে ঘাস গজাইয়া তাহা ঢাকিয়া গিয়াছে। হঠাৎ চোখে না পড়িলেও পথটা লোপ পায় নাই, নূতন পদপাতের অপেক্ষা করিয়া অজ্ঞাতবাস করিতেছে। অনুগামীর মধ্যে পুরোগামী স্থায়িত্ব লাভ করে। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার অনুগামী নাই।

১৩

আজকাল অনেক উদ্যোগী প্রকাশক প্রাচীন ও অনতিপ্রাচীন বাংলা গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের একটি কাব্যসঙ্কলন প্রকাশ বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে বাংলা সাহিত্য ও দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যখ্যাতি দুইয়েরই উপকার হইবে। আমার ধারণার কথা গোড়াতেই বলিয়াছি: নাট্যকাররূপে নয়, বিশেষ একটি কাব্যরীতির কবিরূপেই দ্বিজেন্দ্রলালের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পাইবার সম্ভাবনা। প্রস্তাবিত কাব্য-সঙ্কলন সেই সম্ভাবনাকে নিশ্চয়তার কোঠায় আনিয়া দিতে সাহায্য করিবে। আর এই উদ্যোগের ফলে প্রকাশক ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, এমন আশঙ্কা করিবার কিছুমাত্র হেতু নাই।

কবি রজনীকান্ত সেন

১৮৬৫—১৯১০

অদৃষ্টবিধাতা কোন কোন স্বনির্বাচিত পুরুষের জন্য স্বহস্তে গৌরবের মুকুট প্রস্তুত করিয়া থাকেন, সে মুকুটের উপাদান বেদনার স্বর্ণ ও অশ্রুর মুক্তা। চর্মচক্ষের অভিজ্ঞতায় মনে হয় যে সেই দুঃসহ সৌভাগ্যের ভারে হতভাগ্যের সমস্ত জীবন ও যাবতীয় আশাভরসা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, তখন বিধাতা যে কী আত্মপ্রসাদ লাভ করেন কে বলিবে। তবে কখনো কখনো বিধাতার মর্মজ্ঞ ব্যক্তির চোখে এ হেন দৃশ্য পড়িলে তিনি প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন, তিনি দেখেন যে বিধাতা-পুরুষ মানবাত্মার মহত্ত্বের যাচাই করিয়া লইতেছেন, দেহ ও আত্মার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আত্মার জয় দেখিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকিতেছে না।

ক্যানসার-রোগাক্রান্ত নিশ্চিতমৃত্যু রজনীকান্তকে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা বিধাতার মর্মগ্রাহিতায় পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

"প্রীতিপূর্ণ নমস্কারপূর্বক নিবেদন—সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থি-মাংস, স্নায়ুপেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনোমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মনে আছে, সেদিন আপনি আমার 'রাজা ও রাণী' নাটক হইতে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—

এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে নাকি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয় ?

ঐ কথা হইতে আমার মনে হইতেছিল, সুখদুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারের প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোট এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না? শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই—কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই—

পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা বলিদান হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যত পুড়িতেছে, অগ্নি আরো তত বেশি করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে? মানুষের আত্মার সত্য প্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থি-মাংস ও ক্ষুধা তৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সচ্ছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত, বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য্য ...

"আপনি যে গানটি ['আমায় সকল রকমে ...] পাঠাইয়াছেন তাহা শিরো-ধার্য্য করিয়া লইলাম। 'সাধ্য' তো আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই তো তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন—আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ সমস্ত তো তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে—অন্য সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ তো একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন, আজ আপনার জীবন সঙ্গীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাব-সঙ্গীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে।"

রবীন্দ্রনাথের পত্র নিশ্চয় মৃত্যুপথযাত্রীকে বৃথা সান্ত্বনা দান নয়, রুগ্ন কবি সম্বন্ধে অবধারিত সত্য। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত কবি যে প্রফুল্লতা, ধীরতা ও শান্তি দেখাইয়াছেন তাহা ভগবানে গভীর বিশ্বাস ব্যতীত সম্ভব নয়। জীবনের আর সব সম্বল যখন ফুরাইয়া যায়, তখন ঐটুকুই হাতে থাকে, যাহার হাতে থাকে সত্যই সে পরম সৌভাগ্যবান। মৃত্যুশয্যায় শয়ান স্যার ওয়াল্টার স্কট জামাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন--বৎস, এই অবস্থায় উপস্থিত হইলে পবিত্র জীবনের স্মৃতি ছাড়া আর কিছুতেই সান্ত্বনা পাইবে না। 'সকল রকমে কাঙাল' রজনীকান্তও শেষ শয্যায় উপনীত হইয়া একমাত্র পবিত্র জীবনের স্মৃতির উপরে নির্ভর করিয়াই ধীরতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সে সময় হাসপাতালে তাঁহাকে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই রবীন্দ্রনাথের মত মুগ্ধ বিস্ময় অনুভব করিয়াছেন। কান্তকবি স্বদেশী গানের কবি, হাসির গানের কবি, আবার ভক্তি-সঙ্গীতের কবি। কিন্তু জীবনের দুর্বহ শেষ কটি মাস প্রমাণ করিয়া দিল তাঁহার যথার্থ শক্তি কোথায়। ঐ ভক্তির মূল অস্তিত্বের গভীরে নিহিত ছিল বলিয়াই কবিকে খাড়া করিয়া রাখিয়াছিল, তুলনায় সামান্য আঘাতে অনেক অন্তঃসারশূন্য মহীরুহ ভাঙিয়া

পড়ে। দুর্বহ অন্তিম এই কয়টি মাসকেই তাঁহার জীবনের অক্ষয় কীর্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। কী প্রয়োজন ছিল এই কণ্টক-মুকুটের? বিধাতা বোধ হয় মাঝে মাঝে নিজের সৃষ্টির শক্তি যাচাই করিয়া দেখেন।

২

"পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে সম্ভ্রান্ত বৈদ্য বংশে ১৮৬৫ সনের ২৬শে জুলাই (১২৭২, ১২ই শ্রাবণ) বুধবার রজনীকান্তের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা গুরুপ্রসাদ সেন তখন কাটোয়ার মুনসেফ।"

রজনীকান্ত মূলতঃ পাবনার অধিবাসী হইলেও রাজসাহীর লোক বলিয়াই পরিচিত ছিলেন, তিনি নিজেও সেইরূপ মনে করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত গোবিন্দনাথ সেন রাজসাহীর খ্যাতনামা উকিল ছিলেন সেই সূত্রে রাজসাহী তাঁহার আপন স্থান হইয়া পড়িল। কালক্রমে তিনি রাজসাহীর প্রধান অলঙ্কারে পরিণত হইলেন।

রজনীকান্ত প্রভূত মেধার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও স্কুল-কলেজের পাঠে কখনও মনোযোগী ছিলেন না—তাই পরীক্ষাগুলি কোনক্রমে পাস করিয়া রাজসাহী শহরে ওকালতি ব্যবসা শুরু করিলেন।*

ওকালতি আরম্ভ হইল, সেই সঙ্গে আরম্ভ হইল প্রবল সাহিত্যসাধনা। একটা পেশা, অন্যটা নেশা। নেশার কাছে পেশা পারিবে কেন? এই বিসদৃশ অবস্থা সম্বন্ধে তিনি দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমারকে লিখিতেছেন—

"কুমার, আমি আইন-ব্যবসায়ী, কিন্তু আমি ব্যবসায় করিতে পারি নাই। কোন্ দুর্লঙ্ঘ্য অদৃষ্ট আমাকে ঐ ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালবাসিতাম, কবিতার পূজা করিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাম। আমার চিত্ত তাই লইয়া জীবিত ছিল।"

মধুসূদনও এই রকমটি লিখিলে লিখিতে পারিতেন। ওকালতির সাহায্যে

* ১৮৮৩	এন্ট্রান্স, তৃতীয় বিভাগ	কুচবিহার জেনকিন্স স্কুল, ১৭ বৎসর বয়স
১৮৮৫	এফ. এ. দ্বিতীয় বিভাগ	রাজসাহী কলেজ
১৮৮৯	বি. এ.	সিটি কলেজ
১৮৯১	বি. এল. দ্বিতীয় বিভাগ	সিটি কলেজ

সাহিত্য ও সঙ্গীতের উৎস অবলম্বন করিয়া তিনি দিনগত পাপক্ষয় করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ঐতিহাসিক ও সাহিত্যরসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মে। তিনিও রজনীকান্তের মত অন্য জেলার লোক হইয়াও রাজসাহীর অধিবাসী বলিয়া পরিচিত। অক্ষয়কুমার পেশায় উকিল, নেশায় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌, তার উপরে সাহিত্যিক। তাঁহার কাছে উৎসাহ ও প্রশ্রয় পাইয়া রজনীকান্ত সাফল্যের পথে চলিলেন। এই রাজসাহী শহরেই আর দুইজন ব্যক্তির সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে, যাঁহাদের প্রভাব অল্পাধিক পরিমাণে তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। তাঁহারা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও জলধর সেন।

রাজসাহীতে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসিবার সঙ্গেই রজনীকান্ত রাজসাহী শহরের 'উৎসবরাজে' পরিণত হইলেন। সাহিত্যসভা, গানের মজলিশ, লাইব্রেরী, সাহিত্য-সম্মিলন, সর্বত্র রজনীকান্তকে চাই। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিদায় বা সংবর্ধনা-সভায় গান লিখিয়া দিতে রজনীকান্তকে চাই।

"এক রবিবারে রাজসাহীর লাইব্রেরিতে কিসের জন্য যেন একটা সভা হইবার কথা ছিল। রজনী বেলা প্রায় তিনটার সময় অক্ষয়ের (মৈত্রেয়) বাসায় আসিল। অক্ষয় বলিল, 'রজনীভায়া, খালি হাতে সভায় যাইবে। একটা গান বাঁধিয়া লও না।' রজনী যে গান বাঁধিতে পারিত, তাহা আমি জানিতাম না, আমি জানিতাম, সে গান গাহিতে পারে। আমি বলিলাম, 'এক ঘণ্টা পরে সভা হইবে, এখন কি আর গান বাঁধিবার সময় আছে?' অক্ষয় বলিল, 'রজনী একটু বসিলেই গান বাঁধিতে পারে।' রজনী অক্ষয়কে বড় ভক্তি করিত। সে তখন একখানি চেয়ার টানিয়া অল্পক্ষণের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল। তাহার পরেই কাগজ টানিয়া লইয়া একটা গান লিখিয়া ফেলিল। আমি তো অবাক। গানটা চাহিয়া লইয়া পড়িয়া দেখি, অতি সুন্দর রচনা হইয়াছে। গানটি এখন সর্বজন-পরিচিত—

তব, চরণ-নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা।"

—জলধর সেন

অকালে অকস্মাৎ যে-কোন উপলক্ষ্যে গান বাঁধিয়া দিতে ও গান গাহিয়া আসর মাত করিতে রজনীকান্তকে চাই। ক্রমে তিনি রাজসাহীর আনন্দ, উৎসাহ, প্রাণ হইয়া উঠিলেন। এমন লোককে 'উৎসবরাজ' বলিয়া বোধ করি অন্যায় করি নাই।

এইভাবে সাহিত্য, সঙ্গীত এবং ওকালতির নেশায় পেশায় যখন তাঁহার জীবন চলিতেছিল এমন সময়ে ১৯০৯ সালের গ্রীষ্মকালে তাঁহার গলায় ক্যানসার রোগ দেখা দিল। এবারে শুরু হইল তাঁহার জীবনমরণের দ্বন্দ্ব, আরম্ভ হইল দুরূহ সৌভাগ্যের মুকুটধারণের পালা।

জীবনের শেষ কয় মাস মেডিকেল কলেজে কাটাইয়া দীর্ঘ দেড় বৎসর রোগ-ভোগের পর ১৯১০ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর রজনীকান্ত সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিলেন।

মেডিকেল কলেজে বাসকালে দেশের ছোট বড় অসংখ্য লোকের যে স্নেহ-করুণা তাঁহার উপরে বর্ষিত হইয়াছিল তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে কান্তকবির রচনা দেশের মনকে ব্যাপক ভাবে স্পর্শ করিয়াছিল, তিনি যে লিখিয়াছিলেন—

'ভাবিতাম আমি লিখি বুঝি বেশ
আমার সঙ্গীত ভালোবাসে দেশ'

তাহা আদৌ অলীক বা অত্যুক্তি নয়। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় প্রভৃতি ভূস্বামীগণ, মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ের ব্যবসায়ী, সমব্যবসায়ী ও বন্ধুগণ, মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীগণ সকলেই নিজ নিজ সাধ্যানুসারে মৃত্যুপথযাত্রীর পথ সুগম ও দুশ্চিন্তা লাঘব করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর এ সহৃদয়তা তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গেই অবসিত হয় নাই। প্রথমোক্ত দুই মহানুভব ব্যক্তির বদান্যতা স্বর্গত কবির অনাথ পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ করে নাই। লক্ষ্মী সরস্বতীর কলহ সর্বথা সত্য নয়।

৩

রজনীকান্তের সাহিত্যসৃষ্টির পরিমাণ খুব বেশী নহে। মৃত্যুর পূর্বে তিনখানি এবং মৃত্যুর পরে পাঁচখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল।*

তাঁহার সমস্ত রচনাই পদ্যে, তাহার অধিকাংশই আবার গীত। গীত বা গীতিকবিতাকেই তাঁহার প্রতিভার প্রধান বাহন বলা যাইতে পারে।

তাঁহার রচিত গানগুলি সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর, ভক্তিমূলক, স্বদেশী গান ও হাসির গান। অমৃত ও সদ্ভাব-কুসুম গান নয়, নীতিকবিতা, কবির স্বীকৃতি অনুসারে রবীন্দ্রনাথের কণিকার আদর্শে রচিত।

---

* ১. বাণী (কাব্য)। ১৯০২
২. কল্যাণী (কাব্য)। ১৯০৫

লেখকের বহুবিধ প্রবণতার মধ্যে মুখ্য ও গৌণে প্রভেদ করা সমালোচকের একটি প্রধান কর্তব্য। গোড়াতে এই ভাগটা করিয়া লইলে পরিণামে অনেক ভুল বোঝার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

রচনার উৎকর্ষ ও পরিমাণ হিসাব করিলে স্বীকার করিতে হয় যে ভক্তিমূলক গানেই কবির প্রতিভার প্রকৃষ্টতম প্রকাশ, ইহাই তাঁহার মুখ্য প্রবণতা। স্বদেশী গান, হাসির গান ও নীতিকবিতা তুলনায় গৌণ। গৌণের বিচার আগে সারিয়া লওয়া যাইতে পারে স্বভাবতই তাহা সংক্ষিপ্ত হইবে।

রাজসাহীতে দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত পরিচয় রজনীকান্তকে হাসির গান রচনায় প্রেরণা দেয়, স্পষ্টতঃ এখানে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান তাঁহার আদর্শ। সাহিত্যে হাসির সীমানা কালে কালে ও দেশে দেশে বদল হইয়া থাকে। এক দেশ যে বিষয়কে হাস্যকর মনে করে অন্য দেশ তাহা নাও করিতে পারে এক যুগ যে বিষয়কে হাস্যকর মনে করে অন্য যুগ তাহা না করিতেও পারে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের জৌলুস এক সময়ে যেমন ছিল এখন আর তেমন নাই। যুগান্তরে রুচির বদল হইয়াছে, সে যুগের তুলনায় বর্তমান কাল কিছু গম্ভীর ও আত্মসচেতন হইয়া পড়িয়াছে—সাহিত্যে হাস্য এখন সম্পূর্ণ taboo না হইলেও তাহার স্থান এখন সঙ্কীর্ণ। রজনীকান্তের হাসির গান সম্বন্ধেও এ কথা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। দ্বিজেন্দ্রলাল বা রজনীকান্ত কাহারও হাসির গান এখন বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। তবে পুনরায় যুগান্তরে যে হাসির গানের আদর বাড়িবে না এমন বলা যায় না। দুইজনের হাসির গানের মধ্যে তুলনা করিলে বলা চলে যে, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে সংখ্যা ও বৈচিত্র্য অধিক হইলেও উৎকর্ষে রজনীকান্তের হাসির গান ন্যূন নহে। তাঁহার হাসির গান মূলে দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বারা প্রভাবিত ও প্রেরণাপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এক জায়গায় রজনীকান্তের জিত—তাহার হাসিতে

৩. অমৃত (নীতিকবিতা)। ১৯১০

মৃত্যুর পরে প্রকাশিত

৪. আনন্দময়ী (আগমনী ও বিজয়াসঙ্গীত) ১৯১০

৫. বিশ্রাম (কাব্য)। ১৯১০

৬ অভয়া (কাব্য)। ১৯১০

৭. সদ্ভাব-কুসুম (নীতিকবিতা)। ১৯১৩

৮ শেষ দান (কাব্য)। ১৯২৭

করুণায় যেমন মাখামাখি দ্বিজেন্দ্রলালের তেমন নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান যদি শুষ্ক শীতের বাতাস হয়, রজনীকান্তের হাসির গান বর্ষার জলভারাক্রান্ত পূবে বাতাস।

৪

স্বদেশী যুগে স্বদেশী গান লেখেন নাই এমন বাঙালী কবি বোধ হয় ছিলেন না। রজনীকান্তও লিখিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রবল প্রভাবটা সেই যুগের হাওয়ার, তার পরেই রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের। রজনীকান্তের স্বদেশী গানে অগ্রজ কবিদ্বয়ের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান সর্বত্র লিরিক্যাল, গানের সীমানা ত্যাগ করিয়া বক্তৃতার সীমানায় কখনও পদার্পণ করে নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গান সর্বত্র oratorical, তাহা যেন গানে বক্তৃতা। এগুলির তৎকালীন জনপ্রিয়তার মূল এখানে, বক্তৃতার প্রেরণা যেমন সহজ, গানের প্রেরণা তেমন নয়। আবার এগুলির বর্তমান অনাদরের মূলও এখানে, বক্তৃতা যত শীঘ্র পুরাতন হয় গান তেমন হয় না। এখন রজনীকান্তের স্বদেশী গানে এ দুটি গুণই দেখিতে পাওয়া যায়।

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই
দীন দুখিনী মা যে মোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই—

এ রচনার ছাঁচ লিরিক্যাল, সুরে গীত না হইলেও এ গান।

আবার—

রাম-যুধিষ্ঠির ভূপ-অলঙ্কৃত,
অর্জুন ভীম্ম শরাসন টঙ্কৃত,
বীর প্রতাপে চরাচর শঙ্কিত।

এ রচনা "মিশ্র পরোজ-কাওয়ালী" রাগিণীতে গীত হইলেও লিরিক নয়, বক্তৃতা।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানের আদর যে কমিয়াছে, স্বদেশী যুগের অবসান তাহার কারণ নয়—উহার বক্তৃতাত্মক ছাঁচটাই কারণ। ঐ একই কারণে রজনীকান্তের স্বদেশী গানের সে আদর আর নাই, কাল ও ছাঁচ দুই-ই চিরকালীন সমাদরের অন্তরায়।

৫

রজনীকান্তের নীতিকবিতাগুলির বর্তমান অনাদরের কারণ বুঝিতে পারি না। এগুলি স্পষ্টতঃ (কবি কর্তৃক স্বাকৃ'ও বটে) কণিকার আদর্শে লিখিত হইলেও ইহারা সরসতায়, ভূয়োদর্শনে ও মৌলিকতায় 'কণিকা'র অনুজ। খুব সম্ভব অনাদরের কারণ হইতেছে সাধারণ ভাবে রজনীকান্তের কাব্য সম্বন্ধে পাঠকের অবহেলা ও বিস্মৃতি। কবির ভক্তিসঙ্গীতগুলির পরেই, হাসির গান ও স্বদেশী গানের উপরে, নীতিকবিতাগুলির আসন।

৬

বাংলাদেশের ভক্তিসাধনার একটি নিজস্ব ধারা আছে, বহুকালের প্রাচীন এই ধারা। এই ভক্তিসাধনার প্রকৃতি হইতেছে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পিত-প্রাণ ভক্তকে ভগবানের অপার করুণা রক্ষা করে, দুর্গম পথে চালনা করে এবং শেষ পর্যন্ত চরম সার্থকতায় পৌঁছাইয়া দেয়। প্রধানতঃ সঙ্গীতে ভক্ত আত্মনিবেদন করিয়া থাকে। সঙ্গীত এখানে মন্ত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে, তাই দেখিতে পাই ভক্তিসাধনার সমান্তরালে একটি সঙ্গীতের প্রবাহ সৃষ্টি হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, বাউল ও অন্যান্য লোকসঙ্গীত—সমস্তই এই ধারার অন্তর্গত। ব্রহ্মসঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীতকেও এই ধারার অন্যতম রূপ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

রজনীকান্তের কান্তপদাবলীও এই ভক্তিসঙ্গীতধারার অন্তর্গত। ভক্ত ও ভগবান্ সম্পর্কিত নূতন কোন তত্ত্ব বা পন্থা তিনি উদ্ভাবন করেন নাই, বোধ করি ভক্তির প্রকৃতি এই যে তত্ত্ব বা নূতন পন্থার দিকে তাহা ঝোঁকে না, চোখ বুজিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হয়। কাজেই কান্তপদাবলীর তাত্ত্বিক ভিত্তি আলোচনা নিরর্থক। ভক্তির অকৃত্রিমতাই উহার প্রধান সম্পদ।

বাণী ও কল্যাণী হইতে অনেক পদ উদ্ধার করিয়া বিষয়টি প্রমাণ করা যায়। কিন্তু তাহার প্রয়োজন আছে মনে করি না। ভক্তির মূলে আছে বিশ্বাস বিশ্বাস না থাকিলে ভক্তি সম্ভব নয়। কাজেই তাঁহার বিশ্বাসদ্যোতক সঙ্গীতের সংখ্যাও প্রচুর।

কেন বঞ্চিত হব চরণে?
আমি, কত আশা ক'রে ব'সে আছি,
পাব জীবনে, না হয় মরণে।

কিংবা—

তুমি অরূপ স্বরূপ, সগুণ নির্গুণ,
দয়াল ভয়াল হরি হে ;
আমি কিবা বুঝি, আমি কিবা জানি,
আমি কেন ভেবে মরি হে।···
তাই বলে ডাকি যাহা প্রাণ চায়
ডাকিতে ডাকিতে হৃদয় জুড়ায়—

ইহাই তাঁহার ভক্তির অন্তর্নিহিত কথা। বিশ্বাস ও ভক্তি প্রাণে থাকিলে ভক্তের সংসার-পথ সুগম হইয়া আসে, তখন মৃত্যুতেও সে অনায়াসে বলিতে পারে—

তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুঃখ।···
তোমারি দেওয়া নিধি, তোমারি কেড়ে নেওয়া,

তখন মৃত্যুকেও 'তোমার রসাল নন্দন' বলিয়া মনে হয়।

কান্ত কবির ভগবদ্বিশ্বাসে এতটুকু ক্লান্তিমত্তা ছিল না বলিয়াই তিনি দুর্বহ পীড়ার অন্তিম মাস কয়েকটি গৌরব-কিরীটের মত অনায়াসে শিরে বহন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এ কথা বলিলে কুটিল ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করা হইবে না যে, কান্তকবির ভক্তিসঙ্গীতগুলি বাংলা ভক্তিপদাবলীর জাহ্নবীতে যে একটি চির সলিলা উপনদীরূপে যুক্ত হইয়া আমাদের মানসিক সম্পদকে চিরদিনের জন্য বাড়াইয়া দিয়াছে তাহা অবিনশ্বর।*

* এই প্রবন্ধরচনায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত সাহিত্যসাধক-চরিতমালার অন্তর্গত রজনীকান্ত সেন পুস্তিকার সাহায্য পাইয়াছি।

কবি প্রিয়ম্বদা দেবী

১৮৭১-১৯৩৫

প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতাগুলি এমন সহজ স্বচ্ছ, এমন অনাড়ম্বর, বিধবার দেহের মত সেগুলি এমন নিরলংকার যে প্রথম অনভ্যস্ত দৃষ্টিতে সেগুলিকে অকিঞ্চিৎকর মনে হওয়া বিচিত্র নয়। শরৎকালের প্রভাতে ঘাসের মধ্যে মুক্তা ছড়াইয়া থাকিলে অধিকাংশ লোকেই শিশিরভ্রমে সেদিকে দৃক্‌পাত মাত্র করিবে না বলিয়া আশঙ্কা। প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতাগুলির দিকেও এ পর্যন্ত পাঠকসাধারণ ফিরিয়া তাকায় নাই, শিশিরসঞ্চয়ী ঘাসের মধ্যে মুক্তার মত এই ক্ষুদ্রকায় নিটোল কাব্যকণাগুলি সম্পূর্ণ অনাদৃত রহিয়া গিয়াছে।

শিল্পগত স্বচ্ছ অনাড়ম্বরতার প্রতিশোধক হইতে পারিত, প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতার সংখ্যা যদি যথেষ্ট হইত। সংখ্যাগত প্রাচুর্য শিল্পগত লঘুতার পরিপূরক। কিন্তু সেদিকেও আশা করিবার বিশেষ-কিছু নাই, পুস্তকাকারে প্রকাশিত তাঁহার কবিতাগুলি নিতান্তই মুষ্টিমেয়। পাঠকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিবার ইহাও একটা হেতু।

ম্যাথু আর্নল্ডের কবিতার আলোচনা উপলক্ষে একজন লেখক বলিয়াছেন যে, ভিক্টোরীয় যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের সঙ্গে আর্নল্ডের স্থান, তবে যে তাঁহার আসন সংকীর্ণ বলিয়া মনে হয় তার কারণ আর কিছুই নয়, তাঁহার কবিতার পরিমাণ অপ্রচুর, টেনিসন ব্রাউনিং বা সুইনবার্নের স্তূপীকৃত কীর্তির পাশে আর্নল্ডের কবিকৃতি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর দেখায়। বিশিষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন কবিরা নূতন পথ রচনা করিয়া অবতীর্ণ হন, পথটা অপরিচিত বলিয়া কবির বিরুদ্ধে পাঠকের মনে প্রথমে একটা প্রতিকূলতা থাকে, সেই প্রতিকূলতা কাটিয়া রচনার সহিত পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় অনুকূলতা আনে, প্রাচুর্য সেই ঘনিষ্ঠতায় অবকাশ দেয়। কিন্তু রচনার পরিমাণ স্বল্প হইলে ঘনিষ্ঠতার অভাবে কবির সম্বন্ধে পাঠকের সুবিচার করিবার সুযোগ ঘটিয়া ওঠে না, অর্থাৎ পাঠকে ধারের সঙ্গে ভার চায়, আর্নল্ডের কবিকৃতিতে ধার যথেষ্ট, কিন্তু ভারের অভাব। টেনিসন ব্রাউনিং প্রভৃতি ধারে-ভারে পাঠকের মনে কাটিয়া বসিয়াছেন, ভারের অভাবে আর্নল্ড পাঠক-হৃদয়ে আপন প্রাপ্য স্থানটি হইতে বঞ্চিত আছেন।

প্রিয়ম্বদা দেবীর কাব্যেও ভারের অভাব। একে তাঁহার শিল্পের মধ্যে এমন-

কিছু আছে পাঠকের পক্ষে যাহার ধারণা করা কঠিন, তার উপরে পরিমাণের লঘুতা, দুয়ে মিলিয়া তাঁহার কবিতার উপেক্ষার আসর বেশ প্রশস্ত করিয়া গড়িয়াছে।

আরও একটি বিষয়। তাঁহার কবিতা কেবল পরিমাণে সামান্য নয়, শিল্পে স্বচ্ছ সহজ নয়, আকৃতিতেও অধিকাংশই অতিশয় স্বল্প। তাহার বেশির ভাগ কবিতাই চোদ্দ বা আঠারো ছত্রের বেশি নয়, পঁচিশ ছত্রের কবিতা অল্পই আছে, আট দশ-চার ছত্রের কবিতার সংখ্যাও প্রচুর আকারের এই ক্ষুদ্রতাও তাঁহার কবিতার স্বমর্যাদাপ্রাপ্তির পক্ষে একটি অন্তরায় হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আকৃতির দৈর্ঘ্য একরকমের ভার, উহাতে পাঠকের বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়। পাঠকে মনে করে, এত দীর্ঘ যখন নিশ্চয় কিছু বস্তু আছে। নিছক আকৃতির দাবিতেই বৃত্রসংহার-কাব্য আজও বয়স্ক পাঠকসমাজে টিকিয়া আছে। আকারে ছোট হইলে সংখ্যা দ্বারা পূরণ করিয়া লইতে হয়, বৈষ্ণবপদগুলিও ছোট, কিন্তু সংখ্যার বাহুল্যে ছোটকে আর ছোট মনে হয় না। শিল্পগত স্বচ্ছতা, সংখ্যার অল্পতা এবং আকৃতির হ্রস্বতা তিনই প্রিয়ম্বদা দেবীর কাব্যের স্বমর্যাদাপ্রাপ্তির পক্ষে অন্তরায়। সাধারণ পাঠকসমাজে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত, বিশেষজ্ঞ পাঠকেও তাঁহাকে বিশেষভাবে জানেন এমন মনে হয় না, তাঁহার কবিতার রসজ্ঞ পাঠকের সংখ্যা তাহার কবিতার চেয়েও অপ্রচুর। মানুষের বিচারে যেমনি হোক, বিধাতা একদিকে কৃপণতা করিয়া আর এক দিকে পুরাইয়া দেন। প্রিয়ম্বদা দেবী এমন অপ্রত্যাশিতভাবে এমন এক স্থান হইতে তাঁহার কাব্যের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন যে, আর কোন বাঙালী লেখকের পক্ষে তাহা সম্ভব নাই। রবীন্দ্রনাথ নিজের একখানি কাব্যগ্রন্থে নিজের কবিতাভ্রমে প্রিয়ম্বদা দেবীর পাঁচটি কবিতাকে স্থান দিয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, অন্তত উক্ত কবিতা কয়টি রবীন্দ্রনাথের রস-বিচারের মাপকাঠিতে পাশ-মার্ক পাওয়া। এই সান্ত্বনায় সাধারণ পাঠকের জয়ধ্বনির অভাব পূরণ করিয়া দেয়। প্রিয়ম্বদা দেবীর ক্ষোভের কারণ থাকা উচিত নয়।

পূর্বোক্ত ইতিহাসটুকু সবিস্তারে বর্ণনা করা যাইতে পারে—

"কবিতা কয়টি যে আমারই সেও আমি স্বীকার ক'রে নিলেম। প'ড়ে বিশেষ তৃপ্তি বোধ হল। মনে হল ভালোই লিখেছি। পড়ে দেখলাম—

তোমারে ভুলিতে মোর হল না যে মতি
এ জগতে কারো তাহে নাই কোনো ক্ষতি।
আমি তাহে দীন নহি, তুমি নহ ঋণী,
দেবতার অংশ তাও পাইবেন তিনি।

নিজের লেখা জেনেও আমাকে স্বীকার করতে হল যে ছোটর মধ্যে এই কবিতাটি সম্পূর্ণ ভ'রে উঠেছে। পেটুক-চিত্ত পাঠকের পেট ভরাবার জন্যে একে পঁচিশ-ত্রিশ লাইন পর্যন্ত বাড়িয়ে তোলা যেতে পারত, এমন কি, একে বড় আকারে লেখাই এর চেয়ে হত সহজ। কিন্তু লোভে পড়ে একে বাড়াতে গেলেই একে কমানো হত। তাই নিজের অলুব্ধ কবিবুদ্ধির প্রশংসাই করলেম।

"তার পর আর-একটা কবিতা—

ভোর হতে নীলাকাশ ঢাকে কালো মেঘে
ভিজে ভিজে এলোমেলো বায়ু বহে বেগে
কিছুই নাহি যে হায় এ বুকের কাছে
যা কিছু আকাশে আর বাতাসেতে আছে।

আবার বললেম শাবাশ। হৃদয়ের ভিতরকার শূন্যতা বাইরের আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ করে হাহাকার করে উঠছে, এ কথাটা এত সহজে এমন সম্পূর্ণ করে বাংলা সাহিত্যে আর কে বলেছে? ওর উপরে আর-একটি কথাও যোগ করবার জো নেই। ক্ষীণদৃষ্টি পাঠক এতটুকু ছোট কবিতার সৌন্দর্য দেখতে পাবে না জেনেও আমি যে নিজের লেখনীকে সংযত করে দিলাম এজন্য নিজের মনে মনে বলতে হল ধন্য।

"তার পর আর-একটি কবিতা—

আকাশে গহন মেঘে গভীর গর্জন.
শ্রাবণের ধারাপাতে প্লাবিত ভুবন।
কেন এতটুকু নাম সোহাগের ভরে
ডাকিলে আমায় তুমি? পূর্ণ নাম ধরে
আজি ডাকবার দিন, এ হেন সময়
শরম সোহাগ হাসি কৌতুকের নয়।
আঁধার অম্বর পৃথ্বী, পথ চিহ্নহীন,
এল চিরজীবনের পরিচয়-দিন।

'মানসী' লেখবার যুগে, সে আজকের কথা নয়, এই ভাবেরই দু-একটি কবিতা লিখেছিলেম বলে মনে পড়ে। কিন্তু কোন অণিমাসিদ্ধি দ্বারা ভাবটি তবু আকারেই সম্পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

"আর-একটি ছোট কবিতা—

প্রভু তুমি দিয়েছ যে-ভার
যদি তাহা মাথা হতে
এই জীবনের পথে
নামাইয়া রাখি বার বার—
জেনো তা বিদ্রোহ নয়,
ক্ষীণ শ্রান্ত এ হৃদয়,
বলহীন পরান আমার।

লেখাটি একেবারেই নিরাভরণ বলেই এর ভিতরকার বেদনা যেন বৃষ্টিক্লান্ত জুঁইফুলটির মত ফুটে উঠেছে।

"আমি বিশেষ তৃপ্তি এবং গর্বের সঙ্গেই এই কবিতা-কয়টি অ্যালুমিনিয়মের পাতের উপরে স্বহস্তে নকল করে নিলেম। যথাসময়ে অন্যান্য কবিতিকার সঙ্গে এ-কয়টিও আমার 'লেখন' নামধারী গ্রন্থে প্রকাশিত হয়ে গেল।"

ইহার পরে পাঠকসাধারণ যদি জয়ধ্বনি না জানায় তবে কি বিশেষ ক্ষতি আছে? এমন অভাবিত প্রশংসা কয়জন কবির ভাগ্যে জুটিয়াছে?

আগেই বলিয়াছি যে প্রিয়ম্বদা দেবীর অধিকাংশ কাব্য আকারে ক্ষুদ্র। শুধু তাই নয়, কবিতাগুলির মধ্যে এমন-একটি সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতা আছে যাহা লিরিক কবিতার চেয়ে এপিগ্রাম জাতীয় কবিতার স্বভাবসংগত। লিরিক কবিতার ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশের জন্য একটুখানি বিস্তারের আবশ্যক, এপিগ্রামে ঠিক তাহার বিপরীত। এপিগ্রামের সংহত, সংযত কঠিনতা সাধারণের পক্ষে উপলব্ধি সহজ নয়। 'পেটুক-চিত্ত পাঠকের পেট' তাহাতে ভরে না, আর এপিগ্রামের নিরাভরণ সৌন্দর্য অনেক সময়েই প্রাকৃত জনের মুগ্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে অক্ষম। এও একটা কারণ যেজন্য প্রিয়ম্বদা দেবীর কাব্য অনাদৃত রহিয়া গিয়াছে। এপি-গ্রামধর্মী কয়েকটি কবিতা এখানে উদ্ধার করিয়া দিতেছি—

তোমারে ফিরায়ে যদি দেন আরবার
দেবতারে দিতে পারি সর্বস্ব আমার,
তুমি যে সর্বস্ব মোর তাই বড় ভয়
শপথ রাখিতে শক্তি হয় কি না হয়।

আর-একটি—

দুর্বল, বুঝেছি তোর হৃদয়ের কথা,
দুর্লভ হারায়ে গেছে তাই শুধু ব্যথা ?
আর কেহ পাছে তারে খুঁজে ফিরে পায়
তাই তোর এত ভয়, এত হায় হায় !

আরও একটি—

উভয়ে সমান মম সুখ দুঃখ আর
তুমি মোর দুঃখ, তুমি সুখ সে আমার,
তুমি চির-বরণীয়, তাই এ অন্তরে
সুখ-দুঃখে বুঝিয়াছি তুল্য সমাদরে।

আবার একটি—

সুখ শুধু একটুকু অংশ জীবনের,
প্রিয়জন সর্বস্ব তাহার ;
সুখ গেলে এ জীবনে তবু দিন কাটে
প্রিয় গেলে প্রাণে বাঁচা ভার।

এমন আরও অনেক উদ্ধার করা যাইতে পারে।

লিরিকের উদ্ভব হৃদয়ে, সুখ-দুঃখের বেদনায়, এপিগ্রামের উদ্ভব মস্তিষ্কে, ভাল-মন্দের বিচারে ; হৃদয়ের সঞ্চিত বেদনা ছাড়া পাইয়া লিরিকে বিস্তারিত হইয়া যায় ; ভাল-মন্দের বিচার সংহত হইয়া এপিগ্রামে দানা বাঁধিয়া ওঠে : লিরিক নীহারিকা, এপিগ্রাম নক্ষত্র। একই কারণ সাগর হইতে দুয়ের সৃষ্টি হইলেও কার্যত দুই ভিন্ন। দুয়ের কার্য ও ধর্ম স্বতন্ত্র। প্রিয়ম্বদা দেবীর অনেক কবিতার একটি ত্রুটি এই যে, লিরিক-ভাব এপিগ্রাম আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বেদনাকে শিল্পের শাণযন্ত্রে চড়াইয়া কাটিয়া-কুটিয়া ছাঁটিয়া-ছুঁটিয়া একেবারে তাহার সূক্ষ্মতম রূপে লইয়া গিয়া তবে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। লিরিক-বেদনার পক্ষে এটি ত্রুটি বলিয়া মনে করি, বেদনার সঙ্গে বেদনার ভার আবশ্যক, সেই অত্যাবশ্যকটুকুও সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই, তাহাতে ক্ষতিই হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই একটি মাত্র ত্রুটিই তাঁহার কাব্যে আমার চোখে পড়িয়াছে, বাকি সবই প্রশংসার।

২

প্রিয়ম্বদা দেবীর কাব্যের মতই তাঁহার জীবন ঘটনাবিরল, বাহুল্যবর্জিত এবং একটি চরম বেদনার মধ্যে সংহত। ক্ষেত্রান্তর হইতে তাঁহার জীবনকথা উদ্ধার করিয়া দিলাম—

"ইনি প্রসন্নময়ী দেবীর একমাত্র সন্তান। ১৮৭১ সালে পাবনা জেলার গুণাইগাছা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৯২ সালে প্রিয়ম্বদা বেথুন কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই বৎসরেই মধ্যপ্রদেশের ব্যবহারাজীব তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতেই তাঁহার বৈধব্য (১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫) ঘটে।

"শৈশবাবধি বাংলা সাহিত্যে প্রিয়ম্বদার অনুরাগ ছিল। ১২৯০ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ফুল' নামে একটি ক্ষুদ্র সন্দর্ভই তাঁহার মুদ্রিত প্রথম রচনা। পর বৎসর 'ভারতী ও বালকে' (কার্তিক ১২৯৩) তাঁহার একটি 'গান' 'বালিকার রচনা' হিসাবে মুদ্রিত হয়। ১৩০৫ সাল হইতে ভারতীতে তাঁহার গদ্য পদ্য বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। সুকবি হিসাবে প্রিয়ম্বদা খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী—

১ রেণু (কাব্য। ১.৯.১৯০০। পৃ ৬৯
২ তারা (শোক কবিতা) ১৮.১..১৯০৭। পৃ ৩৪
৩ পত্রলেখা (কাব্য) ১০..১৯১১ পৃ ১৫৮
৪ অংশু (কাব্য): শ্রাবণ ১৩৩৪। ১৯২৭)। পৃ ১২৫
৫ চম্পা ও পাটল (কাব্য): ১৯৩৯। পৃ ৩৮

"ইহা ছাড়া তিনি তিনখানি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ 'অনাথ' (১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯১৫), 'কথা ও উপকথা' ও 'পঞ্চুলাল' (১৯২৩) রচনা করিয়াছিলেন। ১৩৪১ সালের ফাল্গুন মাসে প্রিয়ম্বদা দেবীর মৃত্যু হইয়াছে, (দ্রঃ ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪১।"*

বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় রেণু, পত্রলেখা, অংশু এবং চম্পা ও পাটল কাব্য চতুষ্টয়।

* বাংলা-সাহিত্যে বঙ্গমহিলার দান: শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৭

৩

রবীন্দ্রনাথ চম্পা ও পাটল কাব্যের ছোট একটি ভূমিকা লিখিয়াছেন। এই ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন—

"প্রিয়ম্বদার কবিতার প্রধান বিশেষত্ব রচনার সহজ ধারায়, অলংকার শাস্ত্রে যাকে বলে প্রসাদগুণ। স্বচ্ছ তার ভাষা, সরল তার ভাবের সংবেদন। সে যেন ফুলের মতো, বাইরে থেকে যার পাপড়িতে রং ফলানো হয় নি, আপন রং যে নিজের অগোচরেই সঙ্গে নিয়ে এসেছে। আর সেই ফুলটি যূথী মালতী জাতের, পেলব তার চিক্কণতা, সে চোখ ভোলায় না প্রগল্‌ভ প্রসাধনে, মনের মধ্যে প্রবেশ করে অদৃশ্য সুগন্ধের প্রেরণায়। বিশ্বপ্রকৃতির সংস্রবে প্রিয়ম্বদার স্পর্শ-সচেতন মন যে আনন্দ পেয়েছিল কাব্যে সে প্রতিফলিত হয়েছে জলের উপরে যেন আলোর বিচ্ছুরণ, আর জীবনে যত সে পেয়েছে দুঃসহ বিচ্ছেদ-বেদনা, কাব্যে তার একান্ত আবেগ দেখা দিয়েছে নারীর আবরণায় অশ্রুধারার মতো।"

প্রিয়ম্বদা দেবীর কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ যূথী মালতী ফুলের মত বলিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে এত ফুলের ছড়াছড়ি আর কারো কাব্যে এমন সর্বব্যাপী নয়। তবে সে ফুল কেবল যূথী মালতী জাতের নয়, তার মধ্যে চম্পা পাটল গোলাপ কৃষ্ণচূড়া বলরামচূড়া কামিনী প্রভৃতি নানা জাতের নানা রঙের তীব্র সৌগন্ধের ও উগ্রবর্ণের ফুলেরও অভাব নাই। উপমা ও উপাদানকে অনুসরণ করিয়া কবির অবচেতন মনোলোকে প্রবেশ করিবার সাহিত্যিক রীতি আছে বটে, তেমন করিতে পারিলে এই পুষ্পোল্লেখবাহুল্য হইতে কোন গুপ্ত সত্য উদ্ধার করা হয় তো একেবারে অসম্ভব হইত না। কিন্তু এখানে তার প্রয়োজন নাই। শুধু এইটুকুই বলিলে চলিবে যে ফুলের মত এমন সুকুমার, এমন স্পর্শকাতর অথচ এমন সুন্দর আর-কিছু আছে কি না সন্দেহ। একমাত্র ভালবাসার সঙ্গেই ফুলের তুলনা চলে। 'দীপশিখা সম কাঁপে ভীত ভালোবাসা' এ কথা ফুল সম্বন্ধেও সমানভাবে প্রযোজ্য। ফুলের ও প্রেমের এই সাধর্ম্য লক্ষ করিয়াই কবি যেন পুষ্পবৃষ্টিতে নিজের কাব্য ছাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার চোখে ফুলই প্রেম, তাঁহার ফুলের কাব্য নামান্তরে প্রেমের কাব্য। জীবনের দুঃসহ অভিজ্ঞতা হইতে কবি বুঝিয়াছেন যে প্রেম ফুলের মতই সুন্দর অথচ ক্ষণপ্রাণ, আরও বুঝিয়াছেন যে, ফুল ঝরিয়া গেলেও তাহার গন্ধ বাতাসে থাকিয়া যায়, প্রেমাস্পদ গত হইলেও প্রেমের উত্তররাগ 'প্রিয়জনের মনের কোণ শরৎ সন্ধ্যামেঘে' লাগিয়া থাকে।

সেই পুষ্পসৌরভের, প্রেমের স্মৃতির, প্রেমের বেদনার কাব্যই যে তিনি লিখিতে বসিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের ফুল চিন্ময়, তাহা প্রেমের প্রতীক।

৪

দুঃখ-বেদনা-বিচ্ছেদ সকলের পক্ষেই অসহ, কিন্তু যাহারা কল্পনা-প্রবণ, অনুভূতি যাহাদের তীক্ষ্ণ, তাহাদের পক্ষে না জানি আবও কত অসহ। কিন্তু তাহাদের ক্ষতি নিছক ক্ষতি নয়, তাহাদের হিসাবের খাতার বামে ক্ষতিপূরণস্বরূপ জমার অঙ্ক একটা দেখা যায়। দুঃখের অনুভূতিকে তাঁহারা শিল্পে মূর্তি দিয়া থাকে, তখন সেই মূর্তি সকলের অনুভবযোগ্য দর্শনযোগ্য হইয়া ওঠে। সাধারণ লোকে অন্ধভাবে দুঃখের দ্বারা পীড়িত হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না; শিল্পীর কলমে দুঃখের স্বরূপ ফুটিয়া উঠিলে তবেই তাহারা দুঃখকে দেখিতে পায়, শিল্পীর দুঃখের অভিজ্ঞতায় নিজের দুঃখের চেহারাকে দেখে। সুখ সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। প্রিয়ম্বদা দেবী নিজের দুঃখের অভিজ্ঞতার বিন্যাসে সাধারণের দুঃখের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বাড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন।

রেণু তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। প্রথম বলিয়াই হোক, আর শোকের কারণ অত্যন্ত নিকটবর্তী বলিয়াই হোক, সবগুলি কবিতা সুষম শিল্পমূর্তি লাভ করে নাই। তবে যে সব উপাদানে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতা গঠিত, রেণু-কাব্যেই সেগুলি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতি ও প্রেমের যুগল তন্তুতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ-কবিতাগুলি রচিত, রেণু তাহার ব্যতিক্রম নয়। রেণুর বর্ষা বিরহিণী। শরৎ প্রকৃতির স্নেহময়ী মাতা। আবার দেখি হেমন্তের হিমানী, সেও বিরহিণী। কবির বিদ্ধ হৃদয় শরাহত কুরঙ্গের মত ছুটিয়া গিয়া যে সরোবরতীরে উপনীত হইয়াছে তাহা প্রকৃতির অতল স্নেহ ও শান্তি।

পত্রলেখা-কাব্য পূর্ণ পরিণত, হয়তো এখানিই তাঁহার শ্রেষ্ঠকাব্য কিংবা বলা উচিত যে তাঁহার অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিতা পত্রলেখার অন্তর্ভুক্ত, কেননা, তাঁহার এক কাব্য হইতে অন্য কাব্যের প্রকৃতিগত কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, সবই যেন এক সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ-বেদনার ক্রৌঞ্চগীতি।

পত্রলেখায় আসিয়া শোক শ্লোক হইয়া উঠিয়াছে। সার্থক শিল্পসৃষ্টির পক্ষে বাস্তব ঘটনা হইতে যে দূরত্বের আবশ্যক, যে বিবিক্ত ভাব অনিবার্য, পত্রলেখা-কাব্য সেই পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত। প্রকৃতি ও মানুষের যে যুগল তন্তুর বিষয় আগে উল্লেখ করিয়াছি, এখানে সেই বুনানি আরও নিপুণ, দুইকে এক বলিয়া মনে হয়।

আর-এক দিকে দেখি রেণু কাব্যের অপেক্ষাকৃত লিরিক বিস্তৃতি ঘনত্বে নিবদ্ধ হইয়া সংহত এপিগ্রামের সৃষ্টি করিতে চলিয়াছে, নীহারিকা নক্ষত্রে পরিণত। কাব্যের এই ক্রমবর্ধমান সংহতি সম্বন্ধে লেখিকা সচেতন, তাই কৈফিয়তস্বরূপ যেন বলিয়াছেন—

আমার অনন্ত ব্যথা ছাড়া পেতে চায়
অর্থহীন অর্থভরা অজস্র ভাষায়।
তবুও যখনি কিছু বলিবারে যাই
অশ্রুজলে কোনো কথা খুঁজিয়া না পাই।

আবার—

এক বিন্দু অশ্রু যদি ফেলি কভু আমি
অমনি বন্যার মত আসে ক্রমে নামি
অনন্ত শোকের ঘোর অবাধ প্লাবন
ভাঙিয়া ধৈর্যের বাঁধ ভাসাইয়া মন।
তাই আছি স্তব্ধ জড় পাষাণের মত
প্রবল উৎসের মুখ রুধিয়া নিয়ত।

তাঁহার মৌন ঋণাত্মক নয়, তাহা বাক্যদানের বেদনার গভীরতা-সূচক, মহাকাশের স্তব্ধতা যেমন শূন্য নয়, নির্জনতা যেমন রিক্ত নয়, এ-ও তেমনি। পত্রলেখা-কাব্যে দেখিতে পাই যে, মৃত্যুর পরে দয়িতের সহিত পুনরায় মিলন হইবে এইরূপ একটা আশা দেখা দিয়েছে এবং সেই আশার সূত্রেই ভগবানের প্রতিও বিশ্বাস জাগিতেছে, কবির কাছে এখানে প্রেম ভগবৎবিশ্বাসের পূর্বসূত্র।

অংশু কাব্যখানি ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হইলেও 'কবিতাগুলি প্রায় পনেরো বৎসর পূর্বের রচনা'। পত্রলেখা ১৯১১ সালে প্রকাশিত হইলেও কবিতাগুলি যে আরও আগে রচিত অনুমান করা অনুচিত হইবে না। পত্রলেখার কবিতাগুলির সঙ্গে অংশুকাব্যের শিল্পগত প্রভেদ না দেখিতে পাইলেও পরিপ্রেক্ষিত-গত পার্থক্য বেশ চোখে পড়ে। শোকের কারণ বেশ দূরে গিয়া পড়িয়াছে, আগেকার সে ক্ষতিবোধ নাই, তবে ক্ষতচিহ্ন আছে, সেই ক্ষতচিহ্ন মনে একপ্রকার বেদনার স্মৃতিময় ব্যাকুলতা জাগাইয়া তোলে। বোধ করি এইজন্যই অংশুর অনেকগুলি কবিতা নৈর্ব্যক্তিক ও তত্ত্ব-আভাসিত। ব্যক্তিগত ব্যথা হইতে কবির মন তত্ত্বে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে, ব্যথাশ্রয়ী মন এখানে তত্ত্বাশ্রয়ী। কিন্তু তত্ত্ববিন্যাস বা তত্ত্বপ্রতিষ্ঠা প্রিয়ম্বদা দেবীর প্রতিভার স্বরূপ নয়, তাই অচিরে নূতন আশ্রয় সন্ধান

করিয়া বাহির করিয়াছে। আগেকার কাব্য প্রকৃতি ও মানুষের টানা-পোড়েনে বোনা, অংশত অনেক কবিতার একটি সূত্র প্রেম, আর-একটি সূত্র পৌরাণিক দেব-দেবী এবং পৌরাণিক নরনারী। একদা ব্যথার সান্ত্বনার জন্য যেমন প্রকৃতির কাছে কবি গিয়াছিলেন, এখানে তেমনি গিয়াছেন পৌরাণিক যুগের মহত্ত্বে ও ত্যাগোজ্জ্বল চারিত্র্যে, উদ্দেশ্য অভিন্ন, লক্ষ্য ভিন্ন, এই মাত্র। এই শ্রেণীর কতকগুলি কবিতা পাড়য়া মনে হয় কবি যেন কতক পরিমাণে নিজের বেদনা ও বিচ্ছেদের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন অপরের ব্যথার অপূরণীয় তীব্রতা নিজের ব্যথাকে কতক পরিমাণে সুসহ করিয়া তুলিয়াছে।

চম্পা ও পাটল প্রিয়ম্বদা দেবীর শেষ কাব্য, মৃত্যুর পরে প্রকাশিত এ বই-খানা তাঁহার কবিজীবনের উপসংহার। জীবনান্তের ব্যথা যেন সমে আসিয়া আবার উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে, দিনান্তের সন্ধ্যাকাশে যেন সূর্যোদয়েরই সমারোহ, তবু ঠিক এ নয়, ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিলেই ক্লান্তির আভাস ধরা পড়ে। প্রভাতের সে নবোত্তম কই? ভৈরবী আর পূরবী দুইই ব্যাকুল করা রাগিণী, কিন্তু সে ব্যাকুলতার জাত যে ভিন্ন।

ব্যথার উপসংহারে ব্যথার ভূমিকার উপাদানগুলি আবার প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, পৌরাণিক তত্ত্বের পরিবর্তে প্রকৃতির প্রতি গভীর আস্থা ও অনুরাগের তত্ত্ব ফিরিয়া দেখা দিয়াছে, ফুলের বাগানে ফুলই ফোটে।

আরও একটি বিষয় কবির অবসন্ন জীবনান্ত স্মরণ করাইয়া দেয়। চারি দিকের নরনারীর জীবনলীলার প্রতি এমন একটি বিরক্তি আগ্রহ পরিস্ফুট যাহা কেবল বিদায়-চেতন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

৫

প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতা সংখ্যায় অল্প, আকারে ক্ষুদ্র, অলংকারে দীন, ভাষায় স্বচ্ছ এবং ভাবে ও রূপে বিচিত্র নয়। এগুলি এমন মৃদু, এমন বাক্‌কুণ্ঠ, এমন অধোক্ত - মনে হয় এ যেন কবির স্বগতোক্তি, বিজন মধ্যাহ্নে পল্লবে নিলীন ঘুঘুর স্থগিত বিলাপে যে ক্লান্ত ব্যাকুলতা, তাই যেন এ কবিতাগুলির মর্মে মর্মে জড়িত। এমন রচনার সমাদর হওয়াই কঠিন, বাংলা কাব্যসৃষ্টির বর্তমান অবস্থায় তো একেবারে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। তবু ব্যথা যদি গভীর হয়, অভিজ্ঞতা যদি সত্য হয়, আর সেসব যদি শিল্পসম্মত রূপ লাভ করিয়া থাকে, তবে সে রসসৃষ্টির মার নাই।

আধুনিক পাঠক যদি উপেক্ষা করিতে পারে, তবে এ কাব্যও অপেক্ষা করিতে পারিবে। আধুনিক আর সবই করিতে পারে, কেবল অপেক্ষা করিতে অক্ষম ; আজকার দিনের সঙ্গেই যার গাঁটছড়া বাঁধা, আজকার দিনের সঙ্গেই যে তার সহমরণ অবশ্যম্ভাবী। শিল্পে ও সাহিত্যে নূতন চাকরের মতই নূতন বিষয়কে বিশ্বাস করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়, প্রিয়ম্বদা দেবীর কাব্য মানুষের ব্যথার মতই পুরাতন, সেইজন্যই চিরন্তন।

রবীন্দ্রনাথের উক্তি দ্বারা সূচনা করিয়াছিলাম আবার তাঁহার উক্তিতেই শেষ করি, "বাংলা-সাহিত্যে প্রিয়ম্বদার কবিতা স্বকীয় আসন রক্ষা করতে পারবে, কেননা সে অকৃত্রিম"।

কবি সতীশচন্দ্র রায়

১৮৮২-১৯০৪

যে কয়েকজন বাঙালী সাহিত্যিক তাঁহাদের রচনায় প্রতিভার আভাসমাত্র রাখিয়া অল্পবয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কবি সতীশচন্দ্র রায় অন্যতম। বাংলা সাহিত্যের সরস্বতী যদি আজ বর দিতে উদ্যত হন যে ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের যে-কোন একজনকে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে, ফিরিয়া আসিয়া তিনি তাঁহার অসমাপ্ত সাহিত্যলীলাকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিবেন, তবে আমি নিঃসংশয়ে সতীশচন্দ্রের প্রত্যাবর্তন কামনা করি। প্রবাসী পত্রিকায় তিন বন্ধুর একখানি ফটোগ্রাফ দেখিয়া ছিলাম। এই তিন বন্ধু, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অজিতকুমার চক্রবর্তী ও বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় কবি সতীশচন্দ্র রায়। ভাগ্য এই তিন প্রতিভাবান্ যুবককে বন্ধুত্বসূত্রে একত্র করিয়াছিল, আবার তিন-জনকেই অকালে হরণ করিয়া লইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ চল্লিশ বৎসরে গেলেন, অজিতকুমার বত্রিশ বৎসরে, আর সতীশচন্দ্রের বয়স বাইশ বৎসরও পূর্ণ হইতে পায় নাই। সত্যেন্দ্রনাথ ও অজিতকুমার বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, কিন্তু সতীশচন্দ্র সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত। কিংবা 'বিস্মৃত বলিলে অত্যুক্তি হয়, তাহাতে মনে হইতে পারে একসময়ে তিনি বিশ্রুত ছিলেন। বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যের দিগন্তে আভাসিত হইয়াই তিনি অস্তমিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতি রসিকের দৃষ্টি পড়িবার আগেই তাঁহার নিমজ্জন ঘটিয়াছে। সতীশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের শুক্লদ্বিতীয়ার চন্দ্রকলা। দু-চারজন সাহিত্যরসিকের দৃষ্টি ওই ক্ষীণ চন্দ্রকলায় পূর্ণিমার আভাস দেখিয়াছিল। এই দু-চারজনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রধান।

সতীশচন্দ্রের জীবনী সম্বন্ধে অজিতকুমার 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী' গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

> "১২৮৮ সালের মাঘে সতীশচন্দ্র বরিশাল জিলার অন্তর্গত উজিরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতামহ স্বর্গীয় তিলকচন্দ্র রায় বরিশালে বিশেষ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন জমিদার ছিলেন। জমিদারির ভগ্নদশায় সতীশ সেই পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখকষ্টের মধ্যে মানুষ হন। বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে ইনি বরাবর অধ্যয়ন করিয়া সেখান হইতে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অধ্যয়নার্থে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। বি. এ. পরীক্ষার জন্য

যখন প্রস্তুত হইতেছেন তখন কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে ইহার পরিচয় ঘটে এবং কিয়ৎকালের মধ্যেই তিনি ভবিষ্যৎ সাংসারিক উন্নতির আশা জলাঞ্জলি দিয়া বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে জীবন উৎসর্গ করেন। পশ্চিমে একবার ভ্রমণ করিতে গিয়া সতীশচন্দ্র বসন্তরোগে আক্রান্ত হন এবং ৩১০ সালের মাঘী পূর্ণিমার দিনে ২২ বৎসর বয়সে বোলপুরে প্রাণত্যাগ করেন।"

সতীশচন্দ্রের জীবনকালে তাঁহার কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে 'গুরুদক্ষিণা' নামে একটি ক্ষুদ্র কথা রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়। আরও কিছুকাল পরে, ১৩১৯ সালে তাঁহার বন্ধু অজিতকুমারের প্রযত্নে ও সম্পাদনায়, তাঁহার কয়েকটি পদ্য ও গদ্য রচনা 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। রচনাবলীর নিবেদনে সম্পাদক সতীশচন্দ্রের রচনা সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"কলিকাতায় আসিবার পূর্বে তাঁহার অল্পবয়সের বহু রচনা ছিল। কিন্তু সেগুলির কোনটাই তেমন আকারপ্রাপ্ত হইয়া উঠে নাই। কলিকাতায় থাকিতে এবং বোলপুর আসিবার পর হইতে তিনি যে-সকল রচনা লিখিয়াছিলেন, তাহারাই এ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। তাঁহার কয়েকদিনের মাত্র একটি ডায়ারি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারি মধ্যে তাঁহার নিজের জীবনখানি এবং অন্তরের প্রতিকৃতিটি বড় স্বচ্ছ এবং সুন্দর ভাবে তিনি লিখিয়া দিয়াছেন। ডায়ারির মধ্যে ব্যক্তিগত কথা থাকিলেও তাহা সেই কারণে যথাযথ ভাবে এই গ্রন্থে প্রকাশ করা হইল।"

সতীশচন্দ্রের রচনার পরিমাণ সামান্য—পৌরাণিক উতঙ্কের কাহিনী অবলম্বনে রচিত গুরুদক্ষিণা নামে একটি কথা, আর রচনাবলীতে সংগৃহীত গদ্য-পদ্য রচনা। শেষোক্ত গ্রন্থখানির পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৭৮, প্রথমোক্ত খানির মাত্র ৫২। গুরুদক্ষিণা এখনও কিনিতে পাওয়া যায়—কিন্তু রচনাবলী সম্পূর্ণ দুর্লভ হইয়া গিয়াছে। বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ শান্তিনিকেতনের পুরাকালের এই প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক-অধ্যাপকের রচনাবলী পুনঃপ্রকাশ করিবেন স্থির করিয়াছেন—ইহা দ্বারা বাংলা সাহিত্যের একটি মহদুপকার বিশ্বভারতী করিবেন, আর প্রসঙ্গত শান্তিনিকেতনের এই নিষ্কাম কর্মীর প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইবে।

২

সতীশচন্দ্র জীবনে খ্যাতিলাভ করিয়া যান নাই, খ্যাতি অর্জন করিবার মত জীবনের দীর্ঘতা পান নাই, অশরীরী কবিকল্পনাকে সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইবার সুযোগ লাভ করেন নাই—এ সমস্ত নিদারুণ সত্য। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একটি মহৎ সৌভাগ্য তাহার ঘটিয়াছিল—তিনি রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম স্নেহ ও শ্রদ্ধা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন— এমন স্নেহমিশ্রিত শ্রদ্ধা আর কোন তরুণ বাঙালী সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের নিকট পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের পূর্বতন সংস্করণে "বন্ধুস্মৃতি" অধ্যায়ে সতীশচন্দ্রের বিষয়ে একটি প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধটিই 'গুরুদক্ষিণা'র ভূমিকারূপে সংযোজিত। কবিগুরুর শেষ বয়সের 'বনবাণী' গ্রন্থের "শাল" শীর্ষক কবিতায় যে তরুণ বন্ধুর উল্লেখ আছে তিনি এই সতীশচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ যাঁহাদের ঘটিয়াছে তাঁহারা জানেন সাহিত্যপ্রসঙ্গ উঠিলেই তাঁহার মুখে সতীশচন্দ্রের অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগের কথা শুনিতে পাওয়া যাইত। সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর হইতে 'বনবাণী' প্রকাশের সময় বড় অল্প নহে—রবীন্দ্রনাথের মনে সতীশচন্দ্রের স্মৃতি এই দীর্ঘকালের উপরে বিস্তারিত হইয়া আছে। অকালে পরিসমাপ্ত-জীবন এই তরুণ কবির স্মৃতি কবি বনস্পতির শাখায় শাখায় এক অলৌকিক আলোকলতার মত জড়িত হইয়া রহিয়াছে। তরুণ কবি ও মহাকবির এই ভাবসান্নিধ্য ভবিষ্যতের কবিদের অনুসন্ধিৎসু কল্পনার জন্য এক লোভনীয় উপজীব্য হইয়া রহিল।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আদর্শ সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, সেই আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া বিদ্যালয়ের কাজে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, এমন কর্মী বিরল। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "এই কথা লইয়া একদিন খেদ করিতেছিলাম, তখন সতীশ আমার ঘরের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সে হঠাৎ লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া বিনীত স্বরে কহিল, আমি বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষাদানকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমি কি এ কাজের যোগ্য? তখনো সতীশের কলেজের পড়া সাঙ্গ হয় নাই। সে আর কিছুর জন্যই অপেক্ষা করিল না, বিদ্যালয়ের কাজে আত্মসমর্পণ করিল। ভাবী সাংসারিক উন্নতির সমস্ত আশা ও উপায় এইরূপে বিসর্জন করাতে সতীশ তাহার আত্মীয়বন্ধুদের কাছ হইতে কিরূপ বাধা পাইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ কল্পনা করিতে পারিবেন। এই সংগ্রামে সতীশের হৃদয় অনেকদিন অনেক গুরুতর আঘাত সহিয়াছিল, কিন্তু পরাস্ত হয় নাই।"

কল্পনাক্ষেত্র হইতে কার্যক্ষেত্রে নামিয়া আসিলে সংকল্পের শক্তি অনেকটা চলিয়া যায়, কিন্তু সতীশচন্দ্রের কল্পনার সহিত সংকল্পের দৃঢ়তা যুক্ত হইয়াছিল, যে-কল্পনা আপাত-ক্ষুদ্রতার মধ্যে ভবিষ্যতের মহৎ সম্ভাবনাকে দেখিতে সমর্থ হয়, যে-সংকল্প প্রাত্যহিক বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হইতে সাহায্য করে, সতীশচন্দ্রে তাহার দুইটিই প্রচুর ছিল। সেই জন্য কেবল যে তিনি তৎকালীন ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের কাজে আত্ম-সমর্পণ করিলেন তাহাই নয় বিদ্যালয়ের মহৎ ভবিষ্যৎকেও অন্তরে লালিত করিতে লাগিলেন।

সতীশচন্দ্রের তৎকালীন জীবনচর্যা সম্বন্ধে কবিগুরু লিখিতেছেন, "এই আশ্রমের একপ্রান্তে বিদ্যালয়ের মৃন্ময় কুটীরে সতীশ আশ্রয় লইয়াছিল। সম্মুখের শাল-তরুশ্রেণীতলে যে কঙ্করখচিত পথ আছে, সেই পথে কতদিন সূর্যাস্তকালে তাহার সহিত ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে, এবং জনশূন্য প্রান্তরের নিবিড় নিস্তব্ধতার উর্ধ্বদেশে আকাশের সমস্ত তারা উন্মীলিত হইয়াছে। এখানকার এই উন্মুক্ত আকাশ ও দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরের মাঝখানে আমি তাহার উদ্‌ঘাটিত উন্মুখ হৃদয়ের অন্তর্দেশে দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। এই নবীন হৃদয়টি তখন প্রকৃতির সমস্ত ঋতুপরম্পরার রসস্পর্শে, সাহিত্যের বিচিত্র ভাবান্দোলনের অভি-ঘাতে ও কল্যাণসাগরে আপনাকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিবার আনন্দে অহরহ স্পন্দিত হইতেছিল।"

পূর্বে যে 'বনবাণী'র "শাল"-শীর্ষক কবিতার উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে সেই শালতরুশ্রেণীর নিম্নশায়ী কঙ্করখচিত পথের এই স্মৃতিটিই কাব্যাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

সতীশচন্দ্রের কাব্যের আলোচনা করিতে বসিয়া এত বিস্তৃত আকারে তাঁহার আশ্রমবাসের কথা বলিতেছি এই কারণে যে, তাঁহার প্রতিভার স্ফূর্তি বুঝিবার পক্ষে আশ্রমবাসের স্মৃতিটি অপরিহার্য। শান্তিনিকেতনের উদার প্রান্তর ও উদারতর আকাশ, এখানকার চন্দ্রের জ্যোৎস্না ও রবির কিরণ তাঁহার প্রতিভাকে ধীরে ধীরে পরিণত করিয়া তুলিতেছিল। শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির সহিত তাঁহার প্রতিভার সম্বন্ধ নিবিড়। এই সম্বন্ধটুকু বুঝাইবার জন্যই এত চেষ্টা। সতীশচন্দ্রের 'গুরুদক্ষিণা' কাহিনীর আলোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়া-ছেন, "এই গ্রন্থটুকুকে সে শিল্পীর মত রচনা করে নাই—এই আশ্রমের আকাশ, বাতাস, ছায়া ও সতীশের সদ্য-উদ্বোধিত প্রফুল্লনবীন হৃদয়ে মিলিয়া গানের মতো

করিয়া ইহাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে।" কেবল 'গুরুদক্ষিণা' মাত্র নয়, এই উক্তি তাঁহার সমস্ত গদ্য পদ্য রচনা সম্বন্ধেই সত্য। প্রতিভাস্ফূর্তির প্রারম্ভে শান্তিনিকেতনে না আসিলে তাঁহার রচনা কি আকার পাইত জানি না—কিন্তু যথাসময়ে আসিয়া পড়াতে বর্তমান আকার লাভ করিয়াছে।

সতীশচন্দ্রের রচনার পাঠকদের পরম সৌভাগ্য এই যে, তাঁহার ডায়ারির কয়েকটি পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার হৃদয় ও তাঁহার রচনার মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করিয়া এই কয়েকটি পত্রখণ্ড বিদ্যমান। ইহার সাহায্যে তাঁহার প্রতিভা হইতে রচনায়, রচনা হইতে প্রতিভায় অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারা যায়, এবং সেই কারণে সমালোচকের কাজও অনেকটা সরল হইয়া গিয়াছে।

সতীশচন্দ্রের ডায়ারির প্রারম্ভে দেখিতেছি তিনি লিখিতেছেন—"আপনাকে পাইতে হইবে আপনাকে না পাইলে জীবন মিথ্যা। আমি কুলক্রমাগত সংস্কারের সমাজের দাস হইয়া মূর্খের মত কেন ফিরিব? আমি পরের উপদিষ্ট এক অগম্য অননুভূত কাল্পনিক ঈশ্বরকে 'ঈশ্বর ঈশ্বর' করিয়া আত্মার ধার কেন কুণ্ঠিত করিব? আমি আপনাকে জানি।" ইহা লিখিবার সময়ে সতীশচন্দ্রের বয়স কুড়ি বৎসর। এ বয়সে এ জাতীয় উক্তি আমাদের দেশে বিরল নয়—কলেজের ছাত্রদের অনেকের ডায়ারিতেই এই শ্রেণীর উক্তি লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু বাস্তবের ঘা খাইতেই তাহাদের মাথা হইতে আপনাকে পাওয়ার ভূত নামিয়া গিয়া চাকুরি পাওয়ার ব্রহ্মদৈত্য চাপিয়া বসে। কিন্তু সতীশচন্দ্রের বেলায় গোড়া হইতেই ব্রহ্মদৈত্য নামিয়া গিয়াছিল— কাজেই তাঁহার ক্ষেত্রে এই উক্তিকে গতানুগতিক ভাবে না দেখাই উচিত। কিন্তু আর-এক আশঙ্কা ছিল—সে হইতেছে morbidityর আশঙ্কা। অল্পবয়সের অত্যধিক অন্তর্মুখিতা মানুষকে অনেক সময়ে বাস্তববোধবিবর্জিত করিয়া morbid করিয়া তোলে। এমন দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে অবিরল।

রবীন্দ্রনাথ সতীশচন্দ্রের মনের এই গতি যেন টের পাইয়াছিলেন। সতীশচন্দ্রের ডায়ারিতে দেখিতেছি—"গুরুদেব বলিয়াছেন আত্মালোচনা করিতে গিয়া morbid হয়ে পোড়ো না। morbid কেন হইব? আমার স্বাস্থ্য কি এতই খারাপ? আমার সহজ আনন্দকে কেন দমাইতে যাইব? কেন morbid হইব? জীবনের রস কি আমি কিছুমাত্র পাই নাই? হায়! প্রতিদিন আমি কি-একটি সৌন্দর্যের কাছে আসিতেছি!...গুরুদেবের স্নেহই তো আমার জীবনের উপরে সূর্যরশ্মির মতো পড়িয়াছে। তাঁহার সেই অপরাজিতা ফুলের মতো কোমলতাপূর্ণ

চক্ষু দুটি আমার হৃদয়ের ভিতরের সহস্রদল পদ্মের উপরে স্থাপিত হইয়াছে। আমার প্রাণে মনে ভাবে কল্পনায় সংসারে সর্বত্র তাঁহার স্নেহকিরণ পড়িয়াছে। ফুলের উপরে প্রভাতের সূর্যরশ্মি পড়িলে সে যাহা অনুভব করে তাহা আমি একটু একটু যেন বুঝিতে পারি।"

সতীশচন্দ্র বলিতেছেন, তাঁহার morbid হইয়া না পড়িবার কারণ রবীন্দ্রনাথের স্নেহ। আর একটি কারণও তিনি প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিয়াছেন—প্রকৃতির প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক, সহজাত প্রীতির আকর্ষণ। এই দুটি কারণকে যথাযথ না বুঝিলে তাঁহার জীবন ও কাব্য বুঝিয়া ওঠা দুষ্কর। রবীন্দ্রনাথের স্নেহ সম্বন্ধে সতীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দুইজনের উক্তিই জানিতে পারিলাম। এবার দ্বিতীয় কারণটির বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতে পারে।

৩

ছেলেবেলাতে বালকদের মনে প্রকৃতি একপ্রকার অন্ধ আকর্ষণ বিস্তার করিয়া থাকে। কিন্তু সংসারের সৌভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ ছেলেমেয়ে রবীন্দ্রনাথ বা ওয়ার্ডস্বার্থ হয় না বলিয়া এই আকর্ষণের ব্যাপকতা সকলে জানিতে পায় না। কিন্তু একথা একপ্রকার সত্য যে ওয়ার্ডস্বার্থ বা রবীন্দ্রনাথ যে আকর্ষণ দুর্নিবার ভাবে অনুভব করেন, অন্য ছেলেমেয়েরাও তাহা নিস্তেজভাবে নিষ্ক্রিয়ভাবে অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু বয়স বাড়তির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির আকর্ষণ ঝরিয়া পড়িয়া যায়, তাহাদের হৃদয় সংসারের অভিজ্ঞতায় ও আঘাতে জড়ত্বপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবান অধিকবয়সেও বাল্যকালের প্রাকৃতিক প্রীতি হইতে বঞ্চিত হয় না। সতীশচন্দ্রের বাল্যকালের প্রকৃতির অনুরাগ প্রাপ্তবয়সেও ছিল। আর শুধু তাই নয়, এই প্রীতির আলোকেই তিনি বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ লাভ করিতেছিলেন, আরও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে এই আলোর শিখাতেই জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিতে পারিতেন। অন্তর্জগতের স্বভাব এই যে, একই আলো এখানে বিভিন্ন ব্যক্তির চোখে বিভিন্ন দৃশ্য প্রকাশ করিয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডস্বার্থ দুই জনেই একই আলোকে জগৎ দেখিয়াছেন, কিন্তু ঠিক এক জগৎ-রূপ দেখেন নাই। সতীশচন্দ্রও সেই দীপ হাতেই জীবনতীর্থে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু অকালমৃত্যুর ফলে জগৎ-রূপ দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া ওঠে নাই। কিন্তু সামান্য যে-কয়েকটি রচনা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারা যায়, জগৎ-

দর্শনের পথেই তিনি চলিয়াছিলেন—সে আভাস তাঁহার কবিতায় আছে। তাঁহার বাল্যের প্রকৃতির আকর্ষণ, যৌবনের প্রকৃতির প্রীতিতে পরিণত হইয়াছিল। প্রকৃতির বৈচিত্র্য তাঁহাকে মুগ্ধ, বিস্মিত ও ভীতিরসে আপ্লুত করিয়াছিল—প্রকৃতির বৈচিত্র্য যে একটি অখণ্ড সত্যেরই প্রকাশ এ সত্যও তিনি বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—কিন্তু সে বোধ কল্পনাগত হইয়া তাঁহার হাতে যে কাব্যবস্তু হইয়া ওঠে নাই তাহার একমাত্র কারণ, তিনি বয়সের সে ব্যাপ্তি পান নাই। তাঁহার কবিতা তাঁহার অলিখিত কাব্যের আভাস, তাঁহার অসমাপ্ত জীবনের আভাস কাজেই তাঁহার জীবন ও কাব্যের আলোচনাও পরিপূর্ণ আলোচনার আভাসমাত্র হইতে বাধ্য।

সতীশচন্দ্র বাল্যকালের প্রসঙ্গে ডায়ারিতে লিখিতেছেন—"ছেলেবেলায় 'আমাকে' স্পষ্টই ঐ দেখিতে পাইতেছি। প্রকৃতির সঙ্গে আমার কি ভাব ছিল। বৃষ্টির দিনে কে আমাকে ঘরে রাখিবে? ঝড়ের দিনে কত ভাল লাগিত! বর্ষা-বিদ্যুতের গর্জনে কি নিবিড় আনন্দে হৃদয় কাঁপিত। বাহিরই আমার প্রিয় ছিল।...আজও গ্রাম্য প্রকৃতিটি আমার বুকের মধ্যে লাগিয়া রহিয়াছে। সেই দীঘি, সেই বটগাছ আমার কাছে দেবতার মতো বোধ হয়। স্মরণমাত্রেই হৃদয়ে এমনি একটি অপূর্ব আনন্দ এবং ঔদার্যের সঞ্চার হয় যে তাহা বলিতে পারি না।"

যে দু'টি তন্তুর টানাপোড়েনে এই বালক-কবির জীবন বয়ন হইতেছিল তন্মধ্যে একটি প্রকৃতির প্রীতি, অপরটি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় হইবার পূর্বেই রবীন্দ্র-কাব্যের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। স্কুল-জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে "গুরুদেবের স্বর্ণময় কবিতার সহিত পরিচয় হয়।... গুরুদেবের কবিতাই আমাকে ধরিয়াছিল। সেই স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আজ উদয়াচলের ঘাটে আসিয়া ঠেকিয়াছি। রবির কিরণ প্রত্যক্ষভাবে আমার মর্মের ভিতরে নামিয়া মধু-ভাণ্ডারটিকে পূর্ণ করিতেছে, দলগুলিকে বর্ণে পূর্ণ করিতেছে।"

তার পরে সতীশচন্দ্র প্রথম-যৌবনে শান্তিনিকেতনে আসিয়া পড়িলেন। সেখানকার প্রকৃতিও তাঁহাকে নিবিড়ভাবে পাইয়া বসিল।

শান্তিনিকেতনের আকাশ প্রসারিত মাঠের উপরে গ্রীষ্মকালের দুপুরে হঠাৎ যে ঝড় দেখা দেয়, ঝড়ের উত্তরপর্বে যে বৃষ্টি নামে সতীশচন্দ্র তাহার বর্ণনা করিতেছেন—"কাল আমরা খসখসের পর্দাঢাকা রথীন্দ্রের কক্ষে শুইয়া, বসিয়া, লুটিয়া, গরমে হেলাহেলি করিয়া দুপুর যাপন করিতেছিলাম। হঠাৎ মাঠের উপর ছায়া পড়িতে লাগিল। পশ্চিম-উত্তর কোণ হইতে আকাশের উপরে বড় বড় মেঘ

জলে ভারী হইয়া কালো হইয়া টলমল করিয়া আসিতে লাগিল। অল্প একটু একটু হাওয়া। হঠাৎ বাহির হইয়া দেখি দূরে হাওয়া উঠিয়াছে। আমরা মাঠে নামিয়া দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিলাম। আঃ এই বিরাট মাঠের মধ্যে ধুলিরাশির হুহু করিয়া দৌড়াইয়া যাওয়ার দৃশ্যটি কি চমৎকার। ভেরীরবে আহূত যুদ্ধযাত্রী হাজার হাজার অশ্বারোহীর মত হোঃ হোঃ করিয়া ধূলিপটল ছুটিয়াছে। ক্রমে মেঘে ধুলায় মিলিয়া একটা ঘোর অন্ধকার হইয়া গেল। একটু দূরেই আর কিছু দেখিতে পাই না। যেদিক হইতে পবনদেব আক্রমণ করিতেছিলেন সেদিকে মুখ ফিরাইবে কাহার সাধ্য। অস্ত্রলেখা পৃষ্ঠেই লইতে হইল। তাও দাঁড়াইয়া থাকা মুস্কিল, এত ছিটাগুলি আসিয়া পিঠের উপরে বর্ষিত হইতে লাগিল। তখন কাজেই হাওয়ার সঙ্গে দৌড়াইতে লাগিলাম। ভারি আনন্দের আশায় সকলকে ছাড়িয়া মাঠের মধ্যে দৌড়াইয়া যাইতে লাগিলাম। এমন হাওয়ার মধ্যে পড়িলে গম্ভীর লোকদেরো পাগল হইতে হয়।···যা হোক সেই রুদ্র ঝঞ্ঝার সঙ্গে মিলাইয়া যথা সম্ভব উচ্চকণ্ঠে বার বার ওংকার শব্দ উচ্চারণ করিয়া উঠিলাম। ভারি চমৎকার লাগিল।·· ক্রমে ঝড় পড়িয়া আসিল— বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, কিন্তু বৃষ্টিও থামিয়া আসিতে লাগিল। আমি মাঠের বিচিত্র গেরুয়া রঙের জলপ্রবাহের মধ্য দিয়া ফিরিতে লাগিলাম। ভীষণ বেগে গেরুয়া জলে সাদা ফেনা তুলিয়া স্রোত নামিয়া যাইতেছে।·· তখন ঝড়বৃষ্টি থামিয়া সব চুপ, আকাশ মেঘলা কোমল, মাঠ সিক্তচ্ছবি কিন্তু শুষ্কপ্রায়।”

শান্তিনিকেতনের মাঠে ঝড়বৃষ্টির এই অকস্মাৎ তাণ্ডব স্বচক্ষে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই এই বর্ণনার সম্যক রস পাইবেন এখন সে মাঠ মানব হস্তরোপিত গাছপালায় শ্যামল হইয়া গিয়া ঝড়ের উদার আসরকে সংকীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে, কাজেই ঝড়ের পূর্বরূপ দেখিতে হইলে রবীন্দ্রনাথের কোন কোন কবিতার আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় নাই। সতীশচন্দ্রের ডায়ারির পাতায় সে দিনের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ। তাঁহার রচিত গুরুদক্ষিণা গ্রন্থের কোন কোন স্থলে সে বর্ণনা লিখিত আছে। উক্ত গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে যে প্রান্তর ও গ্রীষ্মমধ্যাহ্নের বর্ণনা, তাহা শান্তিনিকেতনের মধ্যাহ্নের অভিজ্ঞতারই রূপান্তর।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মূলে একটি অখণ্ড ঐক্য আছে এই উপলব্ধি ধীরে ধীরে সতীশচন্দ্রের চিত্তে দেখা দিতেছিল। গুরুদক্ষিণা গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদে রসাতলের বর্ণনাটি এই ঐক্যোপলব্ধির চিহ্ন। জগতের বৈচিত্র্যের মূল রসাতলে নিহিত।—“রসাতলই সেই অতল রসের ভাণ্ডার যেখান হইতে রস

টানিয়া এই সৌরজগৎ একটি গাছের মত বিকশিত হইয়া আছে। এই জগতের উপরে আলোকে বিদ্যুতে বিকীর্ণ যে তেজ দেখিতেছ, সেও রসাতলের গোপন কক্ষে আপনাকে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, এবং পৃথিবীর উপরে যে বৎসরের অংশে অংশে ঋতুর বিচিত্র ছবি দেখিতেছ, ইহাও সেইখানকার একটি মূল ছবির প্রতিবিম্ব, এবং পৃথিবীর নিত্যনূতন দিবা রাত্রিও সেখানকার একটি প্রচ্ছন্ন শক্তির লীলামাত্র। এই পৃথিবী, এই সৌরমণ্ডল নানা ক্ষয় সত্ত্বেও যে প্রতিদিন সজীব রহিয়াছে, ঋষি-কবিগণ সেই সজীবতার মধ্যে যে ঐশী শক্তি দেখিতে পাইতেন তাহাকেই বলিতেন দেবতা অশ্বিনীকুমার জগতের স্বাস্থ্যের তরুণ দেবতা যুগল অশ্বিনীকুমারও সেই রসাতলে তাঁহাদের তেজোময় সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন।"

এই বর্ণনাটিও তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার রূপান্তর। তাঁহার ডায়ারির এক স্থলে আছে—"এই বিরাট বোলপুরের মাঠ রৌদ্রে অগ্নিতেজ বুঝাইয়া দেয় সবিতার তেজ বুঝাইয়া দেয়, ঝড়ে বায়ুর শক্তি প্রকাশ করে, মেঘে বর্ষায় ইন্দ্রকে স্মরণ করায় এবং অন্ধকারে চান্দ্রমসী ভাষা তারকা ভাষা লিখিয়া অশ্বিনীকুমারের রসভাবের অনুভূতি দান করে।"

এই অনুভূতি, এই কল্পনা কেবল সতীশচন্দ্রের বাল্যকালসুলভ কল্পনা নয়, জগতের বাল্যকালীন কল্পনা বাল্যকালীন অনুভূতি, যে অনুভূতি ও কল্পনার যোগে প্রাচীন কালের পুরাণ ও উপকথার সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল। জগৎ হইতে এই রহস্য বোধ অন্তর্হিত হইয়াছে—এখন কেবল সৌভাগ্যবানেরাই মাঝে মাঝে ইহা অনুভব করিয়া থাকেন, প্রাচীনকালে সমগ্র মানবসমাজ এই সৌভাগ্যের অধিকারী ছিল। গুরুদক্ষিণার সপ্তম পরিচ্ছেদে রসাতলের যে বর্ণনা দেখিতে পাই, যে কবিকল্পনার সাক্ষাৎ লাভ করি বাংলা সাহিত্যে তাহা বিরল। কিন্তু তার সঙ্গে যখন মনে পড়ে যে, লেখকের বয়স একুশ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই, তখন বিস্ময়ের ও পরিতাপের অন্ত থাকে না—'কি হইতে পারিত'র বিস্ময় 'কি হারাইলাম'এর পরিতাপকে নিরন্তর আন্দোলিত করিতে থাকে। নিজের সাহিত্যিক সম্ভাবনার বিশিষ্ট রূপটি সম্বন্ধে সতীশচন্দ্র কি সচেতন ছিলেন? তাঁহার ডায়ারিতে দেখিতেছি—"কবিতা রচনার এত নিবিড় ব্যথা আমি কোনো দিন ধরিতে পারিব না? জানি না—কিন্তু আজ অন্ততঃ এটা নিশ্চয় দেখিতে পাইতেছি যে ভবিষ্যতের সাহিত্যের মধ্য দিয়া শান্ত সুন্দর গন্ধধারা বহিয়া যাইতেছে, উহাই আমার। ঐ ধারা কল্পনা সৌন্দর্য এবং উল্লাসের আক্রমে একটা বড় এবং বিচিত্র কিন্তু নিবিড় বেদনায় সুগভীর না

হইতেও পারে। আমার চিত্তক্ষেত্রে বিচরণশীল এই তেজস্বী কল্পনামূর্তিগুলি কবে বাহির হইবে? আমি essentially Indian—ভারতের রস আমার প্রাণে বসিয়াছে।”

সতীশচন্দ্রের ডায়ারির স্থানে স্থানে যে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ আছে, তাহা কবিকিশোর কীট্‌সের পত্রাবলীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সতীশচন্দ্র 'essentially Indian' যে ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। রসাতলের বর্ণনাই তাহার প্রমাণ। ভারতীয় আধ্যাত্মিক রসের জন্মগত অধিকার না লইয়া আসিলে কাহারো পক্ষে এমন রচনা সম্ভবপর হইত না। কীট্‌স-ও essentially গ্রীক ছিলেন, গ্রীকদের সৌন্দর্যদর্শনের তৃতীয় দৃষ্টি লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

যে 'শান্ত সুন্দর গন্ধধারা'র উল্লেখ সতীশচন্দ্র করিয়াছেন তাঁহার ডায়ারিতে, গুরুদক্ষিণায় এবং কোন কোন গদ্য-রচনায় তাহা প্রবাহিত। এই সরস্বতীপ্রবাহ অকালে বালুকান্তরে অন্তর্ধান করিয়াছে বটে, কিন্তু কান পাতিয়া থাকিলে রচনার মধ্যে এখনো তাহার তরুণ বেণীবিন্যাসের অনির্বচনীয় স্বগত বিলাপ নিঃসন্দেহে শুনিতে পাওয়া যাইবে।

৪

সতীশচন্দ্র 'আরো একটি কথা' (One Word More by Robert Browning) প্রবন্ধে বলিতেছেন—“যদি পুনর্জন্ম মানিতে হয় এবং বিশ্ব পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, এরূপ যদি বিশ্বাস করি, তবে শেলি ব্রাউনিংরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিতে পারি না কি? তিনি বলিতেছেন, শেলির মৃত্যুর এবং ব্রাউনিঙের জন্মের তারিখ দুইটি বিস্মৃত হইতে পারিলে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে। সতীশচন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত মনে করিবার কারণ নাই। যেহেতু ব্রাউনিং ও শেলির কাব্যে গুণগত, মূলগত প্রভেদ—সে প্রভেদ জন্মান্তরেও ঘুচিবে এমন আশা নাই। তবে ইহাতে এইটুকু মাত্র প্রমাণ হয় যে, কিশোরকবির চিত্তে ব্রাউনিং ও শেলি দুইজনেই প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন। ব্রাউনিঙের কাব্যপাঠে যে তাঁহার নেশা ছিল এ কথা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন। ব্রাউনিং সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, ব্রাউনিঙের গোটা তিনেক কবিতার স্বচ্ছ অনুবাদও তিনি করিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও ইহা এক প্রকার নিশ্চিত যে, তাঁহার কাব্যে ব্রাউনিঙের প্রভাব নাই—যাহা কিছু প্রভাব

দৃষ্ট হয় সে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্ত রচনায়। অর্থাৎ ব্রাউনিঙের প্রভাব তাঁহার সজ্ঞান মনে প্রতিক্রিয়া শুরু করিয়াছিল, কিন্তু যে নিগূঢ় সত্তা হইতে কাব্যসৃষ্টি হয় সেখানে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

সতীশচন্দ্রের কাব্যের অধিপতি শেলি। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে শেলির প্রভাব তাঁহার কাব্যে সবচেয়ে প্রকট। কিন্তু আমার বিশ্বাস তাঁহার কাব্য নিগূঢ় দৃষ্টিতে পাঠ করিলে একটা প্রভাবান্তরের আভাস পাওয়া যায়। শেলির প্রভাব হইতে কীট্‌সের প্রভাবে তাঁহার কাব্যের সংক্রমণ হইতেছিল, এমন সময়ে তাঁহার কাব্যজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। তাহা হইলে দাঁড়ায় এইরকম যে, শেলির পূর্ণ প্রভাব তাঁহার কাব্যে বর্তমান, তাঁহার কাব্যের ভবিষ্যৎ কীট্‌সীয় মনোভাবের অভিমুখে, ব্রাউনিঙের যাহা-কিছু সে প্রভাব তাঁহার সজ্ঞান মনের উপরে মাত্র, কাব্যলোকে তিনি প্রবেশ করেন নাই।

শেলি ও কীট্‌স দুইটি বিশেষ মনোভাবের প্রতীক। শেলির স্কাইলার্ক শেলির প্রতীক, আর কীট্‌সের নাইটিঙ্গেল কীট্‌সের প্রতীক। শেলির স্কাইলার্ক 'অশরীরী আনন্দ'—পৃথিবীর সংস্পর্শ মুক্ত হইয়া আলোকপ্লাবিত অনন্ত আকাশে উঠিয়া তবে যেন সে আত্মস্থ হয়। আর কীট্‌সের নাইটিঙ্গেল গূঢ়ান্ধকার বনচ্ছায়ায় বসিয়া কূজন করিতে ভালবাসে। একটি পৃথিবী-বিবিক্ত আত্ম-চেতন, অপরটি পৃথিবী সংশ্লিষ্ট জগৎ-চেতন, একটি আত্মকেন্দ্রিক, অপরটি জগৎকেন্দ্রিক, একটি pure intellect, অপরটি pure sensation; রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, একটি নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা, অপরটি সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ মানবজীবনের প্রতি আসক্তি, একজন নিরুদ্দেশ যাত্রার নাবিক, আর একজন সোনার তরীর মাঝি। ব্রাউনিং এ-দুইয়ের কোনটিরই সগোত্র নহেন। শেলি যদি হন দেহবিমুক্ত intellect-এর কবি, কীট্‌স যদি দেহকেন্দ্রিক sensation এর কবি, ব্রাউনিং হবে মানুষের moral values-এর কবি। তাঁহার চিত্রিত অধিকাংশ নরনারীর দ্বন্দ্ব আপনার অন্তরের শুভাশুভবুদ্ধির মধ্যে। Intellect বা sensation যতক্ষণ না moral values এর কোঠায় আসিয়া পড়িতেছে ততক্ষণ ব্রাউনিঙের কাছে ও-দুটি বস্তু নিরর্থক। তাঁহার কাব্যজগতের সুমেরু কুমেরু 'Good' ও 'Evil' এবং ইহাদের আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফলেই জগতে বৈচিত্র্য বিরাজমান—ব্রাউনিং সেই বৈচিত্র্যের কবি। শেলি যে পুনর্জন্মে ব্রাউনিং হইতেন তাহা বিশ্বাস করি কি প্রকারে? বরঞ্চ জন্মান্তরবাদ মানিতে হইলে বলিতে হয়, শেলি পূর্বজন্মে বৈদান্তিক ছিলেন। তিনি Evil-এর মূলোচ্ছেদ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার কাছে Evil নাই,

কারণ যে জগৎটার অস্তিত্বের উপরে Evil-এর প্রতিষ্ঠা, সেই জগৎটাই যে মোয়া কেবল আছে—

"The one remains, the many change and pass,

Heaven's light forever shines, Earth's shadows fly,"

Hymn to Intellectual Beauty-র কবি কোন বহুপূর্বজন্মে সংস্কৃত কাব আনন্দলহরী লিখিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে, কিন্তু কোন পরজন্মে ব্রাউনিঙের কাব্য লিখিবেন, এমন বিশ্বাস পোষণ করা কঠিন।

কীট্‌সের কবি-মন এই দুই হইতেই ভিন্ন। তরুণ শেক্সপীয়রের মনের সঙ্গে কীট্‌সের মনের সারূপ্য আছে—এ সত্য ইংরাজ সমালোচক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতীয় কবিদের মধ্যে কালিদাসের কবি-মন মূলতঃ কীট্‌স শেক্সপীয়রের কবি-মনের শ্রেণীভুক্ত। ইহারা তিনজনেই যে সমান ওজনের কবি এমন কথা বলিতেছি না, কেবল তিনটি মন একই পর্যায়ভুক্ত, ইহাই মাত্র বক্তব্য।

সতীশচন্দ্রের কবি-মন খুব সম্ভবত এই পর্যায়ভুক্ত ছিল। কিন্তু সে পর্যায় সম্বন্ধে সচেতন হইবার পূর্বেই, নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আবিষ্কার করিবার পূর্বেই, তাঁহার কবিজীবন শেষ হইয়াছে। যে কবিকৃতি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে শেলির প্রভাব জাজ্বল্যমান। কিন্তু মাঝে মাঝে কখনো কখনো শেলির জ্যোতিরুদ্দীপ্ত মেঘমালার ফাঁকে ফাঁকে যে-জগতের দৃশ্য চোখে পড়ে তাহা কীটসের জগৎ। জীবনের অভিজ্ঞতার ভার বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কবি মেঘলোক হইতে যে জগতে নামিয়া আসিয়াছেন তাহা কীট্‌সের সুখদুঃখবিরহমিলনবিচিত্র ঐকান্তিক মানবসংসারের জগৎ। এমন আভাস তাঁহার রচনায় আছে বটে, কিন্তু তাহা যেমন ভাবে অনুভবগম্য তেমন ভাবে প্রমাণযোগ্য নহে। যদি কেহ বলেন যে আমি বিশ্বাস করিলাম না, তবে হার মানিতে হইবে, কারণ কাব্য-বিচারে অনেক সময়েই 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ'র উপরে নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু অপর সত্যটা অনায়াসে বিশ্বাসগম্য করিয়া তোলা যাইতে পারে—সেটা শেলির প্রভাব।

সতীশচন্দ্রের "শেলির প্রতি" কবিতাটি শেলির Alastor ও Epipsychidion ভাঙিয়া এবং নিজের বৈশিষ্ট্য মিশাইয়া প্রস্তুত। কবিতাটিতে শেলি ও সতীশচন্দ্র দুজনেই আছেন। শেলির কাব্যের মর্ম আত্মসাৎ না করিলে সতীশচন্দ্র কখনো "রৌদ্রমুগ্ধ কবির চিঠি" লিখিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু এসব তো কেবল বস্তুগত প্রভাব, গৌণ। কিন্তু আর একটি মুখ্য প্রভাব আছে. কিংবা

তাহাকে স্বভাব বলাই উচিত। শেলি ও সতীশচন্দ্রের রচনার আবহাওয়াটির ভাব একই প্রকার—দুই-ই মধ্যাহ্নের দীপ্তিতে ভাস্বর।

শেলির কাব্যলোকের অম্বর হটালীয় মধ্যাহ্নের কিরণপ্লাবে সর্বদাই যেন দেখা না-দেখার প্রান্তে কাঁপিতেছে। একটা প্রখর 'ইন্‌টেলেক্ট' এর ধারায় সমস্ত জগৎ অভিষিক্ত হইয়া কিয়ৎপরিমাণে যেন অতীন্দ্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই দেখিয়াই শেলির নিগূঢ় কবিমানস যেন তাহার উপরে বিশুদ্ধ চৈতন্য সিঞ্চন করিয়া দিয়া তাহাকে খানিকটা লঘু, খানিকটা অবাস্তব করিয়া লইয়াছে। ইহাকে বলা যাইতে পারে বুদ্ধি দ্বারা বস্তুর শোধন। শেলির জগৎ বুদ্ধিশোধিত জগৎ। এই শোধন তাঁহার সজ্ঞান মন করিত না। কবি-মন শেলির অগোচরে করিত। তাঁহার কাব্যের অবিরল মধ্যাহ্নের আবহাওয়া এই বিশুদ্ধ ইনটেলেক্ট'-এর প্রতীক।

"Blue isles and snowy mountaints wear
The purple noon's transparent might."

এই purple noon-এর রৌদ্র কেবল পার্থিব নয়, তাহার সহিত কবির আত্মার কিরণ মিশিয়া তাহাকে একপ্রকার অপার্থিবতা দান করিয়াছে। এই অপার্থিবতা শেলির কাব্যের ধর্ম।

শেলির কাব্যের এই ধর্মটি সতীশচন্দ্রের কাব্যেও বিরাজমান।

সতীশচন্দ্রের কাব্য পড়িতে গেলে নিতান্ত অন্ধ ব্যক্তিও অনুভব করিবে, একটা মধ্যাহ্ন-কিরণ-প্লাবিত ভূখণ্ডে যেন সে বিচরণ করিতেছে। এই কিরণধারা কবির মন হইতে উৎসৃষ্ট হইয়া পাঠকের মনে আসিয়া প্রবেশ করে। এই কিরণ কবির আত্মার কিরণ, একপ্রকার অপার্থিব জ্যোতি—ইহা pure intellect-এর বাহ্য প্রকাশ।

"রৌদ্রমুগ্ধ কবির চিঠি", "শেলির প্রতি", এই দুটি কবিতাই মধ্যাহ্ন-রসে টলটোল।

একি এ ভুবনময় মহিমা রবির
কিরণ নীরব একি গগন গভীর। —"মধ্যাহ্নে"

এ স্বপন সারাদিন ধ'রে!
সোনার আলোকময় ঘরে··· —"স্বপ্ন, সম্মুখের"

দুপুরের বেলা গালে হাত দিয়ে
জননী একাকী ভাবিছে বসিয়ে!
ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ
কি রসের স্রোত —"পরীর জন্মকথা"

ডুবিয়া আছে তরী—
কিরণময় সুনীল নভ-সাগর মাঝে পড়ি
ডুবিয়া আছে তরী! —"দিবাভাগে চাঁদ"

"দিবাভাগে চাঁদ" একটি আশ্চর্য রকমের কবিতা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করিবার মত এই যে, চাঁদের মত অন্ধকারসম্বন্ধ বস্তুকেও দুপুরের রোদে না দেখিয়া কবির তৃপ্তি নাই।

"আগ্রাপ্রান্তরে" আর একটি সার্থক সৃষ্টি। এ কবিতাটির আবহাওয়া দ্বৈপ্রহরিক। গুরুদক্ষিণা গ্রন্থে ও তাঁহার ডায়ারির পাতা ক'খানিতে যে কয়েকটি প্রাকৃতিক চিত্র আছে তন্মধ্যে দ্বিপ্রহরের বর্ণনাই বোধ করি সবচেয়ে অধিক এবং সেইগুলই রচনারসে অনবদ্য।

একি কেবলই একটা কাকতালীয় ব্যাপার, না, গূঢ় কারণ কিছু আছে? শেলির কাব্যধর্ম আলোচনাপ্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলাম এক্ষেত্রেও তাহাই বক্তব্য। শেলির কবিধর্ম ও সতীশচন্দ্রের কবিধর্ম মূলতঃ ভিন্ন হইলেও এই সময়টাতে তিনি দূরগগনের একটি গ্রহের মত শেলির জ্যোতির্লোক অতিক্রম করিতেছিলেন, শেলির জ্যোতির্ময় বাষ্প সতীশচন্দ্রের নভোমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল, তাই তাঁহার কাব্য এমন মধ্যাহ্নকিরণদীপিত, তাই এমন অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা তাহার। কিন্তু সংক্রমণ পরিক্রমণমাত্র, জীবিত থাকিলে শেলির কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া তিনি বাহির হইতেন এবং স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইতেন। সে স্বধর্ম কীট্সীয় ধর্ম। তাই এই জ্যোতির্ময় মেঘলোকের ফাটলপথে যে দৃশ্য চোখে পড়ে, তাহা কীট্সের জগতের। দূরাপহত ক্ষীণ দৃশ্য—কিন্তু সেই দিকেই তাঁহার উদ্দিষ্ট গতি।

সহকারে বাড়ে ফল নিটোল কঠিন—
সরস কৈশোরসম। —"আজি"

বৃহৎ সে প্রাণ
ধরণীর ঔদার্যের যেন এক দান
বিপুল বটের মতো। —"রৌদ্রমুগ্ধ কবির চিঠি"

ধরণী-গগনে লাগে মধুরস-জোয়ারের টান! —"নিশীথিনী"

দলমল স্বর্ণগাঁদা। —"আত্মসমর্পণ"

সৌন্দর্যই শুরম্বের মৃত্যুগীত গায়। —"আগ্রাপ্রান্তরে"

এই কয়টি ছত্রে ভাষায় যে প্রৌঢ়তা, যে নিটোল কঠিন মূর্তি, কল্পনার যে ঘনপিনদ্ধ বস্তুগত দৃঢ়তা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা একান্তভাবে কীট্‌সীয়, একান্ত-ভাবে কালিদাসীয়, আর পূর্বেই বলিয়াছি যে কালিদাস ও কীট্‌সের মন এক পর্যায়ভুক্ত। আমার কেমন যেন বিশ্বাস, সতীশচন্দ্রের মনও সেই পর্যায়ভুক্ত; পূর্বোক্তদের কল্পনার মাত্রাগত যতই তারতম্য থাকুক-না কেন, গুণগত ভাবে তাহারা একজাতিক। এই স্বভাবের দিকে তাঁহার কল্পনা চলিতেছিল, এমন সময়ে অকালমৃত্যু আসিয়া ছেদ টানিয়া দিল।

৫

অভিধানে হাজার হাজার শব্দ আছে, ইঁটের পাঁজায় হাজার হাজার ইষ্টকখণ্ডের মতই সে সমস্তই নির্জীব ও নিরর্থক। প্রতিভাবান সাহিত্যিকগণ শব্দ ব্যবহার করিয়া তাহাদের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। মাইকেল মধুসূদন এমনতর বহু শব্দকে সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের হাতে বহুতর শব্দ প্রাণবান্ হইয়া উঠিয়াছে। শব্দ-ব্যবহারের সহজাত ক্ষমতা লইয়াই প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক আসিয়া থাকেন। এই ক্ষমতাতেই সাহিত্যিকের চরম বৈশিষ্ট্য। দময়ন্তী নল-বাহুল্যের মধ্যে আসল মানুষটিকে চিনিতে পারিয়াছিল, কারণ তাহার ছিল প্রেমের দৃষ্টি। সাহিত্যিকদেরও শব্দের প্রতি এই প্রেমের দৃষ্টি থাকে, না থাকিলে সে সাহিত্যিকই নয়। শব্দের প্রতি এই প্রেমের দৃষ্টির কীট্‌স বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। সতীশচন্দ্রের এই দৃষ্টি প্রভূত পরিমাণে ছিল।

শিক্ষিত বাঙালী কবির পক্ষে তৎসম শব্দ প্রয়োগ খুব কঠিন নয়, তার চেয়ে অনেক কঠিন দেশী ও তদ্ভব শব্দ প্রয়োগ; এখানেই তাঁহার মুনশীয়ানা বা দুর্বলতা ধরা পড়ে। সতীশচন্দ্রের রচনা হইতে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিলেই তাঁহার এই শ্রেণীর শব্দব্যবহারের কলাকৌশল বুঝিতে পারা যাইবে—

সমুদ্রে নৌকার বর্ণনা—

হুস্ করি' নেমে পড়ে বারিরাজ্যমাঝে,
জল উঠি' উচ্ছুসিয়া চারি ধারে নাচে,
ডুবায় উপুড় করি', কাৎ করি তরী, —"রৌদ্রমুগ্ধ কবির চিঠি"

"ভগ্ন বাড়ির দেবতা"য়—

চুপ চুপ চুপ, নীরবে নীরবে—
আয় তোরা সরে, যা তোরা সবে—
সোনার ফড়িং সোনা মক্ষিকা ;
উত্তর দখিন পুবের দালান
এখনও ঘুমে অন্ধ নয়ান
শুধু পশ্চিমে ধব্ধবে জ্যোতি
পট তুলি' দিয়া জাগে সম্প্রতি।

ভগ্ন বাড়ির দেবতা বলিতেছেন—

চুপ চুপ চুপ নাহি গোলমাল
বড় সুখে আছি, এ দীর্ঘকাল।
হাতী থপথপি, ঘোড়া খটমটি'
দরোয়ান যত বকি' কটমটি…
আর উঠে নাকো সকালবেলায়
আছি সুখে আমি আপন খেলায়।

আর একটি কবিতায়—

বিহঙ্গম মুহুঃ উড়ে সীস থামাইয়া।

আবার—

শুধু কভু মেঘচ্ছেদে স্ফুট চন্দ্রকর—
মাঝে মাঝে দীপ্ দীপ্ জোনাকিপ্রকর—"স্বপ্ন, পশ্চাতের"

"দুঃখ-দেবতার মূর্তি" নামে কবিতায়—

পশ্চিম দিগন্তে যেথা গম্ভীর সিঁদুর
যেন কোন উপন্যাস-রাজার মহাল-মালা
ভাঙিয়া পড়েছে চুর চুর।

"জামদগ্ন্য" কবিতায়—

পত্‌ পত্‌ চীনাম্বরে রথাগ্রচূড়ায়—
হাজার কপোতী যেন উড়িয়া বেড়ায়।

"আত্মসমর্পণ" কবিতায় গাঁদার বর্ণনা—

দলমল স্বর্ণগাঁদা।

প্রতিভার লক্ষণ এই যে শব্দপ্রয়োগে যুগপৎ সাহস ও সংযম প্রকট হয়। অক্ষমে দুঃসাহস ও বাহবা কুড়াইবার দুর্বুদ্ধি আর যাই হোক প্রতিভার পরিচয় নয়। ইহা কাঁচাবয়সের লক্ষণ। সতীশচন্দ্র কাঁচাবয়সেই এইসব কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিভার সহজাত সাহস ও তাঁহাকে শিল্পীর পথে চালিত করিয়াছিল। তিনি নিতান্ত গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই, কিন্তু কোথায়, কি ভাবে, কি উদ্দেশ্যে সে-সব প্রয়োগ করিতে হইবে সে বিষয়ে তাঁহার কোন মোহ ছিল না।

সতীশচন্দ্রের কবিতার পরিচয়দান বাহুল্য, কারণ তাঁহার রচনার পরিমাণ বহুল নয়। গদ্য পদ্য সমস্তই প্রায় একাসনে পড়িয়া ফেলা যায়। কিন্তু পাঠক-সমাজের কাছে তাঁহার রচনা অজ্ঞাত কেন? একটা কারণ এই যে, সতীশচন্দ্রের রচনাবলী দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের তালিকাভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু পাঠকসমাজ সত্যকার রসপিপাসু হইলে তাহা তো হইবার কথা নয়। আবার যখন শুনি যে বাংলা পাঠকমহলে কবিতার প্রচার বাড়িয়াছে, তখন বিস্মিত হই। রসতৃষ্ণা সত্যই তীব্র হইলে রসিক পাঠক তাঁহার কবিতা আবিষ্কার করিয়া লইত। বাংলা সাহিত্যে একাধিক কবিতা-পত্র সম্পাদিত হইতেছে, তবে সতীশচন্দ্রের কবিতার এই অজ্ঞাতবাস কেন? আসল কথা রাজনীতির মত বাংলা সাহিত্যের ঘাড়েও দলবুদ্ধির ভূত ভর করিয়াছে। সতীশচন্দ্রের বিস্মৃতির প্রধান কারণ, তিনি কোন দলভুক্ত হইয়া মারা যান নাই। তবে "Leaving great verses to a little clan" যদি সান্ত্বনার বিষয় হয়, তবে সতীশচন্দ্রের আত্মা কতকটা সান্ত্বনা পাইতে পারেন।

৬

সতীশচন্দ্রের গদ্যরচনা সম্বন্ধে প্রসঙ্গতঃ কিছু আলোচনা করিয়াছি। আর দু-একটি কথা বলা যাইতে পারে। তাঁহার লিখিত 'স্বপ্নপ্রয়াণ' ও 'ক্ষণিকা'র আলোচনা অদ্যাবধি এই দুইখানি কাব্যের শ্রেষ্ঠ রসালোচনা হইয়া আছে। আর

তাঁহার ডায়ারির একস্থানে তিনি কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইতিপূর্বে এই দুই মহাকবির মধ্যে আর কেহ তুলনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। অথচ রবীন্দ্রনাথের সহিত ভারতীয় কোন কবির যদি সার্থক তুলনা চলে তবে নিশ্চয়ই তাহা কালিদাসের। অল্পবয়সে সার্থক কবিতা রচনার দৃষ্টান্ত বিরল নহে, কিন্তু সমালোচকের অন্তর্দৃষ্টি একান্ত বিরল। কীট্সের চিঠিপত্রে এইরূপ অন্তর্দৃষ্টির প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়।

সতীশচন্দ্রের রচনার বিস্তারিত আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নহে, তাঁহার রচনার প্রতি বাঙালী পাঠকসমাজের মনোযোগ আকর্ষণই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। বাল্যকালে আমি যখন শান্তিনিকেতনে ছিলাম তখনও সেখানকার অনেকের মনে পরলোকগত কবির স্মৃতি নবীন ছিল। সেই স্মৃতিকণার অনেক বিষয় আমার মনেও সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল। তাহা ছাড়া তাঁহার রচিত 'গুরুদক্ষিণা' গ্রন্থ আমার বালকচিত্তে যে মোহ সৃষ্টি করিয়াছিল, অদ্যাপি তাহা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নাই। এই প্রবন্ধ উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনের সেই তরুণ অধ্যাপকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের একটা সন্তোষজনক সুযোগ পাইলাম। পাঠকের কোন লাভ হইল কিনা জানি না কিন্তু ঐ সন্তোষটাই আমার লাভ।

কবি চতুষ্টয়

কোন কোন দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে, এক দল কবি অতি সহজে দানা বাঁধিয়া উঠিয়া একটি বিশিষ্ট কবিগোষ্ঠী সৃষ্টি করে। সে-সব দেশের সাহিত্যের ইতিহাস এইসব গোষ্ঠীপ্রেরণার ইতিহাস। দৃষ্টান্তস্বরূপ ফরাসী সাহিত্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেকে মনে করেন, 'লাটিন জিনিয়াস' নামে জাতিচরিত্রের ফলেই ফরাসী দেশের সাহিত্যে এই বৈশিষ্ট্যটি দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য গৌণ গুণে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও 'লাটিন জিনিয়াসে'র দৃঢ়বন্ধনে কবিদের গোষ্ঠী বাঁধিতে সাহায্য করে। বলা বাহুল্য, গোষ্ঠীর সমস্ত লেখক সমানভাবে একই গুণের অধিকারী নয়, তেমন হইলে তো একজন অপরের হুবহু অনুরূপ মাত্র হইত; বক্তব্য এই যে, মূল বন্ধনে একীভূত হইয়াও এক একজন এক একদিকের দিক্‌পাল। মূল গুণ 'লাটিন জিনিয়াসে'র সমীকরণ বন্ধন, গৌণ গুণ কবির নিজস্ব শক্তি। ফুলের তোড়ায় বিচিত্র ফুল, বন্ধনে তাহারা একীভূত।

ফরাসী সাহিত্য যদি ফুলের তোড়ার ইতিহাস হয়, ইংরাজী সাহিত্য আল্‌গা ফুলের ইতিহাস, সেখানকার বাগিচার ফুল সহজে তোড়ার বন্ধন স্বীকার করিতে চায় না। কখনো কখনো ইংলণ্ডের সাহিত্যে ফুল তোড়া বাঁধিয়া উঠিয়াছে সত্য কিন্তু দু'চারদিন পরেই দেখা গিয়াছে যে মানসিক আবহাওয়া অনুকূল নয়। বন্ধন যত আগ্রহে স্বীকার করিয়াছিল, বন্ধনমুক্তির আগ্রহ তার চেয়ে অনেক বেশী তীব্র। যৌবনে ওয়ার্ডস্বার্থ, কোলরিজ ও সাউদে মিলিয়া একটি গোষ্ঠীপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কিন্তু শেষে দেখা গেল ব্যাপারটা স্বপ্নের চেয়ে বেশী স্থায়ী নয়। পরবর্তীকালে রসেটি, সুইনবার্ন প্রভৃতি 'প্রিরাফেলাইট ব্রাদারহুড' নামে একটি গোষ্ঠী স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিল, কার্যত বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস গোষ্ঠীভঙ্গের ইতিহাস। এমন যে হয় তার কারণ ইংরাজের জাতিচরিত্রের ঝোঁকটা স্বভাবতই ব্যক্তিত্বের অবাধ প্রসারের দিকে। কোন মূল বন্ধনে তাহাদের এক করিয়া রাখে নাই বলিয়াই গৌণ প্রেরণায় তাহাদের পক্ষে এক হওয়া কঠিন। এই জাতিচরিত্রের বিকাশ ইংরাজ ইতিহাসের সর্বত্র। নৌযুদ্ধে ইংরাজের অসামান্যতা ও স্থলযুদ্ধে ন্যূনতার মূলেও এই গুণ। বাষ্পশক্তি ও বেতারের আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত মহাসমুদ্রে প্রত্যেকখানি যুদ্ধজাহাজ ছিল স্ব স্ব প্রধান, জাতিচরিত্রের স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্যতৃষ্ণা সহজে সিদ্ধির পথ পাইত। স্থলযুদ্ধে

ঘনীভূত সেনাবাহিনী সেনাপতির চোখের সম্মুখে, হাতের কাছে থাকে, সেখানে স্ব স্ব প্রাধান্যের সিদ্ধিপথ বন্ধ। ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্যের রোমান্টিক যুগের ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যাইবে, দুই দেশের জাতিচরিত্রের ভিন্নমুখী ঝোঁক। ফরাসী রোমান্টিক পর্বের লেখকগণ যেন একটা ছক্ কাটিয়া লইয়া লিখিতে বসিয়াছেন, ইংরাজী তৎপূর্বের লেখকগণ সজ্ঞানে অজ্ঞানে কোন বন্ধন মানিতে রাজী হন নাই। তবে যেটুকু মিল দেখা যায়, সে যুগের হাওয়ায়; যুগের হাওয়ায় মিল, দেশের আবহাওয়ায় অমিল।

এখন বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধে কি? এদেশের ঝোঁকটা কোন্ দিকে? মৌল গুণে আবদ্ধ হইয়া গোষ্ঠী বাঁধিয়া উঠিবার দিকে না স্ব স্ব পথে স্বতন্ত্রভাবে চলিবার দিকে? বাঙালী জাতিচরিত্রের স্বাভাবিক ঝোঁকটা স্বাতন্ত্র্যের দিকে, মিলিত সিদ্ধির পথ তাহার নয়। এইজন্যেই বাঙালীর জাতিচরিত্রের শ্রেষ্ঠ বিকাশ সাহিত্যে, সাহিত্য দশের কাজ নয়; সাহিত্যের মধ্যেও আবার লিরিক, লিরিকে এককের সিদ্ধি।

মধ্যযুগে একবার চৈতন্যদেবের দিব্যপ্রভাবের সূত্রে পদাবলী কবিগণকে কিছু কালের জন্য বাঁধিয়া এক প্রেরণায় তন্ময় করিয়া রাখিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহারা গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়াছিলেন এমন বলা চলে না।

একালে ব্যক্তিবিশেষ বা সাময়িকপত্র-বিশেষকে কেন্দ্র করিয়া কখনো কখনো একদল লেখক ঘনীভূত হইয়াছেন; বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন, রবীন্দ্রনাথ ও সাধনা সমাজপতি ও সাহিত্য প্রভৃতি উদাহরণ। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে মিলটা নিতান্তই আকস্মিক, তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ আর দশজনের চেয়ে এত বড় যে গোষ্ঠী-চালনার দায়িত্ব গ্রহণ তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ও বস্তু বাংলার ধাতে নাই, পরিকল্পনা ফাঁদিয়া সাহিত্যরচনায় বাঙালীর অনাগ্রহ। জাতিচরিত্র-সিদ্ধ যাহা নয় তাহা করিতে গেলেও সাফল্য লাভ ক্বচিৎ ঘটে। আজ এখানে যে কয়জন বিশিষ্ট কবির প্রসঙ্গ তুলিতেছি তাঁহারাও গোষ্ঠীবদ্ধ এমন দাবি করি না। ব্যক্তিগত ও আদর্শগত মিলেই গোষ্ঠী গড়িয়া ওঠে। এ চারজনের মধ্যে সেরূপ দৈত মিল নাই বটে, কিন্তু যে দেশের গোষ্ঠীবদ্ধতা সাহিত্যধর্ম নয়, সে দেশের পক্ষে তাঁহাদের ইতিহাস এক অভিনব দৃষ্টান্ত। সেইজন্যও বটে আর তাঁহাদের সমাপ্তপ্রায় কাব্য জীবনের সাফল্যের খাতিরেও বটে—তাঁহারা বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন।

২

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে আবিভূ্ত রবীন্দ্রানুগামী কবিগণের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন বাগচি, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও কবিশেখর কালিদাস রায়ের নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হইয়া থাকে। অনেকে এই সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নামটিও করিয়া থাকেন। যতীন্দ্রনাথ বয়সে ইঁহাদের তুল্য হইলেও অন্যান্য কারণে এই গোষ্ঠীভুক্ত নন। অন্য কারণের মধ্যে যতীন্দ্রনাথের শিক্ষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে পূর্বসংস্কার পুর্বোক্তদের চেয়ে ভিন্ন। আর তাহারই ফলে যতীন্দ্রনাথের কাব্যরূপ ইঁহাদের কাব্যরূপ হইতে ভিন্ন। আগেই বলিয়াছি যে, গোষ্ঠীবন্ধনে দুটি বাঁধনের আবশ্যক, একটি ব্যক্তিগত, অপরটি আদর্শগত। যতীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতায় ইঁহাদের গোষ্ঠীভুক্ত হইলেও আদর্শের বিচারে স্বতন্ত্র। কাজেই এক্ষেত্রে আমরা যতীন্দ্রনাথের কাব্যের আলোচনা করিব না। তাছাড়া, যতীন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যবান্। তাঁহার কাব্য যেমন উত্তরপুরুষের রসানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে তেমনি আবার প্রবন্ধ ও পুস্তকাকারে আলোচনার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছে। অন্য চারজন সম্বন্ধে এমন কথা বলা যায় না। দু' একটি প্রবন্ধ ছাড়া ইঁহাদের কাব্যের আদৌ আলোচনা হয় নাই। পাঠ্যপুস্তকের উদার সহযোগিতার ফলেই ইঁহাদের কবিতা পাঠকের অবজ্ঞা-সমুদ্রে কোনরকমে মাথা জাগাইয়া আছে। ইহা বিশেষ পরিতাপের বিষয়, এমন ঘটা উচিত নয়। অবশ্য অনেকে বলিতে পারেন যে পাঠকসমাজে তাঁহাদের কবিশক্তি সম্বন্ধে উদাসীন হইলে করুণানিধান ও কালিদাস রায় জগত্তারিণী পদক দ্বারা সম্মানিত হইতেন না। একথা সত্য যে, করুণানিধান ও কালিদাস রায় জগত্তারিণী পদক লাভ করিয়াছেন আর আশা করিতেছি যে অচিরকাল মধ্যে কুমুদরঞ্জন অনুরূপ উপায়ে অভিনন্দিত হইবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পদক পুরস্কারাদি অনেক সময়েই গতানুগতিক চালে চলে, তাহাদের চলনে বলনে বিশেষার্থ বড় থাকে না; ওসব বস্তু অনেক সময়েই অপঠিত গ্রন্থের প্রতি অশ্রদ্ধার মুষ্টিভিক্ষা।

অথচ কবিচতুষ্টয়ের কাব্য আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রভূত সৃষ্টির মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিবার যোগ্য উপাদানের অভাব নাই। আলোচনার এ একটি কারণ। অপর কারণ, তাঁহাদের কাব্য এমন একটি ধারাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে যাহা বুঝি লোপ পাইতে চলিল। এ ধারা বাংলা সাহিত্যে নবাগন্তুক নয়, অতি প্রাচীন; প্রচুর রবীন্দ্রপ্রভাব সত্ত্বেও এ ধারা আপন বিশিষ্ট্য হারায় নাই; রবীন্দ্রপ্রভাবের ফলে বাংলা কাব্যে যখন ক্রান্তিপাত ঘটিতেছিল

তখন ইঁহারা ও ইঁহাদের মত কবিগণ নবীনকে অস্বীকার না করিয়া প্রাচীন কাব্য সংস্কারটিকে সাধ্যানুসারে সজীব করিয়া রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। বাংলা কাব্যের প্রাচীন ও নবীন খণ্ডে আজ যে ব্যবধান ইঁহাদের কাব্য তাহাকে একেবারে দুস্তর হইতে দেয় নাই। কেবল এই কারণেই তাঁহাদের কাছে বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সেকালের জগৎ হইতে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বা গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি একালে পদার্পণ করিলে অনায়াসে এইসব কবির কাব্যের রস গ্রহণ করিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু কৃতজ্ঞতার আরো কারণ আছে। উচ্চাঙ্গ কাব্যরস বোদ্ধার সংখ্যা স্বভাবতই অল্প। অল্পপর্যায়ভুক্ত বৃহত্তর পাঠকসমাজের রসজীবন যাপনের মোটা অন্নবস্ত্র যোগাইবার ভার ইঁহাদের মত কবির উপরে, এদেশে, বিদেশে, সর্বদেশে ও সর্বকালে। কাব্যলক্ষ্মীর মহোৎসবে খাসমহলের নিমন্ত্রিতগণ ভূরিভোজন করুন আপত্তি নাই; কিন্তু রবাহূত, অনাহূতগণ অভুক্ত ফিরিয়া যাইবে এমন তো হওয়া উচিত নয়। ইঁহাদের উপরে মোটা অন্ন পরিবেশনের ভার। সেকালে মোটা অন্নে ও রাজভোগে এমন প্রভেদ করা হইত না। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল পালা উদার হস্তে যে অন্ন বিলাইত তাহাতে রাজা ও রাখালের সমান রুচি ছিল। মহাজন পদাবলীতেও অন্নে বাছবিচার ছিল না। চৈতন্যদেবের প্রভাবে কেবল সমাজে জাতিভেদ শিথিল হয় নাই, কাব্যেও অন্নের জাতিভেদ ছিল না। সেকালে কেবল সমাজে নয়, রসের ক্ষেত্রেও একান্নবর্তী ছিল। একালে সমাজে ও সাহিত্যে একান্নবর্তিতা লোপ পাইবার মুখে; সাহিত্যের খাসমহল হয়তো আয়তনে বাড়িয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে যে বহিঃপ্রাঙ্গণের আয়তনও বাড়িয়া গিয়াছে। সেখানে যাহারা পাতা পাড়িয়া বসিয়া গিয়াছে তাহাদের কি ব্যবস্থা হইবে? একশ বছর আগে মধুসূদন যখন খাসমহলের ভার গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন সাধারণে রস-বিতরণের ভার ছিল ঈশ্বর গুপ্ত ও তৎপূর্ববর্তী দাশরথি রায়ের উপরে। একালেও প্রয়োজন আছে। এমন যদি কখনও হয় যে, কাব্যলক্ষ্মীর প্রসাদের সাকুল্যই খাসমহলের ভোগে লাগিয়া যাইবে, আর প্রবেশানধিকারীর দল ফিরিয়া যাইবে শুষ্ক মুখে—তবে সেই সরস্বতীর ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কখনই সমর্থনযোগ্য নয়।

৩

যতীন্দ্রমোহন বাগচি নদীয়া জেলার এক সম্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে তিনি কাব্যরচনা আরম্ভ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে কবিখ্যাতি লাভ করেন। বি-এ পাস করিবার পরে মানসী, যমুনা প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনার সহিত তিনি জড়িত হইয়া পড়েন। ঐ সময় হইতেই তিনি কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে পরিণত বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। রেখা, লেখা, অপরাজিতা, নাগকেশর, নীহারিকা, মহাভারতী প্রভৃতি তাঁহার প্রধান কাব্যগ্রন্থ।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৭ সালে নদীয়া জেলায় শান্তিপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কাব্যরচনারও সূত্রপাত কলেজী শিক্ষা সমাপ্ত হইবার আগে। তিনি বি-এ পাস করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত জীবিকাসূত্রে জড়িত থাকিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। ঝরাফুল, শান্তিজল, ধানদূর্বা প্রভৃতি তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ।

১৮৮২ সালে বর্ধমান জেলার উজানী গ্রামে কুমুদরঞ্জন মল্লিকের জন্ম। দীর্ঘকাল মাথরুন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে আসীন থাকিয়া অনেক বৎসর হইল অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭০ তাঁহার মৃত্যু হয়। কবি চতুষ্টয়ের মধ্যে একমাত্র কুমুদরঞ্জনই স্থায়িভাবে গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। কলিকাতার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নৈমিত্তিক মাত্র। অজয়, উজানী, একতারা, বনতুলসী, বনমল্লিকা প্রভৃতি তাঁহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

কবিশেখর কালিদাস রায়ের জন্ম ১৮৮৯ সালে, বর্ধমান জেলার এক প্রসিদ্ধ বৈদ্য বংশে। বিখ্যাত বৈষ্ণবকবি লোচনদাস ইহার পূর্বপুরুষ। কলেজে পড়িবার সময়েই কালিদাসবাবুর কবিখ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তারপরে তিনি বি-এ পাস করিয়া রংপুর জেলার উলিপুর গ্রামে দীর্ঘকাল প্রধান শিক্ষকতার কার্য করেন। কিন্তু সে আজ অনেক দিনের কথা। তৎপরে বহুদিন তিনি কলিকাতার অধিবাসী। অনেকদিন শিক্ষকতা কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সম্প্রতি অবসর জীবন যাপনের পর ২৫ অক্টোবর ১৯৭৫ সালে পরলোক গমন করেন। কুন্দ, কিশলয়, পর্ণপুট, ব্রজবেণু, ঋতুমঙ্গল, রসকদম্ব প্রভৃতি তাঁহার কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

৪

এই সংক্ষিপ্ত জীবনচিত্রগুলি কবিদের কাব্য বুঝিতে সাহায্য করিবে বলিয়া মনে করি; তাঁহাদের সৃষ্টিপ্রেরণার রহস্যবহুল পরিমাণে তাঁহাদের জন্মস্থান, পল্লীপরিবেশ, পরবর্তীকালে নাগরিক জীবনযাপন প্রভৃতি তথ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়াই মনে হয়।

যতীন্দ্রমোহন ও করুণানিধানের জন্ম নদীয়া জেলায়, আবার কালিদাস রায় ও কুমুদ মল্লিকের জন্মস্থান বর্ধমান জেলা। তাঁহারা সকলেই ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত, আর যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধান ও কালিদাস রায় জীবনের অধিকাংশ কাল কলিকাতায় কাটাইয়াছেন। তাঁহাদের সকলেরই কবিপ্রভাবের মূলে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব—যদিচ এ বিষয়ে কমবেশি আছে, যেমন কুমুদরঞ্জনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রপ্রভাব ন্যূনতম। রবীন্দ্রপ্রভাবের পরেই বৈষ্ণবকাব্যের প্রভাব সবচেয়ে বেশী কার্যকরী হইয়াছে, যতীন্দ্রমোহনের ক্ষেত্রে তাহার প্রভাব স্বল্পতম। কিন্তু এই চারজনের উপরেই পল্লীপরিবেশের প্রভাব সবচেয়ে প্রবল ও সবচেয়ে ফলপ্রসূ হইয়াছে। কলিকাতায় স্থায়িভাবে বসিবার আগে সেই যে এক সময়ে জীবনের দীর্ঘকাল পল্লীবঙ্গে কাটাইয়াছিলেন সেই স্মৃতি মানসপ্রতিমা গড়িতে তাঁহাদের প্রভূততম সাহায্য করিয়াছে। করুণানিধান যতীন্দ্রমোহন ও কালিদাস রায় মনে মনে পল্লীবাসী ছিলেন, কুমুদরঞ্জন তো কায়মনোবাক্যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পল্লীবাস করিয়াছেন। আধুনিক কবিগণের জীবনতন্ত্রে নগর একটি উপাদান, সেইজন্য তাঁহাদের কাব্য জটিল ও অনেকাংশে দুর্বোধ্য (নাগরিক জীবনের রহস্যও যে জটিল ও দুর্বোধ্য)। পল্লীপরিবেশের উৎস হইতে প্রভাবিত বলিয়া ইহাদের কাব্য সরল ও প্রাঞ্জল। সরলতা ও প্রাঞ্জলতা এ যুগের কাব্যলক্ষণ নয় বলিয়া যুগপ্রেমিক পাঠকগণের কাছে, যুগপ্রেমিক সমালোচকগণের কাছে ইহাদের কাব্য অনাদৃত। কিন্তু যুগপ্রেমকে অতিক্রম করিয়া রসভোগ করিতে সমর্থ হইলে ইহাদের কাব্যে উপভোগের বস্তু যথেষ্ট পাওয়া যাইবে নিঃসন্দেহে। ইহাদের কাব্যের যথেষ্ট সমাদরের অভাবের আর একটি কারণ—সাধারণভাবে ইহাদের কাব্যে প্রেমরসের স্বল্পতা। দাম্পত্যসম্বন্ধকে অবলম্বন করিয়া যে প্রেম বিকশিত হয় তাহার বিকাশ ও লীলা ইহাদের কাব্যে যথেষ্ট আছে—এদিকে ইহারা অক্ষয় বড়াল ও দেবেন্দ্র সেনের অনুগামী; যে-প্রেম সামাজিক সম্পর্ক স্বীকার করে না, আপনি আপনার নিয়ম রচনা করিয়া নরনারীর জীবনে ইন্দ্রজাল বয়ন করিয়া বেড়ায়, সে প্রেমের অভাব এইসব কবির কাব্যে। তবে এ বিষয়েও কমবেশি

আছে। যতীন্দ্রমোহনে ও করুণানিধানে মাঝে মাঝে এ প্রেম দূরাগত জলন্ত উল্কার মত দেখা দিয়া থাকে, বুঝিতে পারা যায় যে, তাহারা এ গ্রহের অধিবাসী নয়, চলিয়া যাইবার মুখে একবার জ্বলিয়া গেল ; কিন্তু কুমুদ মল্লিক ও কালিদাস রায়ের কাব্যে—এ প্রেম নাই বলিলেই চলে। এখন প্রেমের এই রূপটির অভাব তাহারা ভক্তিতে পূরণ করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আর এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছে তাঁহাদের জন্মপরিবেশ। নদীয়া ও বর্ধমান জেলায় যাঁহাদের জন্ম তাঁহারা যেন ভক্তির সহজ অধিকার লইয়াই সংসারে প্রবেশ করেন। মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ ও বৈষ্ণব কবিগণের ভাবোন্মাদের ঐতিহ্য নদীয়া জেলা বর্ধমান জেলার এইসব কবিগণকে এমন সহজে, এমন অনায়াসে অনুপ্রাণিত করিয়াছে যাহা অপর স্থানের অধিবাসীর পক্ষে বিস্তর সাধনার ফল। এখানে সহায়ক পল্লীপরিবেশ। আমাদের পল্লীর শান্ত, সংকীর্ণ, সামাজিক ও পারিবারিক বিচিত্র সম্বন্ধের দ্বারা সীমায়িত গণ্ডির মধ্যে রোমাণ্টিক প্রেমের স্থান কোথায়? সেখানে স্বাভাবিক স্থান দাম্পত্যপ্রেমের—আর ভক্তির ; এ দুয়ের মধ্যে একটি পদক্ষেপের মাত্র ব্যবধান। যে-সব সামান্য বা সাধারণ উপাদানে এইসব কবিদের কাব্য গঠিত তাহার আলোচনা করিলাম, এবারে অন্য একটি প্রসঙ্গে যাওয়া যাইতে পারে।

৫

আগে এক বার বলিয়াছি যে, ইহাদের বর্তমান কবিখ্যাতির মূলে আছে স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে স্থানলাভ। এবারে বলিতে যাইতেছি যে, ঐ সৌভাগ্যই (সত্যই সৌভাগ্য কি ?) তাঁহাদের কাব্যের রসিক সমাজে প্রবেশের অন্তরায়। যে-সব কবিতার সঙ্গে প্রথম ও প্রধান পরিচয় 'পাঠ্যপুস্তকে'র মধ্যস্থতায় তাহাদের প্রতি বয়স্ক পাঠকের মনে কেমন যেন একটা অনাদর ও অনাস্থার ভাব দেখা দেয়। ইহার প্রকৃত কারণ কি জানি না, অবচেতন মনের কোন্ রহস্য ইহার মূলে নিহিত বিশেষজ্ঞগণ বিচার করুন। কিন্তু মোটের উপরে কথাটা যে সত্য তাহা বোধ করি অনেকেই স্বীকার করিবেন। কাব্য প্রয়োজনের অতীত সম্পদ, এইরূপ একটি ধারণা মানুষের মনে থাকায় নিত্যপ্রয়োজনে ব্যবহৃত অভিধান—ব্যাকরণ—রচনা-শিক্ষার সহচর কবিতাসমূহের উপরে মানুষের মনে কেমন যেন অশ্রদ্ধা জন্মিয়া যায়। ফলে স্কুল ছাড়িবার পরেও স্কুলের ভীতি ও স্মৃতি ঘাড়ে চাপিয়া থাকিয়া "স্কুলপাঠ্য" কবিদের প্রতি পাঠকের মন প্রতিকূল করিয়া রাখে। কিন্তু

একবার এই "Text Book Complex" বা পাঠ্যপুস্তকজাত বিভীষিকা কাটাই উঠিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ইহাদের স্থায়ী সম্পদের অভাব নাই।

"যোগ্যতমের উদ্বর্তন" তত্ত্ব অন্যান্য ক্ষেত্রের মত সাহিত্যক্ষেত্র সম্বন্ধেও সত্য কিন্তু তর্ক উঠিবে যোগ্যতমের সংজ্ঞায়। এ সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, সাহিত যেমন গতানুগতিককে সহ্য করে না, তেমনি খাপছাড়া ও অদ্ভুতকেও বহন ক না। খাপছাড়া ও অদ্ভুত কিছুদিনের জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সম হইলেও চিরদিনের পাট্টা তাহাদের নাই। সাহিত্যের ইতিহাস এ সত্যটিবে যেমন চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেয় এমন আর কিছুকে নয়।

এখন গতানুগতিক ও অদ্ভুতের মাঝখানে স্থান খুব প্রশস্ত। সেই স্থা যাহারা আশ্রয় লাভ করে তাহাদের মার নাই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের স্থান যেখানে, আবার minor poet-গণের স্থানও সেখানে; মহাকবি ও minor poet এই প্রশস্ত ক্ষেত্রে আশ্রিত, অনেক সময়েই গায়ে গায়ে বিরাজ করে; কেবল অকবি ও কুকবিগণের সেখানে স্থান হয় না। আলোচ্য কবি চতুষ্টয় অকবিও নন কুকবিও নন, minor poet—আর সেইজন্যই স্মৃতিযোগ্য কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁহাদের স্থান। সমসাময়িক বহুখ্যাত ও বিচিত্রকীর্তি অনেক কবি ও কবিত যখন খাপছাড়া ও অদ্ভুত বলিয়াই তলাইয়া যাইবে, তখনও ইহাদের যে সরল প্রাঞ্জল, বাঙালীর পল্লীজীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দে সমুজ্জ্বল কবিতাগুলি টিকিয় থাকিবে তাহার সংখ্যা বড় অল্প নয়।

—শেষ